উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী: অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব-
বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

নাসরিন সুলতানা

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড: নাজমা চৌধুরী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

400438

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

এম, ফিল অভিসন্দর্ভ

নভেম্বর, ২০০১

Dhaka University Library
400438

M.Phil.

GIFT

400438

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী: অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব- বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম, ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত

নভেম্বর, ২০০১

গবেষক
নাসরিন সুলতানা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

400438

তত্ত্বাবধায়ক
ড: নাজমা চৌধুরী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

প্রত্যয়ন পত্র

আমি সানন্দে প্রত্যয়ন করছি যে, উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী: অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব-বাংলাদেশ প্রেক্ষিত এই শিরোনামের অভিসর্দ্ধবটি নাসরিন সুলতানা এর একক ও নিজস্ব গবেষণার ফলশ্রুতি।

আমি আরও প্রত্যয়ন করছি যে, এই অভিসর্দ্ধবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি তত্ত্বাবধান করেছি এবং আদ্যোপান্ত পড়েছি। এবং এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়ার সুপারিশ করছি।

অধ্যাপক ড: নাজমা চৌধুরী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

400438

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

উৎস্বর্গ

আম্মা ও বাবা কে

গোল আফরোজ বেগম ও মো: ইমাম শরীফ

যাদের অনুপ্রেরণা ও আর্শীবাদে এই গবেষণা কর্ম

কৃতজ্ঞতা পত্র

এই গবেষণা কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হওয়ার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ আমার শিক্ষক, এই গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড: নাজমা চৌধুরীর প্রতি। উন্নয়ন ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর সম্পৃক্ততা বিষয়ে দীর্ঘ কর্ম-অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তাঁর সক্রিয় তত্ত্বাবধান এই গবেষণাকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে। তিনি তাঁর কর্মব্যস্ত সময়ের মধ্যেও এই গবেষণা কাজের মূল বিষয়বস্তুর জন্য যেমন, তেমনি সুক্ষ বিষয়গুলোতে সুষ্ঠুতা বজায় রাখার জন্য সময় প্রদান করেছেন যা একটি নির্দিষ্ট মানদন্ডে পৌঁছানোর ব্যাপারে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ড: ইকবাল আলম খানের প্রতি। তিনি প্রতিনিয়ত এই গবেষণা সম্পৃক্ত সকল বিষয়ে আমাকে সর্বোতভাবে সহায়তা করেছেন। থিসিস রচনার মৌলিক নিয়ম অনুসরণ এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন যা আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার শিক্ষক ড: শওকত আরা হোসেনের প্রতি। তাঁর স্নেহাস্পদ আর্শীবাদ এবং তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে লাইব্রেরী ব্যবহারের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ আমাকে অত্যন্ত উপকৃত করেছে।

কর্মজীবনের পাশাপাশি এই গবেষণা কাজ সম্পাদনে সহায়তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার কর্মস্থল প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র বিশেষভাবে 'ইমেক' বিভাগের কর্তৃপক্ষকে, এবং আমার সহকর্মীদের, বিশেষ করে শাহজাহান সেলিম, কলি, স্বপ্না, মোস্তফা কামাল, শামসুল হকের প্রতি যারা আমাকে তথ্য সংগ্রহ ও কম্প্যুটার সংক্রান্ত কাজে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ আমার প্রাক্তন কর্মস্থল মানবিক সাহায্য সংস্থার এস. আর. জি প্রোগ্রামের কর্তৃপক্ষ ও সকল সহকর্মীদের প্রতি যারা এম.ফিল কোর্সের প্রথম পর্ব উত্তরণ করে এই থিসিস রচনার পথ উন্মুক্ত করতে সহায়তা করেছেন। আমার একান্ত ধন্যবাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উইমেন ফর উইমেন, প্রশিকা, বি.আই.ডি.এস কর্তৃপক্ষকে- এই গবেষণার অধিকাংশ মৌলিক গ্রন্থ এবং তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য।

ধন্যবাদ আমার বন্ধু জলিকে, যার আন্তরিক আগ্রহ আমাকে উৎসাহিত করেছে সবসময়। জেসমীনকে, যে ছিল এই গবেষণা কাজে আমার নিত্যসঙ্গী, এবং টিপুকে যে আমার সকল কাজের একান্ত উৎসাহদাতা।

সবশেষে, কিন্তু সবচাইতে গভীর কৃতজ্ঞতা আমার পরিবারের প্রতি। বাবা এবং আম্মার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত যাদের উৎসাহ আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে - আপু, বড় ভাইয়া ও ভাবী, ছোট ভাইয়া ও ভাবী এবং শিরিন। কাকা-চাচীদের আগ্রহও ছিল বড় অনুপ্রেরণা।

নভেম্বর, ২০০১ নাসরিন সুলতানা

সারণী ও চিত্র তালিকা

সারণী: ১.১ 'উন্নয়ন' ও 'রাজনৈতিক অংশগ্রহণ'- এ নারী

চিত্র: ১.২ উন্নয়ন ও রাজনীতি সম্পৃক্ত ফ্রেমওর্য়াক

চিত্র: ২.১ রাজনৈতিক প্রভাবের পার্থক্যের জন্য দায়ী কতকগুলি কারণ (বিষয়)

চিত্র: ২.২ রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্ক

চিত্র: ২.৩ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতায়ন

চিত্র: ২.৪ উন্নয়ন ও রাজনীতির সম্পৃক্ততা

চিত্র: ২.৫ টেকসই উন্নয়ন ধারার মডেল

সারণী: ৩.১ তিনটি দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রে সময়ের ব্যবহার, ১৯৮৯/৯২

'অর্থনৈতিক কাজের সপ্তাহব্যাপী শ্রমঘন্টা'

সারণী: ৩.২ প্রধান পেশাগত গ্রুপে নারী-পুরুষ শ্রমশক্তির বন্টনের শতকরা হার,

"প্রধান পেশাগত গ্রুপে নারী-পুরুষ শ্রমশক্তির বন্টনের শতকরা হার, ১৯৭০ এবং ১৯৯০"

'শ্রমশক্তিতে লিঙ্গভিত্তিক বন্টনের শতকরা হার'

সারণী: ৩.৩ প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনামূলক পেশায় অঞ্চলভেদে পুরুষের তুলনায় নারীর হার, ১৯৮০ ও ১৯৯০, ১০০ জন পুরুষের বিপরীতে নারী

সারণী: ৪.১ সরকারী চাকরীর বিভিন্ন শ্রেণীতে নারী ও পুরুষের অবস্থান।

সারণী: ৪.২ সচিবালয়ে, অধিদপ্তরে এবং স্বায়ত্বশাসিত কাঠামোতে সিভিল কর্মকর্তা- কর্মচারীর সংখ্যা এবং ধরন অনুযায়ী নারী চাকুরের সংখ্যা

সারণী: ৪.৩ মূখ্য শিল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত (১৫ বছর ও তার উর্ধে) ১৯৯৫-৯৬

চিত্র: ৫.১ বাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নীতি নির্ধারণী ভূমিকা

সারণী: ৫.২ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হিসেবে শীর্ষ পর্যায়ে নারী (প্রধানমন্ত্রী)

সারণী: ৫.৩ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হিসেবে শীর্ষ পর্যায়ে নারী (রাষ্ট্রপতি)

সারণী: ৫.৪ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হিসেবে শীর্ষ পর্যায়ে নারীদের বর্তমান অবস্থান

সারণী: ৫.৫ বিভিন্ন দেশে উপপ্রধান হিসেবে নারী নেতৃত্ব

লেখচিত্র: ৫.৬ বিশ্বব্যাপী মন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অবস্থান

সারণী: ৫.৭ বিশ্বব্যাপী মন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অবস্থান

সারণী: ৫.৮ বিশ্বব্যাপী উপ/প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অবস্থান

সারণী: ৫.৯ আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্ব (১৯৪৫-১৯৯৫)

সারণী: ৫.১০ আইনসভায় নারীর বর্তমান অবস্থান- বৈশ্বিক গড়

সারণী: ৫.১১ আইনসভায় নারীর বর্তমান অবস্থান (আঞ্চলিক গড়)

সারণী: ৫.১২ আইনসভায় নারী স্পিকার বা প্রেসিডেন্ট সংক্রান্ত তথ্য (১৯৪৫ থেকে ১৯৯৮)

সারণী: ৫.১৩ আইনসভায় নারী স্পিকার বা প্রেসিডেন্ট (১ জানুয়ারী ১৯৯৮)

সারণী: ৫.১৪ বর্তমানে কর্মরত নারী স্পিকারের তালিকা (১০ আগষ্ট ২০০০ পর্যন্ত)

সারণী: ৬.১ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা

সারণী: ৬.২ শীর্ষ পর্যায়ে নারী

সারণী: ৬.৩ মন্ত্রীসভায় নারীর অংশগ্রহণের হার

সারণী: ৬.৪ বিভিন্ন সময়ে নারী ও পুরুষ মন্ত্রীর তুলনামূলক চিত্র

সারণী: ৬.৫ আইনসভায় সরাসরি নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের চিত্র

সারণী: ৬.৬ ১৯৭৯ থেকে ২০০১ পর্যন্ত নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের হার

সারণী: ৬.৭ জাতীয় সংসদে সরাসরি ও সংরক্ষিত আসনে নারী

সারণী: ৬.৮ ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসেবে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ

Table: 7.1Gender Gaps in Political participation.

Table: 7.2 Gender gap in economic activity.

Table: 7.3 Gender empowerment measure:(GEM)

Table: 7.4 Gender gaps in work burden and time allocation.

Table: 7.5 Comparative chart of different country-depends on gender equality

সারণী: ৮.১ দুই পর্যায়ের সুপারিশ

সারণী: ৮.২ রাষ্ট্রীয় মতাদর্শভিত্তিক সুপারিশ- আইন বিষয়ক

সারণী: ৮.৩ রাষ্ট্রীয় মতাদর্শভিত্তিক সুপারিশ- সরকারী সিদ্ধান্তগ্রহণমূলক

সারণী: ৮.৪ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় দুই পর্যায়ের সুপারিশ

সারণী: ৮.৫ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় পরিকল্পনা বিষয়ক সুপারিশ

সারণী: ৮.৬ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্ন্তভূক্তকরণ বিষয়ক সুপারিশ

সারণী: ৮.৭ রাজনীতিতে প্রবেশ ও প্রতিনিধিত্ব অর্জনে রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত সুপারিশ

সারণী: ৮.৮ রাজনীতিতে প্রবেশ ও প্রতিনিধিত্ব অর্জনে নির্বাচন সংক্রান্ত সুপারিশ

Abbreviation

BIDS- Bangladesh Institute for Development Studies

CEDAW- Convention on the Elimination of all kinds of Discrimination Against Women

DAWN- Development Alternatives with Women for a New Era

EPZ- Export processing Zone

FLS- Forward Looking Strategies

FYP- Five Year Plan

GAD- Gender and Development

GDI- Gender Development Index

GEM- Gender in Empowerment

HDI- Human development Index

HDR- Human Development Report

NAP- National Action Plan

NFLS- National Forward Looking Strategies

PFA- Platform for Action

UN- United Nations

UNDP- United Nations Development Programme

WID- Women in Development

গবেষণা সারসংক্ষেপ

এই গবেষণায় মূলত: উন্নয়ন, রাজনীতি এবং নারী এই তিনটি প্রত্যয়ের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। স্বতন্ত্র প্রত্যয় হিসেবে এই তিনটি প্রত্যয় বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু লিঙ্গ সমতাভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এই ত্রয়ী প্রত্যয়ের সম্পৃক্ততা অনস্বীকার্য। সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী হিসেবে না থেকে যথাযথ অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব অর্জনের মাধ্যমে ন্যায় ও সমতাভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই গবেষণার লক্ষ্য।

'উন্নয়ন' একটি ব্যাপক বিষয়। পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন অর্জন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশক-এ সাফল্য অর্জনের মধ্য দিয়ে কিংবা একটি নির্দিষ্ট অংশের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে যাচাই করা সম্ভব নয়। বরং দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা পরিহার করে সামগ্রিক পরিসরে বিবেচনা করা প্রয়োজন। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সকলের জন্য প্রাপ্তির সুফল ভোগের অধিকার নিশ্চিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

'রাজনীতি' হচ্ছে নীতি নির্ধারণের কেন্দ্রস্থল। ক্ষমতায়নের এই কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানের ফলে রাজনীতির পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা রাজনীতির গুরুত্বকে প্রসারিত করেছে রাষ্ট্রীক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাই রাজনীতির পরিমন্ডলে সকল জনগোষ্ঠীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

'নারী' হচ্ছে রাষ্ট্রের অর্ধেক জনসংখ্যা এবং মানব সম্পদ। নাগরিক হিসেবে নারীর অধিকার রয়েছে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব অর্জনের।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে নারীর অবস্থান প্রতিটি ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে পুরুষের তুলনায় নারী পিছিয়ে আছে। রাজনীতির পরিমন্ডলেও নারীর প্রতিনিধিত্ব নিতান্তই অ-প্রতূল। বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী, অর্ধেক মানব সম্পদ নারী রাষ্ট্রীয়

জীবনের সকল কর্মকান্ডে পর্যাপ্ত অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত। এর একটি কারণ হলো অংশগ্রহণের সুযোগের অভাব এবং অন্যটি হলো অংশগ্রহণের স্বীকৃতির অভাব। বাংলাদেশের নারীদের এই চিত্র কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, বরং তা সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থারই প্রতিচ্ছবি। তাই এই গবেষণার বৈশ্বিক প্রেক্ষিতকে পটভূমি হিসেবে আলোচনা করে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন ও রাজনীত উভয় পরিমন্ডলে নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে উভয় পরিমন্ডলে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এবং তখনই প্রয়োজন উভয় প্রত্যয়ের সম্পৃক্ততা। কারণ একদিকে রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ ক্ষমতার মাধ্যমে নারী দীর্ঘদিনের পুরুষাধিপত্যমূলক পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে নারীর প্রতি অনুকূল উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে। পাশাপাশি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে পাবলিক স্পেসে নারীর অংশগ্রহণের স্বীকৃতির মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীর প্রবেশগম্যতা সহজলভ্য করা সম্ভব। এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে একটি তুলনামূলক চিত্রও উপস্থাপন করা হয়েছে। দেখা গেছে উন্নয়ন ও রাজনীতিতে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হলে নারীর ন্যায্য অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

এই গবেষণায় বর্তমান সাধারণ বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির পাশাপাশি এই আশাপ্রদ দৃষ্টান্তসমূহ তুলে ধরে ভবিষ্যতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করে একমূখী উন্নয়নের পরিবর্তে টেকসই উন্নয়নের সম্ভাবনার দিক উন্মোচন করার প্রচেষ্ট নেয়া হয়েছে ।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নম্বর

প্রত্যয়ন পত্র i
উৎস্বর্গ ii
কৃতজ্ঞতা পত্র iii
সারণী ও চিত্র তালিকা iv
শব্দ সংক্ষেপ vii
সারসংক্ষেপ viii

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.১ গবেষণার বিষয়বস্তু ১
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি ৩
১.৩ গবেষণা প্রতিপাদ্য ৫
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি ৭
১.৫ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা ১১
১.৬ অধ্যায় পরিকল্পনা ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: উন্নয়ন, রাজনীতি এবং নারী: প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ

২.১ উন্নয়ন ধারার ব্যাখ্যা ও নারীর অবস্থান ২৩
২.১.১ আধুনিকায়ন উন্নয়ন কৌশল ও মূলধারার উন্নয়নের কতিপয় সমস্যা ২৪
২.২ উন্নয়ন ভাবনায় নারী ও জেন্ডার ফ্রেমওর্য়াক ২৭
২.২.১ নারী উন্নয়ন মতবাদ ২৭
২.২.২ জেন্ডার ফ্রেমওর্য়াক ৩১
২.৩ রাষ্ট্র ক্ষমতা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ৩৪

২.৪ রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর ও নারীর অবস্থান ৩৭

২.৫ নারীর ক্ষমতায়ন ৩৮

২.৬ উন্নয়ন ও রাজনীতিতে লিঙ্গ সমতা
এবং টেকসই উন্নয়ন ধারনার বিকাশ ৪৩

২.৬.১ উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা ৪৪

২.৬.২ নারীর রাজনৈতিক কর্তৃত্বে অংশগ্রহণ
ও উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ৪৬

২.৬.৩ টেকসই উন্নয়ন ধারনার বিকাশ ৪৯

তৃতীয় অধ্যায়: উন্নয়ন ধারনা-বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

৩.১ উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা ৫৫

৩.২ বিশ্বব্যাপী শ্রমশক্তিতে নারীর অবস্থান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী ৫৮

৩.২.১ শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা ও তার মূল্যায়ন ৫৮

☐ কৃষি ও নারী ৫৯

☐ গার্হস্থ্য কাজ ও মজুরীলব্ধ শ্রমের তুলনামূলক পরিমাপ ৬০

☐ শ্রমবাজারে প্রবেশ এবং প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ ৬২

☐ বিভিন্ন খাতে শ্রম বিনিয়োগ ৬৩

৩.২.২ পেশাভিত্তিক অধ:স্তন অবস্থান ৬৪

৩.২.৩ রাষ্ট্রীয় সুযোগ ও অধিকারে বৈষম্য ৬৭

৩.৩ উন্নয়নে নারী: জাতিসংঘের অবস্থান ৬৯

৩.৩.১ জাতিসংঘ চার্টারে নারী ৬৯

৩.৩.২ নারী দশক ও বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সম্মেলন ৭০

৩.৩.৩ জাতিসংঘ কাঠামোয় নারী ৭৪

চতুর্থ অধ্যায়: উন্নয়নে নারী: বাংলাদেশ অভিজ্ঞতা

৪.১ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে 'উন্নয়নে নারী' শীর্ষক ধারনা ৭৮
৪.২ নারীর অধ:স্তন আর্থ-সামাজিক অবস্থান ৭৯
৪.৩ রাষ্ট্রের অবস্থান ও নারী: উন্নয়ন ধারনা ৮১
৪.৩.১ সংবিধানে নারী ৮১
৪.৩.২ রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের দ্বৈততা এবং পুরুষ প্রাধান্য ৮৩
৪.৩.৩ আইন ও বিচার ব্যবস্থা - সামাজিক প্রথা এবং উন্নয়নে নারী ৮৭
৪.৪ নারী ও উন্নয়ন: সরকারী পদক্ষেপ ৮৯
৪.৪.১ সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী ৮৯
৪.৪.২ সরকারী সংস্থাসমূহে নারীর অংশগ্রহণ ৯১
৪.৪.৩ শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী নীতির বাস্তবতা ৯৪
৪.৪.৪ আর্ন্তজাতিক উদ্যোগের ব্যাপারে সররকারের ভূমিকা ৯৫
৪.৫ শ্রমশক্তিতে নারী: উন্নয়ন সম্পৃক্ততা ও প্রতিবন্ধকতা ৯৮
৪.৬ উন্নয়নে নারীর অবস্থান: বে-সরকারী উদ্যোগ ১০৩

পঞ্চম অধ্যায়: রাজনীতিতে নারী: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

৫.১ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ১০৯
৫.২ রাজনীতিতে নারী: অভ্যুদয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা ১১৩
৫.৩ নারীর রাজনৈতিক অবস্থান: সীমাবদ্ধতার চিত্র ১১৫
৫.৪ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব ১১৯
৫.৪.১ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হিসেবে নারী ১২০
৫.৪.২ রাষ্ট্র ও সরকার উপ প্রধান হিসেবে নারী ১২২
৫.৪.৩ মন্ত্রীসভায় নারী ১২৪
৫.৪.৪ নারীর সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব ১২৬
৫.৪.৫ আইনসভায় নারী স্পীকার ১২৯
৫.৫ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ১৩১

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী: অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের সীমাবদ্ধতা

৬.১ রাজনীতিতে নারীর সীমাবদ্ধ অবস্থানের কারণ ১৩৬

৬.২ নারী রাজনীতিকদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ১৩৯

৬.৩ রাজনৈতিক দলসমূহে নারীর অবস্থান ১৪০

৬.৩.১ দলগুলোর মূলনীতি ও নির্বাচনী ইশতিহারে নারী ১৪০

৬.৩.২ রাজনৈতিক দলগুলোর কাঠামোতে নারী ১৪৬

৬.৩.৩ রাজনৈতিক দলের মতাদর্শে নারী ও দলীয় ভূমিকা ১৪৭

৬.৪ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় নারী: তথ্য ও বিশ্লেষণ ১৪৯

৬.৪.১ শীর্ষ পর্যায়ে নারী ১৪৯

৬.৪.২ মন্ত্রীসভায় নারী ১৫০

৬.৪.৩ জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব: সরাসরি ও সংরক্ষিত আসন ১৫৩

৬.৪.৪ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী ১৫৬

৬.৫ নারী আন্দোলন ও রাজনীতিতে ভূমিকা ১৫৮

৬.৬ রাজনীতিতে নারীর অগ্রসরতায় সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা ১৬৫

৬.৬.১ সবকার প্রধান হিসেবে নারীর ভূমিকা পর্যালোচনা ১৬৬

৬.৬.২ নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধির প্রবণতা ১৭১

সপ্তম অধ্যায়: উন্নয়ন ও রাজনীতির সম্পৃক্ততা- তুলনামূলক বিশ্লেবণ

৭.১ রাজনীতি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ এবং অংশীদারিত্ব অর্জন: চিন্তাবিদদের অভিমত ১৭৭

৭.২ নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন: মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের আলোকে ১৭৮

৭.৩ ক্ষমতার পরিমন্ডলে নারী ও উন্নয়নে ভূমিকা: পাশ্চাত্য ও এশীয় অঞ্চলের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ ১৮৪

৭.৩.১ পাশ্চাত্য বিশ্ব: বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর

প্রতিনিধিত্ব ও ইতিবাচক প্রাপ্তি ১৮৫

৭.৩.২ এশীয় অঞ্চল: শীর্ষ পর্যায়ে নারী, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে অপ্রতুল প্রতিনিধিত্ব ১৮৭

৭.৪ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ১৯০

৭.৫ রাজনীতিতে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অংশীদারিত্ব অর্জন: নারীর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের কার্যকারিতা ১৯৩

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার

৮.১ উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর সম অংশীদারিত্ব: টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত ১৯৯

৮.২ উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী: অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ ২০৩

পরিশিষ্ট ২১৫

তথ্যপঞ্জী ২২৮

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ গবেষণার বিষয়বস্তু

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

১.৩ গবেষণা প্রতিপাদ্য

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

১.৫ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

১.৬ অধ্যায় পরিকল্পনা

১.১ গবেষণার বিষয়বস্তু

উন্নয়ন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রত্যয়। কিংবা বলা যায়, উন্নয়ন এমনই একটি প্রত্যয় যা সামগ্রিকতার ধারনা দেয়। উন্নয়নে অংশগ্রহণ, উন্নয়নে অবদান এবং উন্নয়নের ফলে প্রাপ্তি প্রতিটি বিষয়ই উন্নয়ন ধারনার অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন। উন্নয়ন অর্থ একদিকে যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন, তেমনি মানুষের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের এবং শারীরিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ সহ সামগ্রিক উন্নয়ন।[১]

উন্নয়নের পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে রাজনৈতিক শক্তি। উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কতৃর্ত্বের ভূমিকার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা আছে ডেভিড ইষ্টনের সিষ্টেম তত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যায়। তাঁর মতে যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল কাজ হচ্ছে ‘‘সমাজে উপযোগ বা জীবন ধারনের মূল্যবান উপকরণগুলোর প্রভূত্বব্যাঞ্জক বরাদ্দ’’।[২] অন্য কথায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থাই সমাজে অবশ্য পালনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর তা কার্যকর করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই মূল কাজই এই ব্যবস্থাকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে এবং অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে তাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। উপযোগ হলো জাগতিক সম্পদ এবং বরাদ্দ হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গৃহীত ঐসব সিদ্ধান্ত অথবা কার্যকলাপ যা মূল্যবান উপযোগের বিতরণ করে অথবা অস্বীকার করে।[৩]

এই উপযোগ বরাদ্দের সঙ্গে উন্নয়নের ঘনিষ্ট সর্ম্পক বর্তমান। উন্নয়ন যেহেতু একটি সামগ্রিক প্রত্যয় তাই উন্নয়ন বলতে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থার অগ্রসরতা বোঝায়, তেমনি উন্নয়ন পরিমাপের আরেকটি মাপকাঠি হলো সার্বিক মানব উন্নয়ন। এই মানব উন্নয়নের নির্দিষ্ট অর্থ হলো নারী পুরুষের সমতা ভিত্তিক উন্নয়ন। অর্থাৎ উন্নয়নের পূর্ণাঙ্গ মাত্রা অর্জনের জন্য লিঙ্গ সমতাভিত্তিক উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় এই বক্তব্যে ‘‘উত্তর ও দক্ষিণ উভয়ের জন্য এখন আমাদের প্রয়োজন আরেকটি উন্নয়ন। নারীদের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তাদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে। শুধুমাত্র তখনই উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক বিষয় (economic term) হিসেবে বিবেচ্য হবেনা, বরং মানবিক বিষয় হিসেবে বিবেচ্য হবে’’।[৪] এই মত আরো স্পষ্ট হয় এই বক্তব্যে ‘‘চলমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় যেখানে সম্পদ,ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ জণগণের এক ক্ষুদ্র অংশের জন্য সংরক্ষিত সেখানে নারীর জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

কিন্তু, বৃহত্তর ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা এবং নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়''।[৫] আর্ন্তজাতিক এই মতের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় জাতীয় দলিলেও। বাংলাদেশে মানব উন্নয়নের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এভাবে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা ও সমানাধিকারের নীতি সর্বজন গৃহীত হওয়া আবশ্যক। নারী দেশের অর্ধেক নাগরিক, অর্ধেক মানব সম্পদ। কাঙ্খিত উন্নয়ন মাত্রায় নারীর ক্ষমতায়ন বা শক্তি সঞ্চয়ন, সংযোজন সেজন্য একান্ত অপরিহার্য।[৬]

যদিও উন্নয়নের পূর্ণাঙ্গ মাত্রা অর্জনের জন্য নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক উন্নয়নের বিষয়টিতে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে, তবু বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন ক্ষেত্রে প্রচন্ডভাবে লিঙ্গ বৈষম্য বিরাজমান। বৈশ্বিক পর্যায়ে উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব পর্যায়ক্রমে এসেছে। বিভিন্ন নীতি যেমন: আধুনিকায়ন, দারিদ্র বিমোচন, দক্ষতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ধারায় নারীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। তবে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং তার ফলশ্রুতিতে ৮০'র দশকে শুরু হয়েছে উন্নয়নে নারী (Women in Development) নীতি।[৭] যেহেতু পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শুরু থেকে নারী পুরুষ সাম্য বজায় থাকেনি এবং নারীরা রয়ে গেছে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ তাই সাম্য প্রতিষ্ঠায় উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ প্রয়োজন । আর্ন্তজাতিকভাবে নারী দশক উদযাপনের মধ্য দিয়ে নারী উন্নয়ন চিন্তা ব্যাপক রূপ লাভ করেছে। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত এই নারী দশকের মূলনীতি ছিল সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি। ১৯৮৫-র নাইরোবী সম্মেলনে যে Forward Looking Stretegy (FLS) প্রণীত হয় তারও মূলনীতি হলো সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি।[৮] তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫-এ বেইজিং এ চর্তুথ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত হয় Platform For Action (PFA) বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের এক বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা। এতে দারিদ্র, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, নির্যাতন ও সশস্ত্র সংঘাত দূরীকরণ, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান সুযোগ এবং পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ, নীতি নির্ধারণ এবং নেতৃত্বে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের দিক নির্দেশনা খোঁজা হয়েছে।[৯] অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী বস্তুগত ও মানবিক সম্পদের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। পিতৃতন্ত্র ও সকল প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সকল কাঠামোয় নারীর বিরুদ্ধে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন পরস্পর পরিপূরক। রাজনৈতিক শক্তি যেহেতু নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাণকেন্দ্র তাই রাজনীতিতে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ তার ক্ষমতায়নকে তবান্বিত করে যা উন্নয়নের সঙ্গে নারীর

সংযোগকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মুল সূচক হিসাবে কাজ করতে পারে। এ কারণেই নারীর ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।[১০] অর্থাৎ উন্নয়ন ও রাজনীতি যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তাতে নারীর অর্ন্তভূক্তির আবশ্যকীয়তা তুলে ধরা ও তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করাই এই গবেষণার মূল বিষয়।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

- গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণায় রাজনীতি ও উন্নয়ন এই দুটো বিষয়ের সম্পৃক্তিকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হয়েছে। ইতোপূর্বে গবেষণার বিষয়বস্তু আলোচনায় উন্নয়ন এবং রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে লিঙ্গভিত্তিক সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টিতে অত্যন্ত জোর দেয়া হয়েছে। গবেষণার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাঁনোর জন্য তাই শুরুতেই গবেষণার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য স্থির করা একান্ত প্রয়োজন। উন্নয়ন যেহেতু বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যাপক এবং রাজনীতি যেহেতু উন্নয়নের অভীষ্টতা অর্জনে অন্যতম প্রধান নির্ধারক শক্তি তাই উভয়ের পারস্পারিক সম্পর্কের বিষয়টিকে বিবেচনা করে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও দীর্ঘমেয়াদী অর্জনের সম্ভাবনার আলোকে দুই ভাগে পর্যায় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উভয় পর্যায়ের যথাযথ ধারাবাহিকতার মাধ্যমেই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়ন ও রাজনীতি উভয় পরিমন্ডলে নারীর বর্তমান অবস্থা তুলে ধরার প্রেক্ষিতে আগামী দিনের সম্ভাবনার দিক উম্মোচন করা। উন্নয়নে এবং রাজনীতিতে নারীর সীমাবদ্ধ অবস্থান কিভাবে নারীকে সকল ক্ষেত্রে প্রান্তিক করে রেখেছে এই গবেষণার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। একদিকে, রাজনীতিতে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উন্নয়নে নারীর অবদান বৃদ্ধি ও স্বীকৃতি আদায়। অন্যদিকে, নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় পর্যাপ্ত অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করা। এই উভয় পদক্ষেপের সমন্বয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পর্যালোচনা করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

রাজনীতি ক্ষমতায়নের বড় নিয়ন্ত্রণ শক্তি এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই উন্নয়নে নারীর ভূমিকা ও অবস্থানকে বিশ্লেষণ করে উন্নয়ন নীতিমালার মূলধারায় নারীর সম্পৃক্তকরণ সম্ভব এবং বর্তমান প্রান্তিক অবস্থান থেকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে আসবার পথ নিহিত। তাই সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এবং

রাজনীতিতে নারীর বর্তমান অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে তার মূল্যায়ন এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার পথ প্রশস্ত হতে পারে।

তাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে দুটো পর্যায়ে ব্যাখ্যার মাধ্যমে-প্রথমত: নারীর বর্তমান অবস্থার ব্যাখ্যার মাধ্যমে সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা এবং দ্বিতীয়ত: নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনে ইতিবাচক দিক নির্দেশনা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা। তাই গবেষণার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা যায় এভাবে:

১. নারীর অ-স্বীকৃত ও অবমূল্যায়নকৃত অবদানের প্রতি আলোকপাত করা
২. উন্নয়ন ও রাজনীতিতে প্রান্তিক অবস্থান ও পশ্চাৎপদতার ব্যাখ্যা করা
৩. উন্নয়নে নারীর বর্তমান সীমিত অংশগ্রহণের কারণ তুলে ধরা
৪.রাজনীতি ও উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা
৫.সিদ্ধান্তগ্রহণমূলক পর্যায়ে এসে উদ্যোগ গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়ন ধারার পরিবর্তনের সুযোগ ব্যাখ্যা করা
৬.ইতিবাচক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষ বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করা

- গবেষণার পরিধি

গবেষণার উদ্দেশ্য আলোচনায় উন্নয়ন ও রাজনীতির স্বতন্ত্র অবস্থান ও সম্পৃক্ততা উভয় বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। গবেষণার পরিধি নির্ধারণ করতে গিয়ে এই উভয় প্রত্যয়ের সংযোগের বিষয়টিতে ফোকাস করা হয়েছে। উন্নয়ন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রত্যয় হিসেবে বিশাল পরিসরে পরিব্যাপ্ত। রাজনীতির ক্ষেত্রও ব্যাপক। তাই এই গবেষণার পরিধি নির্দিষ্ট রাখবার জন্য রাজনীতি ও উন্নয়নের বৃহত্তর পরিমন্ডলে নারীকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করে ভূমিকা বিশ্লেষণ এবং উভয় পরিমন্ডলের যে যোগসূত্র অর্থাৎ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাজনীতি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বর্তমান সীমিত অবস্থান থেকে উত্তরণ ঘটে ক্ষমতায়ন পর্যায়ে অবস্থান গ্রহণ করে উন্নয়ন নীতিমালাকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ এবং নারীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বর্তমান পশ্চাৎপদতা দূর করে উন্নয়নে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা পর্যন্ত এই গবেষণার পরিধি। ছকের সাহায্যে গবেষণার পরিধি নিদিষ্ট করে দেখানো হয়েছে, যার আলোকে গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে যেতে পারে। 'উন্নয়ন' ও 'রাজনৈতিক অংশগ্রহণ' এই দুটো মূল প্রত্যয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা

পরিব্যাপ্ত হয়েছে:

সারণী: ১.১ 'উন্নয়ন' ও 'রাজনৈতিক অংশগ্রহণ'-এ নারী

<table>
<tr><td colspan="3">উন্নয়নে নারী</td></tr>
<tr><td>আর্ন্তজাতিক শ্রমবাজারে নারী
-প্রাইভেট ও পাবলিক স্পেস ধারনা
-অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা
-অংশগ্রহণের ধারা
-অংশীদারিত্ব অর্জন</td><td>জাতিসংঘ
-চার্টারে নারী
-কাঠামোয় নারী
-গৃহীত উদ্যোগ</td><td>বাংলাদেশ প্রেক্ষিত
-রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ
-সরকারী পদক্ষেপ
-বে-সরকারী উদ্যোগ</td></tr>
<tr><td colspan="3">রাজনীতিতে নারী</td></tr>
<tr><td>আর্ন্তজাতিক প্রেক্ষিত
-রাজনীতিতে নারীর অভ্যূদয়
-বর্তমান সীমাবদ্ধ অবস্থান
-ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া
- ক্ষমতার পরিমন্ডলে নারী
-সক্রিয়তা বৃদ্ধি ও স্থিতিশীল উন্নয়ন</td><td colspan="2">বাংলাদেশ প্রেক্ষিত
-ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত
-নারীর রাজনৈতিক অবস্থানের দ্বৈততা
-সার্বিক অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা
-নারীর রাজনৈতিক সম্ভাবনা</td></tr>
<tr><td colspan="3">রাজনীতি ও উন্নয়ন
রাজনীতি ও উন্নয়নে লিঙ্গ সমতা ও সার্বিক মানব উন্নয়ন</td></tr>
</table>

১.৩ গবেষণা প্রতিপাদ্য

গবেষণা শিরোনাম *উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী: অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব-বাংলাদেশ প্রেক্ষিত-* এর মাধ্যমে একটি বৃহৎ পরিধিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারীর পারস্পরিক সম্পৃক্ততা এবং উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব অর্জনের বিষয়টিতে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। উন্নয়নে নারীর অবস্থানের বিষয়টিকে দেখা হয়েছে এভাবে,

প্রথমত: নারী সম্পুর্ণভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরে নয়, যদিও নারীর বিপুল শ্রম সরাসরি অর্থ উপার্জনকারী নয় বলে অর্থনৈতিক কর্মের স্বীকৃতি পাচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত: নারী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত উন্নয়ন কার্যক্রমে পুরুষের তুলনায় সম হারে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং উন্নয়ন ধারায় প্রান্তিক অবস্থানে টিকে আছে।[১১]

এই দুটো বিষয়ের কেন্দ্রে রয়েছে উন্নয়ন নীতিমালার লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য। কিংবা বলা যায় উন্নয়ন নীতিমালা নারীর প্রতি অনুকূল নয় বলে নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এই দ্বি-মুখী বঞ্চনার শিকার। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে নারীর সঠিক অনুপাতে উপস্থিতির অভাব এবং পুরুষ একাধিপত্যের কারণে একদিকে নারী তার বিপুল উৎপাদনশীল শ্রমের স্বীকৃতি অর্জন করতে পারছে না, অন্যদিকে আধুনিক ও গতিশীল উন্নয়ন ধারায় পুরুষের সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে সনাতন ও প্রাচীন পদ্ধতির কাজে আটকে থেকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে থাকছে। ফলে সার্বিকভাবে নারীর অবস্থান পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর থেকে যাচ্ছে। এভাবেই নারী অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

একইভাবে রাজনীতিতে নারীর অবস্থানের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমত: বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোকে বলা যায় সর্ম্পূণভাবে পুরুষসুলভ এবং নারীর প্রতি দূরত্ব জ্ঞাপক কিংবা বলা যায় একেবারেই নারীসুলভ নয় বা নারীর জন্য সুগম নয়।[১২] ফলে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের হার অত্যন্ত সীমিত এবং ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। এই পশ্চাৎপদ অবস্থান নারীকে ক্ষমতায়নের সম্ভাবনা থেকে দূরে রেখেছে।

দ্বিতীয়ত: রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর পদচারণার ব্যাপকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষেত্র তৈরী করা সম্ভব। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ বর্তমান পুরুষ একাধিপত্য দূর করে নারীর জন্য এই ক্ষেত্রকে সহজগম্য করে তুলবে। এতে রাজনীতির পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটবে এবং নারীর জন্য ক্ষমতায়নের কাছাকাছি হবার সম্ভাবনা তৈরী করবে, যা একটি লিঙ্গ-বৈষম্যহীন রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় প্রভাবক শক্তি হিসাবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়।

উন্নয়ন ও রাজনীতির পারস্পরিক সর্ম্পকের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে এই উভয় ক্ষেত্রে নারীর অর্ন্তভূক্তির যৌক্তিকতা স্পষ্ট করা যায় নিম্নোক্ত ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে:

চিত্র: ১.২ উন্নয়ন ও রাজনীতি সম্পৃক্ত ফ্রেমওয়ার্ক

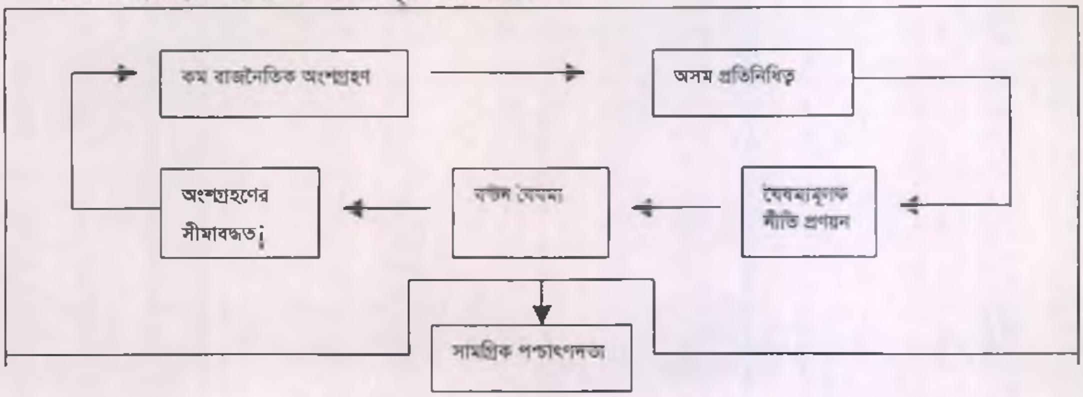

ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণে বলা যায়, উন্নয়ন ও রাজনীতির এই সম্পৃক্ততার কারণে বর্তমানে নারীর অসম হারে প্রতিনিধিত্ব নারীকে পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। সুতরাং উন্নয়ন ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রে নারীর সম্পৃক্তি ঘটানোর মাধ্যমে যে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হবে তা হলো, নারীর বিপুল উৎপাদনশীল শ্রম যা অর্থনৈতিক কর্মের স্বীকৃতি পাচ্ছে না তার স্বীকৃতি নিশ্চিত হবে এবং উন্নয়নের প্রচলিত কাঠামোতে নারীর বঞ্চিত অবস্থানের সমাপ্তি ঘটে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে উন্নয়নের লাভজনক প্রাপ্তি বা ফল নারীর জীবনেও ইতিবাচক পরির্বতন ঘটাতে সক্ষম হবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সম অংশগ্রহণের মাধ্যমে যথাযথ অংশীদারিত্ব অর্জনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ মানব উন্নয়ন প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা নিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাবে।

উন্নয়ন ও রাজনীতির পরিমন্ডলে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীদের যে অনগ্রসর অবস্থান রয়েছে এবং পরিবর্তনের ধারা সূচিত হবার মাধ্যমে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার যে সম্ভাবনা রয়েছে তা এই গবেষণার মূল আলোচ্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে পটভূমি হিসেবে বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থান ও আগামী দিনের ইতিবাচক আশাপ্রদ দিকসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাজনীতি ও উন্নয়ন পরস্পর পরিপূরক এবং এই উভয় ক্ষেত্রে নারীর সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করে দেখানোই এই গবেষণার লক্ষ্য। গবেষণা প্রকল্প গঠন করার ক্ষেত্রে এই বিষয়টিতে জোর দেয়া হয়েছে।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

যে কোন বিষয়ে বিশ্লেষণ ও সংযুক্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে, নিয়মানুগ পথে অগ্রসর হতে হয়। ভিত্তিহীন বক্তব্য নয়, বরং সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব ও পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

এই গবেষণার ক্ষেত্রে সিস্টেম পদ্ধতি অনুসরণ করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করা হয়েছে। সিষ্টেম তত্ত্বের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কোন ব্যবস্থার সামগ্রিক পর্যালোচনা। আনাতোল র‍্যাপপোর্ট বলেছেন, একটি সমগ্র ব্যবস্থা যখন বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে কার্যকর থাকে তখন তাই হয় সিস্টেম।[১৩] এই গবেষণার মূল বক্তব্য এখানে গ্রথিত আছে। রাজনীতি ও উন্নয়ন প্রত্যয় দুটি পরস্পর নিবিড়ভাবে সর্ম্পকিত। সিস্টেম তত্ত্ব সর্ম্পকে আরেকটু দৃকপাত করা হচ্ছে গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্তি স্পষ্ট করার জন্য। এ শতাব্দীর পাঁচ দশকে সিস্টেম তত্ত্বের সমধিক অগ্রগতি সাধিত হয়। এর অগ্রগতির সাথে জড়িত আছেন র্কাল ডয়েচ, মরটন ক্যাপলান, রির্চাড রোজক্রান্স, র্হাবাট স্পিরো, ওরান ইয়ং, লাভউইগ, র্বাটা ল্যানফি, গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড, রশ অ্যাশবি প্রমুখ গবেষক। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নাম ডেভিড ইষ্টন। তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করেছেন পূর্ণাঙ্গরূপে।

ডেভিড ইষ্টনেব মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে,‘ লক্ষ্য স্থির করার, নিজেকে রূপান্তরিত করার এবং পরিবেশের সাথে সামনঞ্জস্য বিধান করার সৃজনমূলক ক্ষমতাসম্পন্ন এক ব্যবস্থা’।[১৪]
প্রত্যেক সিস্টেমের থাকে কিছু ইনপুট ও কিছু আউটপুট। ইনপুট সিস্টেমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও সিস্টেমকে প্রভাবিত করে। আউটপুট সিস্টেম থেকে বের হয় ও পরিবেশকে প্রভাবিত করে। সিস্টেমের তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে

(এক) সিস্টেম হচ্ছে বিশেষ কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ, নির্বাচন ও সংগঠন করবার এক তত্ত্বগত কাঠামো,

(দুই) পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সংগঠিত করার এক সামগ্রিক ব্যবস্থা,

(তিন) বিভিন্ন উপাদান বা অংশ পরস্পরকে প্রতাবিত করে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রত।[১৫]

নিয়ত পরিবর্তনশীল পরিবেশে কিভাবে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা টিকে থাকে তার বিশ্লেষণই সিস্টেম তত্ত্বের মূল লক্ষ্য।

জটিল রাজনৈতিক জীবন সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করতে হবে সমাজের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, শিক্ষার হার তথা সামাজিক জীবনের প্রেক্ষিতে। আর এ ক্ষেত্রেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে গবেষণায় সিস্টেম তত্ত্বের কার্যকারিতা। রাজনীতি ও উন্নয়ন এই দুই মাত্রার পরিক্রমায় নারীর উপস্থিতি তাই বিশেষভাবে প্রয়োজন।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে চলার দক্ষতাসম্পন্ন। পরিবেশে কোন

পরিবর্তন সুচিত হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন সূচিত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য যে সব পরিবর্তন পরিবেশ থেকে সূচিত হয় ইষ্টনের মতে তাই হলো ইনপুট। আবার রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার আউটপুট কার্যাবলীর মাধ্যমেও পরিবেশকে প্রভাবিত করে। পরিবেশ থেকে কোন সংকট উপস্থিত হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কাঠামো ও কার্যপদ্ধতিতে পরির্বতন আনয়ন করে সে সংকটের মোকাবেলা করে। এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত হতে পারে এবং পূর্বের ভারসাম্যেও পরিবর্তন আসতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার আউটপুট হচ্ছে ঐ সকল সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপ যা সমাজে উপযোগ বরাদ্দের ক্ষেত্রে গৃহীত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থাব ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যে সমতা বিধান হলে সে ব্যবস্থা স্থায়ীত্ব লাভ করে।[১৬]

রাজনৈতিক পদ্ধতির কোন কোন সদস্য নীতি, বিধিবিধান এবং সরকার কর্তৃক বলবৎকৃত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাব তথা রাজনৈতিক প্রভাবের অধিকারী হতে চায়। এই রাজনৈতিক প্রভাব সরকারের উপর জণগণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ একজনের লক্ষ্য বা মূল্যমান বৃদ্ধির এত পরিচিত উপায় যে, এমন কোন রাজনৈতিক পদ্ধতি বা ব্যবস্থার কল্পনাই করা যায় না যে ব্যবস্থায় কেউ ক্ষমতা চায়না।[১৭]

জনগণ যে প্রভাব প্রয়োগ করে তার পরিমাণগত পার্থক্য সাধারণত সরাসরি তিনটি মৌলিক ব্যাখ্যামূলক কারণে হয় বলে ধরা যেতে পারে:

১.রাজনৈতিক সম্পদ বন্টনে পার্থক্য। রাজনৈতিক সম্পদ এমন এক জিনিষ যা দিয়ে একজন লোক অন্য ব্যাক্তির আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। এ কারণে টাকা, তথ্য, খাদ্য, শক্তি প্রয়োগের ভয়, চাকরি, বন্ধুত্ব, সামাজিক অবস্থান, আইন প্রণয়ণের অধিকার, ভোট এবং আরও অনেক ধরণের জিনিষ রাজনৈতিক সম্পদ হিসাবে গণ্য।

২.জনগণ তাদের রাজনৈতিক সম্পদগুলি যে নৈপূণ্য বা দক্ষতায় কাজে লাগায় সেই দক্ষতা ও নৈপুন্যের তারতম্য। আবার মেধা, সুযোগ-সুবিধা এবং রাজনৈতিক দক্ষতার শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রেরণা থেকেও রাজনৈতিক দক্ষতার তারতম্য হয়ে থাকে।

৩ জনগণ যে পরিসরে তাদের সম্পদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়ে থাকে সেই পরিসরের তারতম্য। এই তারতম্য বা পার্থক্যগুলির কারণ তাদের প্রেষণার পার্থক্যে নিহিত। এই প্রেষণার তারতম্য আবার উদ্ভুত হয় সুযোগ-সুবিধা ও অভিজ্ঞতার পার্থক্যের কারণে।[১৮]

আর এ কারণেই উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীদের ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততার প্রয়োজন জোরালোভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বর্তমান অবস্থায় নারীর অবস্থান প্রান্তিক বলে তারা প্রভাবশালী সদস্য হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারে না। নারী যখন সক্রিয় অংশগ্রহণের কর্তৃপক্ষের কাছাকাছি আসবে এবং কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় আর্বিভূত হবে কেবলমাত্র তখনই নারীর সমস্যা এবং নারীর স্বার্থ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় আসবে। উন্নয়নের মূল ধারায় নারী বৈষম্যহীন ভাবে অর্ন্তভূক্ত হবে।

গবেষণায় সিষ্টেম তত্ত্বকে সামনে রেখে 'উন্নয়ন' ও 'রাজনীতি'র প্রেক্ষিত বিশ্লেষণপূর্বক উভয়ের সম্পৃক্তি তুলে ধরে প্রকল্পের যর্থাথতা যাচাইয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়নের জন্য মূলত: বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার আলোকে 'উন্নয়ন' ও 'রাজনীতি'র অতীত প্রেক্ষাপট সহ ধারাবাহিক পর্যায়ক্রম অনুসরণ করে তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। উন্নয়ন ও রাজনীতি সম্পর্কে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে এবং বাংলাদেশে যে সকল কাজ হয়েছে তার আলোকে বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণাপত্র, বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং জাতিসংঘ প্রকাশিত বিভিন্ন বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উন্নয়ন ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্যের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিভিন্ন উপাত্তের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত চিত্র বের করে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বিগত সময়ের এই সংক্রান্ত কাজের ধারাবাহিকতা হিসাবে নতুন কিছু সংযোজন এবং পূর্ণাঙ্গতা প্রদানের ব্যাপারে মনযোগ দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে গবেষণা প্রকল্পের যথার্থতা প্রমাণ যুক্তিযুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

- তথ্য অনুসন্ধান

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য মূলত: ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এমন সূত্র ব্যাবহার করা হয়েছে। আর্ন্তজাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে ইতোমধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থ, জার্ণাল, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রতিবেদন, বিভিন্ন সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, গবেষণা পত্র এবং অন্যান্য উৎস হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে বিভিন্ন পাঠাগার/লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১. উইমেন ফর উইমেন

২. বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি.আই.ডি.এস)

৩. স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট

৪.সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৬. ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স (ফেমা)

৭. বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ

৮. প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

৯. সি.ডি.এল

এছাড়া ব্যাক্তিগতভাবে সংগৃহীত বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীর সাহায্য নেয়া হয়েছে তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে। আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন ডাটাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ওয়েবসাইটের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

১.৫ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণা কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রকাশিত মৌলিক তথ্যসূত্র, প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা পাঠের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন ও নারী: ধারনা বিশ্লেষণ

বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

'উন্নয়ন ও নারী' একটি ব্যাপক ধারনা। আর্ন্তজাতিক পরিসরে এই বিষয়ে অনেক কাজ হয়েছে ইতোমধ্যে। এই গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে ধারনা নেয়া হয়েছে। সেগুলো থেকে নারী ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দিক নির্দেশক প্রকাশনা সর্ম্পকে আলোচনার মাধ্যমে একটি ধারাবাহিক চিত্র পাওয়া যায়। প্রথমেই উন্নয়ন ধারনার স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। উন্নয়নে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ এবং অবদান সর্ম্পকে Easter Boserup Women's Role in Economic Development গ্রন্থটি মৌলিক এবং অগ্রগণ্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নে আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে নারীদের অংশগ্রহণ এবং অবদানের পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীদের ভূমিকার পরিবর্তন সর্ম্পকে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উন্নয়নে নারী সর্ম্পূণ বিচ্ছিন্ন নয়। উন্নয়নের ব্যাপক কর্মপরিধিতে নারীর বিপুল অবদান রয়েছে যা কর্মের স্বীকৃতি পাচ্ছেনা। তাই নারীর সম্পৃক্তি রয়েছে অথচ মূল্যায়ন নেই। আবার উন্নয়ন নীতিমালায় নারীর কেন্দ্রীক অবস্থান নেই বলে নারীর অবস্থান অনগ্রসর। প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থান সর্ম্পকে প্রকৃত

চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন। Rounaq Jahan ও Hanna Papanek সম্পাদিত Women in Development Perspective from South and South East Asia গ্রন্থে এ বিষয়ে ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে এশীয় প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের নারীদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা রয়েছে। পাশাপাশি রাষ্ট্রভেদে অবস্থার বৈপরীত্য নিয়েও আলোচনা রয়েছে।

উন্নয়নে নারীর অবমূল্যায়নকৃত অবস্থার ধারনা পাওয়ার পর বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে নারীর অবস্থানের চিত্র তুলে ধরা যায়। বিশ্ববাজারে নারীর শ্রম, সিদ্ধান্ত প্রণয়নে নারীর প্রান্তিক অবস্থানের কারণে কর্মের স্বীকৃতি পাচ্ছেনা। নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং তা থেকে উত্তরণ জরুরী। নারী-পুরুষ বৈষম্যমূলক অবস্থা সর্বত্র লক্ষ্যণীয়। এই বিষয়গুলোতে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে জাতিসংঘ প্রকাশনা Women: Looking Beyond 2000 এর Women and Economic Decision Making নিবন্ধে।

নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থান সর্ম্পকে ধারনা প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যেমন- কৃষি, শিল্প, চাকুরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নারীদের তুলনামূলক অবস্থান নিয়ে পরিসংখ্যানগত উপাত্ত থেকে নারীর সীমাবদ্ধ অবস্থান সর্ম্পকে স্পষ্ট ধারনা সংগ্রহ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হচ্ছে জাতিসংঘ প্রকাশিত বিশ্ব প্রতিবেদন The World's Women 1995-Trends and Statistics. শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণের ধরন, আয় বৈষম্য, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রের গৃহীত উদ্যোগ যেমন- কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্রে গৃহীত পদক্ষেপ সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে Asian Women জার্ণালের Choi Kyong Su রচিত প্রবন্ধ 'The Economic and Political Representation of Women in Advanced Countries and Korea'-তে।

বিশ্ব ব্যবস্থার ধরনের উপরও নারীর শ্রমের ধরন প্রভাবিত হয়। সংস্কার পরবর্তী অবস্থায় একদিকে যেমন নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, তেমনি গার্হস্থ্য স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাধ্য হয়ে কাজে যেতে হচ্ছে- এই দ্বি-মুখী সমস্যাকে তুলে ধরেছে বিশ্বব্যাংকের From Plan to Market: World Development Report 1996. ষ্টেপ টুওয়ার্ডস প্রকাশিত উন্নয়ন পদক্ষেপ জার্ণালে কমলা ভাসিন রচিত প্রবন্ধ প্রচলিত উন্নয়ন বনাম টেকসই উন্নয়ন- এ প্রচলিত উন্নয়ন ধারায় নারীর অবস্থান এবং টেকসই উন্নয়ন

প্রতিষ্ঠায় করণীয় সর্ম্পকে সুগভীর আলোচনা করা হয়েছে।

নারীর অবস্থান সর্ম্পকে বিশ্ব পরিস্থিতি জানার প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আর্ন্তজাতিক সর্বোচ্চ সংস্থা জাতিসংঘের ভূমিকা জানাও গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘ শুরু থেকেই বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে উন্নয়নে নারীর মর্যদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। আর্ন্তজাতিক নারী বর্ষ উদযাপনের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন সম্মেলনে এই প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আর্ন্তজাতিক নারী সম্মেলনের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে পদক্ষেপ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। রচিত হয়েছে CEDAW কনভেনশন। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন এ বিষয়ে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘের নারী ইস্যু সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা সমৃদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে Hilkka Pietila ও Jeanne Vickers রচিত Making Women Matter-the Role of the United Nations.

সর্বশেষ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন বেইজিং সম্মেলন সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনাও গবেষণার সুবিধার্থে আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। সম্মেলনে গৃহীত বারোটি নির্দিষ্ট চিহ্নিত সমস্যা সর্ম্পকে পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেইজিং কর্মপরিকল্পনা একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। এ বিযয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে আয়েশা খানম অনুদিত বেইজিং কর্মপরিকল্পনা রচনায়। এছাড়া সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে ইউনিসেফ, ইউএনডিপি আয়োজিত ওর্য়াকশপ, সেমিনার বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিশ্ব প্রতিবেদন স্পষ্ট ধারনা দিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী নারীর অবস্থান বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ দিক জেন্ডার ফ্রেমওর্য়াক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে Candida March, Ines Smyth এবং Maitrayee Mukhopadhyay রচিত গ্রন্থ A Guide to Gender-Analysis Frameworks বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। এক্ষেত্রে Caroline O.N.Moser এর গ্রন্থ “Gender Planning and Development: Theory, Practise and Training” অত্যন্ত কার্যকর। ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহিত একটি ILO report A conceptual framework for gender analysis and planningও এই বিষয়ে উপযোগী।

উন্নয়নে নারীর প্রান্তিক অবস্থান ও অব-মুল্যায়নকৃত শ্রমের ব্যাপক আলোচনার পাশাপাশি

এই সীমাবদ্ধতা উত্তরণের উপায় সর্ম্পকে বিভিন্ন সুপারিশ উত্থাপিত হয়েছে উপরোক্ত প্রকাশনাগুলোতে। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে নারীর কেন্দ্রীয় ধারায় স্বীকৃতি, পুনরুৎপাদনমূলক কাজের স্বীকৃতি, উৎপাদনমূলক কিন্তু সরাসরি অর্থ আয়কারী নয় এমন কাজের পরিসংখ্যানগত অর্ন্তভূক্তির পাশাপাশি আধুনিক কর্মজগতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে ‘ নারী ও উন্নয়ন’ সংক্রান্ত প্রায় সকল গ্রন্থ ও প্রকাশনায়।

এই গবেষণায় আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে রচিত বিভিন্ন রচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য যে সকল গ্রন্থাদি ব্যাবহার করা হয়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অধিক তথ্য সমৃদ্ধ প্রকাশনা সর্ম্পকে এখানে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশে উন্নয়ন ধারার বিশ্লেষণ করতে গেলে রাষ্ট্র, সরকার, বে-সরকারী সংগঠন সকল দিক থেকে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। প্রথমেই জানা প্রয়োজন রাষ্ট্রের মৌলিক দর্শনের কথা। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সংবিধান সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান থেকে সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ নেয়া হয়েছে। যে কোন রাষ্ট্রের উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত নারী: প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি গ্রন্থের সুরাইয়া বেগমের প্রবন্ধ ‘রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ এবং অংশগ্রহণের সংকট : পরিপ্রেক্ষিত নারী’ এবং মেঘনা গুহ ঠাকুরতা রচিত প্রবন্ধ বাংলাদেশের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য ও নারী সমাজ এই দুটো প্রবন্ধ বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মতাদর্শিক ভিন্নতা ,রাষ্ট্রীয় চরিত্রের ধরন বিশ্লেষণ, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত উদ্যোগ, কর্মের সুযোগে নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যেহেতু সরকারের নীতিমালার সমষ্টি তাই এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ সর্ম্পকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে। এছাড়া বাংলা একাডেমী প্রকাশিত তাহমিনা আখতারের, ‘উন্নয়ন পরিকল্পনা ও মহিলা: মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট’ গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ নিয়ে পর্যায়ক্রমিক আলোচনায় প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় এই গ্রন্থে।

চলমান অবস্থা সর্ম্পকে জানার জন্য The Fifth Five Year Plan. 1997-2000, Planning Commission, Ministry of Planning, Govt. of Peoples Republic of Bangladesh উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী ও শিশু মন্ত্রনালয়ের আওতায় নারীর উন্নয়নে বিস্তৃত আলোচনা যেমন পূর্ববর্তী পরিকল্পনার মুল্যায়ন, ইস্যু ও বাধাঁগুলোর আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি বর্তমান পরিকল্পনায় নারীর উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগ ও কৌশল সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহীত উদ্যোগ ও কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থান এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে University press ltd. প্রকাশিত Hossain Zillur Rahman এবং Mahbub Hossain সম্পাদিত Rethinking Rural Poverty-Bangladesh as a case study গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান জানতে চাইলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান জানা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে Bangladesh Bureau Of Statistics প্রকাশিত বিভিন্ন বছরের Statistical year book বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ থেকে রোকেয়া কবীরের, বাংলাদেশ নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান প্রকাশনাটিও একটি তথ্যভিত্তিক প্রকাশনা। এতে রাষ্ট্রের অবস্থান নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন-প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সরকারী বিভিন্ন শ্রেণীর চাকুরি, শিল্প অর্থাৎ বিভিন্ন খাতে নারী- পুরুষের অবস্থান পরিসংখ্যানগতভাবে তুলে ধরা হয়েছে যার মাধ্যমে নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থান সর্ম্পকে সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়।

আর্ন্তজাতিক দলিলের বিষয়ে রাষ্ট্রের মনোভাব এবং ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে সমাজ নিরীক্ষণে প্রকাশিত মালেকা বেগমের প্রবন্ধ 'নারীর সম অধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ' এবং বেইজিং প্লাস ফাইভ রিভিউ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি, বেইজিং প্লাস ফাইভ-পর্যালোচনা প্রতিবেদন জুন-২০০০ বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য। এই দুটি রচনাতেই নারী আন্দোলনের সূচনা, জাতিসংঘের ঘোষণা, বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত দলিলের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা ও পূর্ণতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থান এবং দলিল সম্পর্কে বাংলাদেশের অবস্থান তথা স্বীকৃতি এবং কয়েকটি ধারায় অস্বীকৃতি প্রদান সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে। এবং দলিল বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বিষয়ে অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

রাজনীতি ও নারী: ধারনা বিশ্লেষণ

বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

রাজনীতিতে নারীর অবস্থান সর্ম্পকে আলোচনায় প্রথমেই রাজনীতির ব্যাপকতা, বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র সর্ম্পকে জানা প্রয়োজন। Robert A. Dal রচিত Modern Political Analysis গ্রন্থটি যা মঈনউদ্দীন আহমেদ কর্তৃক আধুনিক রাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ নামে অনুদিত হয়েছে এবং বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, অন্যতম কার্যোপযোগী গ্রন্থ। রাজনীতিকে তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পর্যালোচনা ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই গ্রন্থটি গবেষণাকে তথ্যসমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অবদান রেখেছে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ভূমিকা ও উন্নয়ন ও রাজনীতির সম্পৃক্ততার বাস্তবতা সাপেক্ষে এই গবেষণায় নির্দিষ্ট তত্ত্ব অনুসরণের ক্ষেত্রে এমাজউদ্দীন আহমেদ রচিত তুলনামুলক রাজনীতি: রাজনৈতিক বিশ্লেষণ গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজনীতিতে নারীর অবস্থান সর্ম্পকে আলোচনায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলো নারীর রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের ইতিহাস। এ বিষয়ে Rita Mae Kelly and Mary A. Boutilier রচিত The Making of Political Women গ্রন্থটি যা নূরুল ইসলাম খান কর্তৃক অনুদিত হয়েছে রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয় নামে, বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বিশ্বব্যাপী রাজনীতিতে নারীর অবস্থান সর্ম্পকে তত্ত্বগত ধারনা ও সামাজিক জটিল ম্যাট্রিক্স সর্ম্পকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় Barbara J. Nelson ও Najma Chowdhury সম্পাদিত Women and politics Worldwide গ্রন্থে। এতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পৃথক ও স্বতন্ত্র অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

রাজনীতির পুরুষ কেন্দ্রীকতা এবং নারীর সীমিত পরিসরে অংশগ্রহণ সর্ম্পকে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায় নাজমা চৌধুরী 'নারী ও রাজনীতি' গ্রন্থে। এতে বিভিন্ন প্রবন্ধে নারীর প্রান্তিক অবস্থান ও সম্ভাবনা সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে। Roushan Jahan ও অন্যান্য সম্পাদিত Empowerment of Women- Nairobi to Beijing (1985-1995) গ্রন্থটিও কার্যকর।

নারীর ব্যাপকহারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতার পরিমন্ডলে নারীর অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা

সর্ম্পকে অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও শক্তিশালী গ্রন্থ Rehman Sobhan লিখিত Planning and Public action for Asian Women. এক্ষেত্রে নাজমা চৌধুরী এবং অন্যান্য সম্পাদিত নারীর ক্ষমতায়ন' উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, টাস্কফোর্স প্রতিবেদন-দ্বিতীয় খন্ড, বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নারীর রাজনৈতিক ভূমিকা দৃঢ়করণের ব্যাপারে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম সম্পাদিত গ্রন্থ 'নারী: প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি' গ্রন্থটিও নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ।

নারীর রাজনৈতিক ভূমিকা নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা অগ্রগণ্য। সুতরাং বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শ সর্ম্পকে জানবার জন্য যে সকল রাজনৈতিক দলসমূহের গঠনতন্ত্র ও নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র ২০০১, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, গঠনতন্ত্র ও পার্টির আর্দশ, সংশোধিত সংস্করণ ও ঘোষণাপত্র ২০০১, জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ইশতিহার ২০০১, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, গঠনতন্ত্র ও নির্বাচনী মেনিফেস্টো ২০০১, ১১ দল, নির্বাচনী ইশতিহার ২০০১।

নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সর্ম্পকে বিভিন্ন গ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলেও এই আলোচনায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনাসমূহ সর্ম্পকেই শুধু আলোচনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত প্রকাশনাসমূহের পাশাপাশি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে কাজ করেছে বিভিন্ন বিশ্ব প্রতিবেদন। উন্নয়নের পূর্ণাঙ্গ মাত্রা নির্ধারণ ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের পারস্পরিক সম্পুরকতাকে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন ও যর্থাথতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে Human Development Report 1999 বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছে। শুধূ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে যে প্রকৃত মানব উন্নয়ন অর্জিত হয়না এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে প্রকৃত কাংখিত উন্নয়ন মাত্রা অর্জনের পথ উম্মুক্ত হতে পারে তা বিভিন্ন রাষ্ট্রের অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিমাপক ইনডেক্সের তুলনামূলক পরিমাপের মাধ্যমে।

যদিও গবেষণার প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন রচনাবলীর সাহায্য নিতে হয়েছে, তবু এই আলোচনায় সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশনাসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে।

১.৬ অধ্যায় পরিকল্পনা

সম্পূর্ণ গবেষণা চিন্তাকে রূপায়িত করার জন্য বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের সুবিধার্থে মোট আটটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় মূলত: গবেষণার পরিচিতিমূলক অধ্যায়। গবেষণার বিষয়বস্তু তুলে ধরার পাশাপাশি এই গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি এবং পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা রয়েছে এই অধ্যায়ে। উন্নয়ন, রাজনীতি এবং নারীর সম্পৃক্ততা এবং উন্নয়ন ও রাজনীতির পরিমন্ডলে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করাই এই গবেষণা কর্মের লক্ষ্য। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার যৌক্তিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় মুলত: ধারনা বিশ্লেষণমূলক অধ্যায়। যে কোন বিষয়ে গভীর ও বিস্তৃত ধারনা লাভের জন্য নির্দিষ্ট প্রত্যয়সমূহের সুস্পষ্ট ও ব্যাপক আলোচনা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে 'উন্নয়ন' ও 'রাজনীতি' সর্ম্পকে ঐতিহাসিক চিন্তা এবং তত্ত্বগত ধারনা বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই উভয় ক্ষেত্রে নারীর অর্ন্তভূক্তির বিষয়ে যথাযথ মতাদর্শিক ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় মূলত: বৈশ্বিক পরিমন্ডলে উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড এবং তাতে নারীর অবস্থান সর্ম্পকে পর্যালোচনামূলক অধ্যায়। গবেষণার মূল লক্ষ্য বাংলাদেশ প্রেক্ষিত আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায় বিশ্ব পর্যায়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আলোচনার মাধ্যমে পটভূমিকার কাজ করেছে। তথ্যবহুল এই অংশের আলোচনায় বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন পরিক্রমায় নারীর ভুমিকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি বর্তমান সময়ে আর্ন্তজাতিক শ্রমবাজারে নারীর অবস্থান, পেশাগত ভিন্নতা, উন্নয়ন কার্যক্রমে লিঙ্গ বৈষম্য সর্ম্পকে প্রায়োগিক ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি আর্ন্তজাতিক সর্বোচ্চ সংস্থা জাতিসংঘের ভূমিকা ও অবস্থান নিয়েও তথ্যবহুল আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনার সূচনা। বৈশ্বিক অবস্থান বিশ্লেষণের পর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ধারায় নারীর অবস্থান নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনাই এই অধ্যায়ের আলোচ্য। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে সামাজিকভাবে নারীর সার্বিক অবস্থান এমনিতেই পশ্চাৎপদ। সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নারী পুরুষের সমান মর্যদাপ্রাপ্ত। কিন্তু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ মতাদর্শিক সংকট তথা পরিবর্তন নারীকে অনগ্রসর করে রেখেছে বরাবর। তাই উন্নয়ন পরিক্রমায় নারীকে পুরুষের সাথে সম হারে অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি।

তাছাড়া রাষ্ট্রীয় জীবনে একইসঙ্গে সিভিল ল’ এবং পারিবারিক আইনের ব্যবহার নারীর যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হয়েছে। তারপরও নারী বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। এই অধ্যায়ের আলোচনায় নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী, সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর জন্য গৃহীত উদ্যোগ, বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবস্থানগত ভিন্নতা এবং তার প্রকৃত কারণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবস্থান সংক্রান্ত পটভূমিমূলক আলোচনা। আর্ন্তজাতিক রাজনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অভ্যুদয় ও সীমাবদ্ধ অবস্থান, পুরুষ পরিবেষ্টিত পরিবেশে নারীর ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ, ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব অর্জন ও চর্চার ধরন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি বিস্তৃত ও তথ্যসমৃদ্ধ চিত্র তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় বৈশ্বিক পরিমন্ডলে নারীর রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবস্থানগত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ের আলোচনায়। বিশ্বের স্বল্প কয়েকটি নারী নেতৃত্বের দেশের একটি বাংলাদেশ। পরপর তিনবার নারী সরকারপ্রধান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, যা বিশ্বে বিরল দৃষ্টান্ত এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক আবহে ঠিক স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হয়না। সুতরাং এই নারী নেতৃত্বকে ঘিরে বহু প্রশ্ন এবং আগ্রহের দিক রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজনীতির ক্ষেত্রে আসবার সুযোগপ্রাপ্ত এই দুজন নারী নেতৃত্ব বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সঠিক চিত্র তুলে ধরেন না। নারীর প্রতি বিরূপ রাজনৈতিক পরিবেশ এখনো নারীদের রাজনীতিতে ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ থেকে দূরে রেখেছে। ব্যতিক্রম যে কয়েকজন দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে জড়িত রয়েছেন, তাদেরও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। রাজনৈতিক দল, জাতীয় সংসদ, মন্ত্রীসভা- রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের এই পর্যায়ভিত্তিক অগ্রগতিতে নারীর অবস্থান নিতান্তই গৌণ। রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ অবস্থান অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেও নারীর অবস্থানকে সীমিত করে তোলে। রাজনীতিতে নারীদের সীমিত হারে অংশগ্রহণের ধারার কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা তার সার্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে এই অধ্যায়ের আলোচনা।

সপ্তম অধ্যায় মূলত: পর্যালোচনামূলক অধ্যায়। ইতোপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনায় উন্নয়ন ও রাজনীতি সর্ম্পকে ধারনা লাভের পাশাপাশি বাংলাদেশের উন্নয়ন ও রাজনৈতিক

পরিমন্ডলে নারীর অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার যৌক্তিকতা স্পষ্ট করার জন্য বৈশ্বিক পর্যায়ে উন্নয়ন ও রাজনীত উভয় ক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে এসে উন্নয়ন ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পৃক্ততা এবং সংযোগ বিষয়টিতে বিশেষভাবে ফোকাস করা হয়েছে। লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে জোরালোভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্ট নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা যায়, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ব্যাপক হারে নারীর প্রতিনিধিত্ব তৈরী হয়নি। মোটামুটি উল্লেখযোগ্য সময়কাল ধরে দু'জন নারী রাজনীতির কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছেন। ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের এই উপস্থিতি রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে তা এই অধ্যায়ের আলোচনায় এসেছে। উন্নয়ন ধারায় নারীর অংশগ্রহণ কোন পর্যায়ে পৌছাঁতে পেরেছে, সে সম্পর্কেও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনীতি ও উন্নয়নের মূলধারায় নারীর অবস্থান কিভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় হচ্ছে সর্বশেষ অধ্যায়। এটি মূলত: গবেষণার পরিসমাপ্তির অংশ। ইতোপূর্বে আলোচিত বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষে গবেষণার প্রতিপাদ্যের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করে দেখানো হয়েছে এই অধ্যায়ের আলোচনায়। উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপ্তির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যথাযথ অংশীদারিত্ব অর্জনের বিষয়ে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের যে প্রচেষ্টা এই গবেষণায় করা হয়েছে, তার মূল বক্তব্য সংগ্রথিত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। সবশেষে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন ও রাজনীতির পরিমন্ডলে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে কিছু সুপারিশ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

উপসংহারে এসে বলা যায়, প্রথম অধ্যায় ছিল গবেষণা কাজের পরিচিতিমূলক আলোচনা। গবেষণার বিষয়বস্তু নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও উন্নয়নে অবস্থান নিয়ে এই গবেষণার ধারা এগিয়েছে। রাজনীতিতে নারীর বর্তমান সীমাবদ্ধ অবস্থানের ফলে উন্নয়নে পশ্চাৎপদ অবস্থান এবং ভবিষ্যতে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নে অগ্রসর অবস্থান অর্জন করার পথ প্রশস্ত হতে পারে- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গবেষণা কাজ অগ্রসর হয়েছে এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশিকা

১. Hilkka Pietila and Jeanne Vickers, *Making Women Matter-the Role of the United Nation,* United Nations.

২.এমাজ উদ্দীন আহমেদ, *তুলনামূলক রাজনীতি: রাজনৈতিক বিশ্লেষণ,* বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৯১, এ- লেখক কর্তৃক অনূদিত। (মূল রচনা: David Easton, *A Framework for Political Analysis*, Englewood Cliffs.N.J. Prentice Hill. 1965)

৩.এমাজ উদ্দীন আহমেদ, *তুলনামূলক রাজনীতি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

৪.DAWN Report, *Women and the new international economic order*, NGO conference, 1982.

৫. Hilkka Pietila and Jeanne Vickers, op.cit.

৬. পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *টাস্কফোর্স প্রতিবেদন,* মার্চ, ১৯৯১।

৭.আবেদা সুলতানা, "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী- উন্নয়নের ভিত্তি ঃ একটি বিশ্লেষণ", *ক্ষমতায়ন,* ১৯৯৮,সংখ্যা: ২, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা।

৮. Hilkka Pietila and Jeanne Vickers, op.cit

৯.আয়েশা খানম, *বেইজিং কর্মপরিকল্পনা*

১০.শাহীন রহমান, *উন্নয়ন পদক্ষেপ,* ষ্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা।

১১.Rownaq jahan & Hanna Papnek, *Women in Development perspective from South and South East Asia,* Bangladesh Institute of Law and Affairs.

১২.*Website,* "women in Politics: Beyond Numbers-women in Parliaments: Beyond Numbers-"Gender and Democracy-Why?'' *International IDEA Women in Politics: Women In parliament: Gender and Democracy,* http://www.idea.int/women/parl/ch1a.htm, 11.9.2000.

১৩.এমাজউদ্দীন আহমেদ, *তুলনামূলক রাজনীতি: রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৫

১৪. এমাজ উদ্দীন আহমেদ, পূর্বোক্ত এ- লেখক কর্তৃক অনূদিত। (মূল রচনা: David Easton, op.cit, p.92)

১৫. এমাজউদ্দীন আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০

১৭. রবার্ট এ ডাল রচিত ও মঈনউদ্দীন আহমেদ অনূদিত *আধুনিক রাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩। (মূল রচনা: হ্যারল্ড ডি.লাসওয়েল ও আব্রাহাম ক্যাপলান, *পাওয়ার অ্যান্ড সোসাইটি*, নিউ হাভেন, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫০)

১৮. পূর্বোক্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

উন্নয়ন, রাজনীতি এবং নারী: প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ

২.১ উন্নয়ন ধারার ব্যাখ্যা ও নারীর অবস্থান

২.১.১ আধুনিকায়ন উন্নয়ন কৌশল ও মূলধারার উন্নয়নের কতিপয় সমস্যা

২.২ উন্নয়ন ভাবনায় নারী ও জেন্ডার ফ্রেমওয়ার্ক

২.২.১ নারী উন্নয়ন মতবাদ

২.২.২ জেন্ডার ফ্রেমওয়ার্ক

২.৩ রাষ্ট্র ক্ষমতা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব

২.৪ রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর ও নারীর অবস্থান

২.৫ নারীর ক্ষমতায়ন

২.৬ রাজনীতিতে লিঙ্গ সমতা এবং টেকসই উন্নয়ন ধারনার বিকাশ

২.৬.১ উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা

২.৬.২ নারীর রাজনৈতিক কর্তৃত্বে অংশগ্রহণ ও উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা

২.৬.৩ টেকসই উন্নয়ন ধারনার বিকাশ

উন্নয়ন ও রাজনীতি দুটি স্বতন্ত্র প্রত্যয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে নিবিড় সর্ম্পক বিদ্যমান। এবং নারীর অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই এই উভয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই গবেষণায় তাই প্রচেষ্টা রয়েছে উন্নয়ন ও রাজনীতি দুটো স্বতন্ত্র বিষয়ের প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি এই ত্রয়ী প্রত্যয়ের পারস্পরিক সর্ম্পকের বিষয়কে প্রতিভাত করা। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালনকারী হিসেবে কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে উন্নয়নের কৌশল তৈরী এবং তা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অপরিহার্য ও সর্বাপেক্ষা নিয়ামক ভূমিকা স্পষ্ট হয়। উন্নয়ন ধারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক ও যুগোপযোগী হওয়ার আড়ালে উন্নয়ন একদিকে যেমন সমাজের নির্দিষ্ট অংশের তথা ধনীক ও পুরুষ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তের্মনি আবার অভিজ্ঞতার আলোকে ধারা পরিবর্তন করে, বর্তমানে বিকল্প উন্নয়ন ধারা আলোচিত হচ্ছে যা স্থায়িত্বশীলতাকে গুরুত্ব প্রদান করে, নারীর অংশগ্রহণ ও অবদানকেও ধারণ করে। উন্নয়নে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন চিন্তা কাজ করছে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে ভূমিকা রাখার জন্য নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বিশেষ করে রাজনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। উন্নয়নকে শুধু প্রবৃদ্ধি অর্থে বিবেচনা না করে লিঙ্গ সমতাভিত্তিক প্রকৃত মানব উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীকে উন্নয়নের কেন্দ্রে আনয়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এবং সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সুতরাং উন্নয়ন ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পৃক্ততার গুরুত্ব বিবেচনা করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ও রাজনৈতিক পরিধিতে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা এবং উভয়ের যোগাযোগ ও সম্পৃক্তি আলোচনার কেন্দ্রে আনার প্রয়াস রয়েছে এই অধ্যায়ের আলোচনায়।

২.১ উন্নয়ন ধারার ব্যাখ্যা ও নারীর অবস্থান

গবেষণার প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় উন্নয়ন ধারনার ব্যাপ্তি ও নারীর অংশগ্রহণের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের আলোচনায় উন্নয়ন ধারার বর্তমান কাঠামো এবং তাতে নারীর অবস্থান নিয়ে সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার প্রেক্ষিতে বিকল্প উন্নয়ন চিন্তার ধারনা পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

২.১.১ আধুনিকায়ন উন্নয়ন কৌশল ও মূলধারার উন্নয়নের কতিপয় সমস্যা

বর্তমানে অনুসৃত উন্নয়ন মডেল প্রধানত দ্রব্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে, জীবনের অন্যান্য সব দিককে উপেক্ষা করে কেবল বস্তুগত দিক ও অর্থনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এ কারণে কোন দেশের উন্নয়ন এবং জনগণের সমৃদ্ধির মাপকাঠির নির্ধারক হলো দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন। যা কিছু উৎপাদন করা হয় এবং বাজারে বিক্রি করা হয় তার দ্বারাই এই জিএনপি বা জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। মাদক দ্রব্য উৎপাদন, আগ্নেয়াস্ত্র উৎপাদন, অশ্লীল সাহিত্য উৎপাদনও তাই জিএনপিতে অর্ন্তভূক্ত। কমলা ভাসিন তার Some Thoughts on Development and Sustainable Development – প্রশ্ন রেখেছেন, কিন্তু একটি দেশের আগ্নেয়াস্ত্র উৎপাদন দ্বারা কি সে দেশের ভালো মন্দ বিচার করা সম্ভব? উন্নয়নের এই প্রচলিত ধারায় মুনাফাই হচ্ছে ঈশ্বর। এই মুনাফা সাধারণত তথাকথিত মুক্তবাজার ও মুক্ত বাণিজ্যনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যা প্রকৃতপক্ষে মুক্ত ও নিরপেক্ষ নয়। উন্নয়নের এ ধারায় উৎপাদন প্রবণতা স্বত্ত্বেও জনগণের একটি বিরাট অংশের অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের ব্যবস্থা হয়নি এবং তারা অপুষ্টিতে ভুগছে। উন্নয়নের এ প্রচলিত ধারায় নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা সীমাবদ্ধতা হচ্ছে:

-প্রকৃতি ও পরিবেশ বৈরীতা
-জেন্ডার অসচেতনতা
-চাপিয়ে দেয়া কর্তৃত্বশীল মডেল
-সামরিকীকরণও সমরসজ্জামুখিতা
-একমূখীকরণ ও বৈচিত্র্য হ্রাস প্রভৃতি।[১]

এইসব সীমাদ্ধতার সবগুলোই পরস্পর সম্পৃক্ত। তবে এর মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা নিহিত রয়েছে চাপিয়ে দেয়া কর্তৃত্বশীল মডেলের মধ্যে।

❒ *চাপিয়ে দেয়া কর্তৃত্বশীল মডেল*

বর্তমান ধারার উন্নয়নের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে এর প্রাধান্য বিস্তারকারী মডেল যার ভিত্তি হচ্ছে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করা। সহযোগিতা নয়, বরং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জনের আকাঙ্খা সম্পদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভুত করে ফেলেছে। অধিকাংশ স্থানীয় জনগণ অধিক হারে স্থানীয় সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে কতিপয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি

অধিকাংশ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করছে এবং জাতীয় পর্যায়ে কিংবা আর্ন্তজাতিক সংগঠন বা বহুজাতিক সংস্থাগুলো অন্য কোন দেশে বসে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, যা ভারসাম্যহীন এক উন্নয়নের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বিশ্বকে।

মূলত: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে ভিন্ন আদলে শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য সাবেক নব্য ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ তৃতীয় বিশ্বের জন্য আধুনিকায়ন উন্নয়ন কৌশল ‘‘প্রেসক্রিপশন’’ তৈরী করে, যে তত্ত্বের মাধ্যমে বলা হয়, তৃতীয় বিশ্ব প্রথম বিশ্ব থেকে সব দিক থেকে পিছিয়ে আছে এবং এ ধরনের পার্থক্য ঘুচাতে পারলেই তৃতীয় বিশ্ব উন্নত হবে। এ লক্ষ্যে উন্নত বিশ্ব থেকে প্রযুক্তি, প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশল ও পরামর্শদাতা প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এই উন্নয়ন কৌশল ছিল ধনী ও পুরুষ পক্ষপাতিত্বমুলক এবং পরিবেশের প্রতি প্রতিকূল।[২] এই চাপিয়ে দেয়া উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থ, সম্পদ, ক্ষমতা দূর্বলের হাত থেকে সবলের হাতে, গরীবদের কাছ থেকে ধনীদের হাতে চলে যায়। ক্রমেই পরিবারে নারীদেব নিযন্ত্রণ ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।[৩]

❒ *প্রচলিত উন্নয়ন ধারা: জেন্ডার অসচেতন ও বৈষম্যমূলক*

উন্নয়নের বর্তমান এ ধারা নারীকে কোণঠাসা করে ফেলেছে এবং তাদের ক্ষমতা হরণ করেছে। কমলা ভাসিন তুলে ধরেছেন নারীর মূখ্য ভূমিকা ও তা থেকে বিচ্যুতকরণের ইতিহাস। পরিবার যখন উৎপাদনের ও স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্র ছিল তখন নারীর অবস্থান ছিল কেন্দ্রবিন্দুতে। কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্প, ঔষধ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা তারা রপ্ত ও ধারণ করেছিল। কিন্তু এসব বিষয় যখন বাণিজ্যিক ও শিল্পায়িত হয়ে গেল তখন সেখান থেকে নারী নির্বাসিত হল।[৪] তাদের জ্ঞানকে ঐতিহ্যগত বিধায় অবৈজ্ঞানিক এবং অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা করা হল। ইষ্টার বসরাপ হচ্ছেন অন্যতম প্রধান একজন যিনি নারীর উৎপাদনশীল ভূমিকা ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে বিশ্বব্যাপী নারীর শ্রমের অবদান বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যখন উৎপাদন ক্ষমতা পরিবারের বাইরে চলে গেল নারীরা তখন উৎপাদনের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল এবং ফলশ্রুতিতে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদের আর কোন ভূমিকা রইলো না এবং তারা হয়ে পড়লো ক্ষমতাহীন। খাদ্যশষ্য উৎপাদনের পরিবর্তে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের বিষয়টা তখন এমন দাড়াঁলো যে, নারী তার শ্রম দেবে কিন্তু টাকা যাবে পুরুষের হাতে।

খাদ্যশষ্য পরিবারকে খাদ্য যোগালেও যে ফসল অর্থ উৎপাদন করে সেই ফসল আর পরিবারের ভরণপোষণে থাকলো না। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, অধিকাংশ পুরুষেরর মধ্যে এই নগদ অর্থ প্রায়ই অপ্রয়োজনীয় খাতে অপচয় করার সম্ভাবনা বেশী থাকে। উন্নয়নের এই বর্তমান ধারা পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ ও ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করেছে। এ কৌশলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে মুনাফাভিত্তিক কৃষি ও শিল্পের প্রসার হয়, যা প্রধানত পুরুষকেই কাজ দেয়, প্রযুক্তির মালিক করে ও প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশল শেখায়। কুটির শিল্প ধ্বংসের মাধ্যমে নারীর কাজের ক্ষেত্র বিনষ্ট করে দেয়, তার প্রাকৃতিক জ্ঞান ব্যবহারের ক্ষেত্র নস্যাৎ করে দেয়।[৫] কৃষি ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের পূর্বে নারী বীজ সংরক্ষণ ও নির্বাচনের কাজটি করত। আধুনিকায়নের নামে নারীর কর্মের সুযোগ সীমিত হয়েছে, পরিবেশ বিপর্যয়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছে। বাংলাদেশে আধুনিকায়নের কৌশল এখনো অব্যাহত। বাজার অর্থনীতিতে নারীর অবস্থা দিন দিন অবনত হচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য শুধু নারীকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। নারীর শ্রমের সস্তা ব্যবহার হচ্ছে, নারীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি বা তার ক্ষমতায়নের জন্য কোন উন্নয়ন কৌশল নেয়া হয়নি। একদিকে বাজারে নারী তার স্বল্প দক্ষতা ও স্বল্প পুজিঁ নিয়ে টিকে থাকতে পারছে না, অন্যদিকে দায়িত্বের কারণে পুরুষরা পরিবার ত্যাগ করে শহর অভিমূখী হওয়ায় নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। এই পরিবারগুলো বেশী দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে।[৬]

প্রচলিত উন্নয়ন ধারায় শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের স্বীকৃতি নেই যথাযথভাবে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান আজ স্পষ্ট করে দিয়েছে নারী কি বিপুল পরিমাণ শ্রম নিয়োজিত করছে বিশ্ব শ্রমশক্তিতে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারীরা আজ মোট শ্রমশক্তির ৪৮ ভাগ এবং জাতীয় আয়ে প্রায় ৩০ ভাগ অবদান নারীদের। যদিও প্রচলিত জাতীয় আয় (GDP) পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষদের উৎপাদনশীলতার যেখানে প্রায় ৯৮% হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীদের উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭% গণনা করা হয়। এছাড়াও নারীদের গৃহস্থালী কাজকে (unpaid labour) অর্থনৈতিক কাজ (market work) হিসেবে ধরা হয় না। তাই বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীদের এই অদৃশ্য অবদান (invisible contribution) স্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার অ- পরিমাপযোগ্য থেকে যায়। অন্যদিকে নারী পুরুষের চেয়ে প্রায় ১৫ গুণ বেশী গৃহস্থালী কাজের বোঝা বহন করে। নারী পৃথিবীর মোট কাজের তিন ভাগের দুই ভাগ সম্পাদন করে কিন্তু মোট আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ নারী পায়। গোটা পৃথিবীর দরিদ্র মানুষের ৭০ ভাগ নারী এবং নারী বিশ্বের মোট সম্পত্তির মাত্র ১ ভাগের মালিক।[৭]

ক্রমাণ্বয়ে এই উন্নয়ন ধারা থেকে তাই নারী ছিটকে পড়েছে। তাদেরকে ক্রমাগত খুব কম মজুরীর কাজের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এবং তারা এখন কর্তৃত্বের সবচেয়ে নীচের সারিতে অবস্থান করছে। নারীদের এখন দ্বৈত কাজের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। এই বৈষম্যের কারণ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কোথাও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে না পারা।

২.২ উন্নয়ন ভাবনায় নারী ও জেন্ডার ফ্রেমওয়ার্ক

জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর Subjugation of Women গ্রন্থে নারীর অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

‘পরিবারে পুরুষ একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব। নারী তার অধীন। এই ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার মধ্যে একটি অহংবোধ আছে। আর এই অহংবোধ থেকেই জন্ম নেয় ব্যক্তিগত ও নিজ পছন্দসই স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা। আর এই প্রবণতা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং সমগ্র পুরুষ শ্রেণী এই গতানুগতিক অভ্যাসের অনুশীলন করে। তাদের এই ক্ষমতা কোথায় ব্যবহার করে তা লক্ষ্যণীয়। তাদের এই ক্ষমতা যখন প্রয়োগ করে তখন শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকে একজন উচ্চ বংশীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তির ন্যায়ই ক্ষমতার দাপট দেখায়। আর এই দাপট গিয়ে পড়ে তারই অতি কাছের এক ব্যক্তির ওপর যিনি তার জীবনের সাথে জড়িত, যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যাকে বাদ দিলে তাদের জীবন অসাড় হয়ে পড়ে সেই স্ত্রী নামক জীবটির ওপর। শুধু যে ক্ষমতার দাপট দিয়ে তাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেধেঁ রাখে তা নয়। এই দাসত্বের বিরূদ্ধে স্ত্রীকে মাথা তুলে দাড়াঁতে অনুমোদন দেয়া হয় না। যদিও বা কখনও কোন প্রতিবাদ প্রত্যক্ষ করে তখন তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে কঠোরভাবে প্রতিহত করে। সহ্য করে না। নারীর অযোগ্যতাই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য।’[৮] নারীর এই পশ্চাৎপদ অবস্থানের অবসান ঘটানোর জন্য মিল যেমন সোচ্চার ছিলেন, তেমনি পরবর্তীতে বিভিন্ন নারীবাদীরা এগিয়ে এসেছেন। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অর্ন্তভূক্তি এবং কাজের স্বীকৃতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনার প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী।

২.২.১ নারী উন্নয়ন মতবাদ

উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গৃহীত বিভিন্ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি কখনোই। ষাট দশকের শেষার্ধে যখন এটি আবিষ্কৃত হয় যে আধুনিকায়ন তত্ত্ব নির্ভর তৃতীয়

বিশ্বে উন্নয়ন কর্মকান্ডের অনেকাংশই নারীদের অংশগ্রহণকে শুধু যে নিশ্চিত করতে পারেনি তা নয় বরং তাদের স্বার্থের পরিপন্থীও তখন আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন বির্তকে নারীদের প্রবেশ ঘটে।[৯] এর ফলশ্রুতিতে নারী উন্নয়ন স্কুল Women in Development (WID) জম্মলাভ করে। ১৯৭০ এ প্রকাশিত হয় এষ্টার বসরাপের Woman's Role in Economic Development গ্রন্থটি। এবং ১৯৭৫ এ জাতিসংঘের নারী দশক উদ্ভোধন হচ্ছে উন্নয়নে নারী স্কুলের বির্বতনের শীর্ষবিন্দু। জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশ্বব্যাংক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা (AID), বেসরকারী সংস্থা, নারী গবেষক এবং এমনকি তৃতীয় বিশ্বে নারী শ্রমিক অন্বেষণরত বহুজাতিক সংস্থা বর্তমানে এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত।[১০]

উন্নয়নে নারী স্কুল, বিশেষ করে, বিশ্ব অর্থনীতিতে নারীদের স্বতন্ত্র ভূমিকা বর্ণনা করে ও পুরুষ দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে থাকে। পাশ্চাত্য ও তৃতীয় বিশ্বে দীর্ঘদিনের পুরুষ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে উপেক্ষিত নারীর গাহর্স্থ্য শ্রমের অদৃশ্যমানতা পরিহার করে নারীদের সকল ধরনের গার্হস্থ্য ও বেতনহীন শ্রমকে রাষ্ট্রীয় খাতে অর্ন্তভূক্ত করে তারা 'কাজের' সংজ্ঞা এবং অর্থের বিস্তৃতি সাধন করেছে। 'গার্হস্থ্য কাজের জন্য বেতনের' শ্লোগান নারীদের কাজ সমন্ধে চেতনা অনেকটাই বাড়িয়েছে। এক দশকের ভেতরে 'উন্নয়ন স্কুলে নারী'র (উনা) ক্ষেত্রে বসরাপ এবং তাঁর অনুসারীরা তৃতীয় বিশ্বে নারীর অর্থনৈতিক অবদান এবং অবস্থা সমন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থাও শ্রমশক্তিতে নারীর অবদান বিষয়ে গবেষণা করে। তাঁদের কাজ থেকে এখন জানা গেছে, নারী বিশ্বের খাদ্য উৎপাদকের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ট। আফ্রিকা এবং এশিয়ার নারীরা কৃষি শ্রমিকের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ এবং লাটিন আমেরিকার ক্ষেত্রে ৪০ ভাগেরও বেশী। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এখন নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী এ ধরনের পরিবারগুলো মূলত: জীবনধারনের জন্য নারীদের উৎপাদনশীল ভূমিকার উপর নির্ভরশীল। উনা লেখকগণ প্রণীত নারীদের কাজের ওপর ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতাশ্রয়ী পর্যালোচনাগুলি তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিতে নারীদের অন্যতম ও কখনো কখনো কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের বিষয়টিকে জোরালোভাবে তুলে ধরে। উনা লেখকেরা দেখান যে, নারীদের কাজ তৃতীয় বিশ্বে যেমন তেমনি পাশ্চাত্য ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে উৎপাদনের সবচেয়ে কম মূল্যবান ও কম বেতনভূক্ত খাতে আবদ্ধ। তৃতীয় বিশ্বে, নারীরা গার্হস্থ্য এবং তথাকথিত অ- প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সবচেয়ে বেশী জড়িত। তার ফলে তাদের অধিকাংশ কাজ গণনা করা

হয় না অথবা জাতীয় আয় ও উৎপাদনের হিসাব থেকে পুরোপুরিভাবে বাদ দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে নারীদের কাজের অদৃশ্যমানতা ও পরিবারে পুরুষ যে প্রধান এই বিশ্বাসের সার্বজনীনতা তৈরী হয় এবং নারীরা অধিকতর দারিদ্র ও ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়।

ইষ্টার বসরাপ এবং অন্যান্যরা দেখিয়েছেন যে তৃতীয় বিশ্বে নারীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দু'ভাবেই প্রান্তিকতায় পৌঁছেছেন। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার সূত্রপাত থেকেই নতুন ব্যক্তিক সম্পত্তি অধিকার, বেতন, শ্রম, কৃৎকৌশল, ঋণ এবং শিক্ষা পুরুষদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। সেজন্য অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক খাতে অধিকতর অর্থকরী এবং সম্মানবহ কাজে পুরুষদের প্রবেশাধিকার ঘটেছে, এবং নারীরা কম উৎপাদনশীল ও কম বেতনের কাজে সরে গেছে। সম্পত্তি, দক্ষতা, পুজিঁ কিংবা শিক্ষা না থাকার দরুণ নারীরা এ ধরনের কাজে অর্ন্তভুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে। একইভাবে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক নারীবাদীরা, বিশেষ করে বেটি ফ্রিডান যুক্তি দেখান যে গার্হস্থ্য এবং রাষ্ট্রিক পরিসরের বিচ্ছিন্নতা, ঘরের মধ্যে নারীর আবদ্ধতা হচ্ছে নারীর আর্থিক প্রান্তিকতা এবং সামাজিক অধস্তনতার উৎস।

উনা স্কুলের মৌল প্রস্তাবনা হচ্ছে অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণে নারীদের বর্তমান অসম্পূর্ণ অর্ন্তভূক্তির স্থলে ঐ প্রক্রিয়ায় আরও ভালোভাবে অর্ন্তভূক্ত হওয়ার মাধ্যমে মুক্তি অর্জন। সেজন্য, উনা স্কুলের শ্লোগান হচ্ছেঃ 'উন্নয়নে নারীদের অন্তরিত কর।' বস্তুতপক্ষে নারীরা, কম উৎপাদনশীল এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনের কম বেতনভোগী খাতে প্রান্তিক, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা অর্ন্তভূক্ত নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, পর্যালোচনাসমূহ বারবার দেখিয়েছে যে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির ক্ষেত্রে নারী কেন্দ্রীক ভূমিকা পালন করে এবং সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলো নারী কেন্দ্রীক। অন্য কথায়, তারা ইতোমধ্যেই সর্বত্র বিদ্যমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভালভাবে অন্তরিত, যদিও নিম্ন পর্যায়ে।[১১]

❒ মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী

'এঙ্গেলস থেকে শুরু করে মার্ক্সিষ্টরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে নারী অধস্তনতার উৎস ব্যক্তিক সম্পত্তি, শ্রেণী বিন্যস্ততা এবং বিনিময় মূল্যের উৎপাদন। সাম্প্রতিক মার্ক্সিষ্টরা দেখান যে নারী নির্যাতন অবিচ্ছেদ্যভাবে জাতিক এবং আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের শ্রেণী নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত। সেজন্য, অধিকাংশ নারী এবং পুরুষের মুক্তি বিদ্যমান ধণতান্ত্রিক বৈশ্বিক ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব নয়।'[১২]

মার্ক্সিষ্টরা উদারনীতিবাদী উনা পর্যালোচনার সঙ্গে একমত যে, অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণ, কিংবা নির্দিষ্টভাবে ধণতান্ত্রিক উন্নয়ন সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের নারীদের প্রান্তিক করে তুলেছে। তারাঁও মনে করেন, সবুজ বিপ্লবের সুবিধা সাধারণত পুরুষের পক্ষে গেছে। উৎপাদনের নতুন কৃৎকৌশলসমূহ পুরুষের হাতে তুলে দেয়ার ফলে নারীদের কাজের পরিসর হ্রস্ব হয়েছে এবং পুরুষের তুলনায় নারী শ্রমের উৎপাদনশীলতা কমে গেছে। তৃতীয় বিশ্বের নারীদের ক্ষেত্রে একটি ক্রমবর্ধমান ঘটনা হচ্ছে নারীদের বহুজাতিক সংস্থা কর্তৃক রপ্তানী প্রসেসিং এলাকায় চাকরীতে নিযুক্তি। তৃতীয় বিশ্বের সস্তা নারী শ্রম এবং তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও পুণরাবৃত্তিমূলক কাজে স্বাভাবিক নৈপূণ্য তাদের এই কাজে সুযোগ দিচ্ছে। নারীরা আজ নির্দিষ্ট ধরনের কাজের সীমিত সুযোগের জন্য প্রতিযোগিতা করছে।[১৩]

❒ নারী উন্নয়ন স্কুলের ভূমিকা

পুরো সত্তর দশক ব্যাপী তারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ ছিল আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ১৯৭৫ হতে ১৯৮৫ কে জাতিসংঘ নারী দশক ঘোষণা। এ ধারার সাথে যুক্ত ছিল উন্নয়ন চিন্তার আর একটি সংশোধনী: মৌলিক চাহিদা দৃষ্টিভঙ্গী (basic need approach) যা আধুনিকায়ন স্কুলের চুঁইয়ে পড়া তত্ত্বের (tricle down theory) সমালোচনা হতে উদ্ভাবিত। মৌলিক চাহিদা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সম্পদে দরিদ্র এবং বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সরাসরি প্রবেশাধিকার সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা। ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র কৃষকের সাথে নারীরাও এ উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর (target group) অর্ন্তভূক্ত হয়। এতে বৃহদায়তন অবকাঠামেগত উন্নয়ন হতে ক্ষূদ্রায়তন প্রকল্পমূখী উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। লক্ষ্যণীয় যে, তৃণমূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সর্ম্পকিত স্থানীয় পর্যায়ের অনেক বেসরকারী সংস্থাও (এনজিও) এ সময়ে আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে প্রবেশ করে। আশা করা হয়েছিল, এ উন্নয়ন কৌশল দ্বারা নারীরা উপকৃত হবে। কিন্তু আশির দশকে এ ‘লক্ষ্যগোষ্ঠী দৃষ্টিভঙ্গী’ (targetting approach) হতে নারীরা কি সত্যিই উপকৃত হচ্ছিল না বাস্তবে তারা প্রতিকীবাদের শিকারে পরিণত হচ্ছিলএ নিয়ে সমালোচনা তৈরী হয়। প্রকৃতপক্ষে অনেক সরকারই মূলধারার উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ত না করে প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে পৃথক মহিলা মন্ত্রণালয় স্থাপন করে এবং প্রান্তিক ক্ষেত্রে নারীদের জন্য পৃথক প্রকল্প প্রণয়ন করে। ফলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীরা একটি উপাঙ্গ হিসেবে প্রবেশ করে এবং নীতি নির্ধারণী মহলে 'নারীর এলাকা' বর্ধিত হয়ে ঘেঁটুতে (gheto) পরিণত হতে থাকে। এ

সমালোচনার ফল হিসেবে নারী উন্নয়নের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সর্ম্পকে আর একটি বির্তকের উদ্ভব হয়। নারীদের বিষয় পর্যাপ্ত এবং যর্থাথভাবে প্রতিফলিত করার জন্য জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়াতেই একটি পৃথক এলাকা গঠন করা হবে অথবা যথাযথ গতিতে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ ও তাদের মানবিক উৎকর্ষ এবং সামাজিক মর্যদা বৃদ্ধির জন্য নারীকে অন্য সবকিছুর সাথে সর্ম্পকিত ও পুর্ণগঠিত করা হবে এই ছিল বির্তকের বিষয়। চিন্তার এ পরবর্তী ধারাকে 'নারীদের মূলধারায়ন'(mainstreaming) নামে অভিহিত করা হয়। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে মূলধারার কর্মসূচীর মধ্যেই নীতি অবস্থান ও সম্পদ বন্টন যুক্তিযুক্ত করা যাতে নারীরাও সমভাবে উপকৃত হতে পারে।[১৪]

নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের ধরন পরিবর্তন প্রয়োজন। বিচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত প্রকল্প এবং কর্মসূচীর মাধ্যমে লিঙ্গীয় বৈষম্য এবং লিঙ্গীয় শোষণের মত সমস্যাকে উপলব্ধি অথবা সমাধান করা সম্ভব নয়। লিঙ্গীয় শোষণকে দেখতে হবে পিতৃতন্ত্র এবং পুজিঁবাদী সামাজিক- অর্থনৈতিক বিন্যাসের আলোকে। সামগ্রিকভাবে তথা নারীর আইনগত অধিকার, তাদের অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক- সাংস্কৃতিক নিয়মপ্রসূত যৌণ নিপীড়নমূলক ধারনাসমূহ সর্ম্পকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।[১৫]

এভাবেই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে জেন্ডার ফ্রেমওয়ার্কও প্রণীত হয়েছে।

২.২.২ জেন্ডার ফ্রেমওর্য়াক

উন্নয়নে নারী ইস্যু সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে মুলত তিনটি ফ্রেমওর্য়াক কাজ করে। হার্ভাড ফ্রেমওর্য়াক প্রথম তৈরী হয়, সম্প্রদায়ের ভেতরে কে কি করে, কে কি ভোগ করে, এবং কে কি নিয়ন্ত্রণ করে এই ভিত্তিতে। মোসার পদ্ধতি, যেটি পুরুষের দ্বৈত ভূমিকার প্রেক্ষিতে নারীর ত্রয়ী ভূমিকার ধারনাকে সংজ্ঞায়িত করে। এবং লংওয়ের ফ্রেমওর্য়াক যেটি নারীর ক্ষমতায়নের ধারনা দেয়।[১৬]

এই তিনটি ফ্রেমওর্য়াক একে অপরের সম্পুরক। সবগুলো ফ্রেমওর্য়াকের সমন্বয়ে নারীর যে তিনটি ভূমিকার কথা এসেছে তা হল:

- উৎপাদনমূলক: ব্যবহারের জন্য পণ্য উৎপাদন।
- সম্প্রদায়/সামাজিক ব্যবস্থাপনা: সমাজের মঙ্গল ও প্রচারের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ

-পুণরুৎপাদনমূলক: পরিবার/ খানার দেখাশুনা (শিশুপালন ও শিশুলালন সহ)

অধিকাংশ সংগঠন এই তিনটি ফ্রেমওর্য়াকের যে কোন একটি ব্যবহারের পরিবর্তে বরং উপরোক্ত তিনটি ফ্রেমওর্য়াকের মুল ধারনার সমণ্বয় সাধন করে কাজ করে।[১৭] তবে এক্ষেত্রে ক্যারোলিন মোসার প্রণীত ফ্রেমওর্য়াকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিভিন্ন দশকে প্রণীত উন্নয়নের বিভিন্ন ধারাসমূহের বিশ্লেষণের আলোকে নিজস্ব ধারনার প্রকাশ ঘটান।

❐ মোসারের জেন্ডার প্ল্যানিং ফ্রেমওর্য়াক ও এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী ধারাসমূহ বিশ্লেষণ

ক্যারোলিন মোসার প্রণীত ফ্রেমওর্য়াকটি অন্যতম জনপ্রিয়। এটি তাঁর লিঙ্গ ভূমিকা, লিঙ্গ চাহিদা এবং লিঙ্গভিত্তিক এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতি বিষয়ে তার ধারনাকে ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। মোসার মুলত: ৫টি পন্থার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।

মোসার পন্থা ১: লিঙ্গ ভূমিকা / নারীর ত্রয়ী ভূমিকা

যথা: ক. উৎপাদনমূলক, খ. পুনরুৎপাদনমূলক ও গ. সম্প্রদায়ভিত্তিক কাজ

মোসার পন্থা ২: লিঙ্গ চাহিদা নিরূপণ

যথা: ক. ব্যবহারিক চাহিদা ও খ. নীতি সংক্রান্ত চাহিদা

মোসার পন্থা ৩: গৃহের অভ্যন্তরে সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা

মোসার পন্থা ৪: ত্রয়ী ভূমিকার সমণ্বয়করণে পরিকল্পনা

মোসার পন্থা ৫: বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত পলিসির পার্থক্য: WID/GAD policy matrix

মোসার পন্থা ৬: পরিকল্পনায় নারী এবং লিঙ্গ সচেতন সংস্থা ও পরিকল্পনাবিদের অর্ন্তভূক্তকরণ

নারী ও উন্নয়ন বিষয়ে মোসার নীতি এপ্রোচকে শ্রেণীবিণ্যাস করেছেন মূলত এভাবে:

গত দশকে তৃতীয় বিশ্বের স্বল্প আয়ের নারীদের বিষয়ে ম্যাক্রো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি ছিল। পাচঁটি ভিন্ন পলিসি এপ্রোচকে তিনি চিহ্নিত করেছেন যার প্রত্যেকটি নারীর ব্যবহারিক ও কৌশলগত চাহিদা পূরণের প্রেক্ষিতে ফোকাস করেছে।

- *কল্যাণ:* ১৯৫০-৭০ এ সর্বপ্রথম এপ্রোচ। এর উদ্দেশ্য ছিল ভালো মা হিসেবে নারীদের উন্নয়নে অর্ন্তভূক্তকরণ। এখানে নারীকে উন্নয়নের পরোক্ষ ফলভোগী হিসেবে দেখা হয়েছে। এখানে নারীদের পুণরুৎপাদনমূলক ভূমিকার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এটি চ্যালেঞ্জ করে না এবং এখনো জনপ্রিয়।

-সমতা: ১৯৭৬-৮৫ নারী দশকে ব্যবহৃত প্রকৃত WID এপ্রোচ। এটি নারীদের জন্য সমতা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে। এখানে নারীকে উন্নয়নের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে দেখা হয়। এখানে নারীর ত্রয়ী ভূমিকার স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্রে সরাসরি রাষ্ট্রীক হস্তক্ষেপ এবং পুরুষের তুলনায় বৈষম্য কমানোর কথা বলা হয়। এটি নারীর অধস্তন অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে। এটি পাশ্চাত্য নারীবাদ বলে সমালোচিত হয়েছে। এটিকে হুমকী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি সরকারগুলোর মধ্যে অ-জনপ্রিয়।

-দারিদ্রের বিরোধীতা: ১৯৭০ এর পরবর্তীতে WID এর দ্বিতীয় এপ্রোচ যা সমতা এপ্রোচের কিছুটা নমনীয় রূপ। এর উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র নারীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। এখানে নারীদের দারিদ্রতাকে দেখা হয়েছে অব-উন্নয়নের সমস্যা হিসেবে, অধস্তনতা হিসেবে নয়। এটি নারীর উৎপাদনশীল ভূমিকার স্বীকৃতি দেয় এবং উপার্জনের মাধ্যমে কৌশলগত চাহিদা পূরণ করতে চায়, বিশেষ করে ক্ষুদ্র পর্যায়ে অর্থ আয়কারী প্রজেক্টের মাধ্যমে। এটি এনজিওগুলোর মধ্যে অধিক জনপ্রিয়।

দক্ষতা: ১৯৮০এর ঋণ সমস্যা থেকে গৃহীত তৃতীয় এবং বর্তমানে প্রাধান্যপূর্ণ WID এপ্রোচ। এর উদ্দেশ্য হল নারীর অর্থনৈতিক অবদান ও সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নকে আরও অধিক দক্ষ এবং কার্যকর করার বিষয়টি নিশ্চিত করা। এটি নারীর সময়ের দীর্ঘ ব্যবহার ও ত্রয়ী ভূমিকাকে বিশ্বাস করে। এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এপ্রোচ।

ক্ষমতায়ন: তৃতীয় বিশ্বের নারীদের দ্বারা সংকলিত অতি সাম্প্রতিককালের এপ্রোচ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাপক আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়িত করা। নারীর অধস্তনতা শুধু পুরুষ কর্তৃক নিগ্রহের কারণে নয়, বরং উপনিবেশিক ও নব্য উপনিবেশিকতার কারণেও বটে। এটি নারীর ত্রয়ী ভুমিকার স্বীকৃতি দেয়। এটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে সম্ভাবনাময়। পশ্চিমা নারীবাদকে এড়িয়ে যাওয়া স্বত্তেও এটি তৃতীয় বিশ্বের নারী এনজিও ছাড়া জনপ্রিয় নয়।[১৮]

এভাবে বিভিন্ন এপ্রোচকে বিশ্লেষণ সাপেক্ষে মোসার নারীর ত্রয়ী ভূমিকা ও পুরুষের দ্বৈত ভূমিকার কথা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। এবং বর্তমান সময়ে উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আলোচনায় সবগুলো ফ্রেমওয়ার্ক থেকে ধারনা নেয়া হয়।

২.৩ রাষ্ট্র ক্ষমতা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব

রাষ্ট্রীক মর্যদা এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রাধান্যশীল ভূমিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের স্বীকৃত মতামত রয়েছে। অ্যারিষ্টোটল পোলিস বা রাজনৈতিক সমিতিকে 'সর্বাপেক্ষা সার্বভৌম ও ব্যাপক সমিতি' হিসেবে সংজ্ঞায়ন করেছেন যা 'সকল ইস্যুতে সার্বভৌম'। সংবিধান বা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ইউনিটগুলোর শ্রেণীকরণের যে সব শর্ত অ্যারিষ্টোটল নির্ধারণ করেছেন তার অন্যতম হচ্ছে, নাগরিকমন্ডলের ঐ বিশেষ অংশ যার মাঝে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বা শাসন (বিধিবিধান) নিহিত।[১৯]

অ্যারিষ্টোটলের যুগের পর থেকে এরকম একটি ব্যাপক ধারনা গড়ে উঠেছে যে, একটি রাজনৈতিক সর্ম্পক বলতে তাতে কোন না কোনভাবে কতৃর্ত্ব, শাসন বা ক্ষমতা রয়েছে বোঝায়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী সমাজবিজ্ঞানী ও জার্মান সুপন্ডিত ম্যাক্স ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০) এই মর্মে সংজ্ঞা দেন যে, একটি সমিতিকে রাজনৈতিক সমিতি বলা যাবে যদি প্রশাসনিক কর্মচারীবর্গের পক্ষ থেকে শারীরিক বল প্রয়োগ বা প্রয়োগের হুমকী দ্বারা কোন নির্ধারিত ভূখন্ড এলাকার মধ্যে ঐ সমিতির আদেশ ক্রমাগতভাবে বলবৎ করা হয়। এভাবে ওয়েবার রাজনৈতিক সমিতির ভূ-আঞ্চলিক দিকটির উপর অ্যারিষ্টোটলের মত গুরুত্ব আরোপ করলেও তিনি সুনিদিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, কর্তৃত্ব বা শাসনের সম্পর্ক পরম্পরা এর অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড ল্যাসওয়েলের সংজ্ঞায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান এক ফলিত জ্ঞানশাস্ত্র যা ক্ষমতার আদল দান ও অংশীদারির বিষয় সমীক্ষা করে আর একটি রাজনৈতিক কার্যব্যবস্থা হচ্ছে সেটিই যা ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে সম্পাদিত হয়। কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের উপর বাধ্যতামূলক যেসব বিধিবিধান রয়েছে সেগুলি যারা তৈরী, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বলবৎ করেন তারাঁই সম্ভবত সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী রাজনৈতিক ভূমিকাগুলিও পালন করে থাকেন। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই ভূমিকাগুলি পদ বা কতকগুলি পদের সমষ্টি। আর এগুলিই ঐ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সরকার।[২০] সুতরাং দেখা যায়, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চূড়ান্ত ক্ষমতাশালী কর্তৃপক্ষ।

উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কতৃর্ত্বের ভূমিকার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা আছে ডেভিড ইষ্টনের সিষ্টেম তত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যায়। তাঁর মতে যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল কাজ হচ্ছে সমাজে উপযোগ বা জীবন ধারনের মূল্যবান উপকরণগুলোর

প্রভূত্বব্যাঞ্জক বরাদ্দ। বরাদ্দ কোন সমাজে তখনই প্রভূত্বব্যাঞ্জক হয়ে ওঠে যখন বরাদ্দের সিদ্ধান্তগুলো হয় বৈধ এবং অবশ্যপালনীয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই ক্ষমতাই হলো সার্বভৌমত্ব এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। অন্য কথায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থাই সমাজে অবশ্য পালনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর তা কার্যকর করে, যা এই ব্যবস্থাকে অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। [২১]

রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রভাব বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রভাব চর্চার বিষয়টি আবার কতকগুলো কারণের উপর নির্ভরশীল। বলা যায় কারণসমূহের নেটওয়ার্ক প্রভাব বিষয়টিতে জড়িত। রবার্ট এ ডাল তার Modern Political Analysis গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, কারণের নেটওয়ার্কে তথা সম্পর্ক পরম্পরায় কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্রের ব্যাখ্যামূলক পরিচয় পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত চিত্রে।

চিত্র: ২.১ রাজনৈতিক প্রভাবের পার্থক্যের জন্য দায়ী কতকগুলি কারণ (বিষয়)

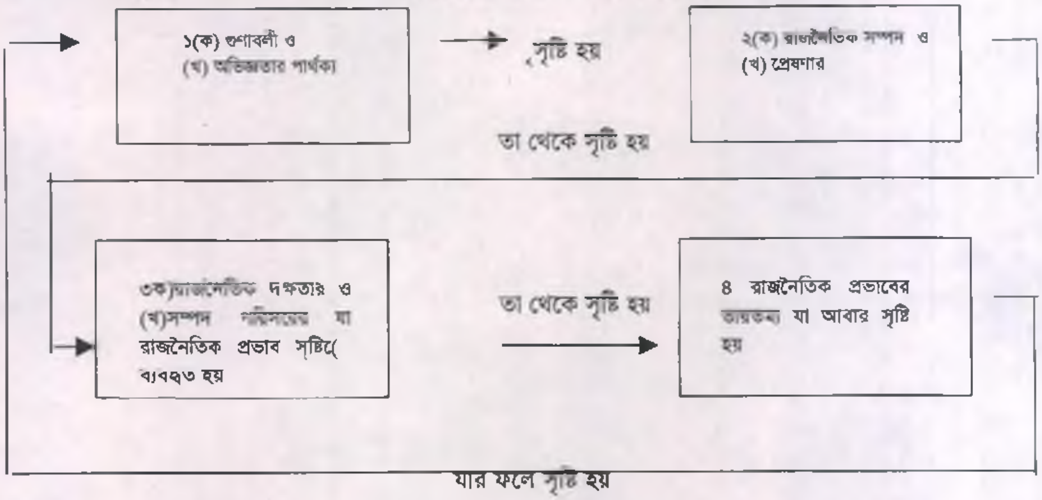
১(ক) গুণাবলী ও
(খ) অভিজ্ঞতার পার্থক্য
সৃষ্টি হয়
২(ক) রাজনৈতিক সম্পদ ও
(খ) প্রেষণার
তা থেকে সৃষ্টি হয়
৩ক)রাজনৈতিক দক্ষতার ও (খ)সম্পদ পরিসরের যা রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়
তা থেকে সৃষ্টি হয়
৪ রাজনৈতিক প্রভাবের তারতম্য যা আবার সৃষ্টি হয়
যার ফলে সৃষ্টি হয়

সর্বনিম্নে প্রদর্শিত তীরচিহ্নটি দিয়ে প্রভাবের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট নির্দেশ করা হয়েছে। প্রভাব আরও বেশী প্রভাব অর্জনে ব্যবহার করা যায়। কিছু লোক তাদের সুয়োগ সুবিধা ও অভিজ্ঞতার কারণে রাজনৈতিক সম্পদে কম বেশী (২ক) সাম্য অবস্থায় বাস করে। কিন্তু প্রেরণা/ (উৎসাহ) ও প্রেষনার তারতম্যের (২খ) এবং তারা তাদের রাজনৈতিক দক্ষতার অনুশীলন কি পরিসরে করে ও প্রভাব অর্জনের (৩ক ও খ) জন্য তাদের সম্পদ কি পরিমাণে ব্যবহার করে তার ভিত্তিতে এই লোকগুলির মধ্যে একজন প্রভাব অর্জন করে (৪) ও সেই প্রভাব আরও সম্পদ অর্জনে সে কাজে লাগায়। আর এতে সে আরও বেশী প্রভাব অর্জন করে (২, ৩, ৪), তাতে আরও রাজনৈতিক সম্পদ তার করায়ত্ব হয়....। [২২]

একটি রাজনৈতিক পদ্ধতির সদস্যদের মাঝে রাজনৈতিক প্রভাবের বণ্টন অসম। তুলনামূলক বেশী সম্পদের অধিকারীরা তাদের সম্পদ দিয়ে সরকারকে প্রভাবিত করতে পারে। এতে তাদের পক্ষে আরো বেশী রাজনৈতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা সহজ হয়। রুশো তাঁর বিখ্যাত রচনা এ ডিসকোর্স অ্যান দ্যা অরিজিনস অব ইনইকুয়ালিটি (১৭৭৫) - তে বলেছেন, সম্পত্তির অসমতার মধ্যেই ক্ষমতার অসমতার মূল নিহিত।[২৩] সুতরাং রাজনৈতিক প্রভাবের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কাছাকাছি পৌছাঁনো সম্ভব হয়। এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের নৈকট্য লাভ বিশেষভাবে প্রয়োজন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চূড়ান্ত ক্ষমতার কারণে। ডেভিড ইষ্টন এই ক্ষমতাকে দেখিয়েছেন সার্বভৌম ক্ষমতা হিসেবে। সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমাজের জনগণ ও পরিবেশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ডেভিড ইষ্টন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দেখিয়েছেন নিম্নোক্ত ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে।

চিত্র: ২.২ রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্ক

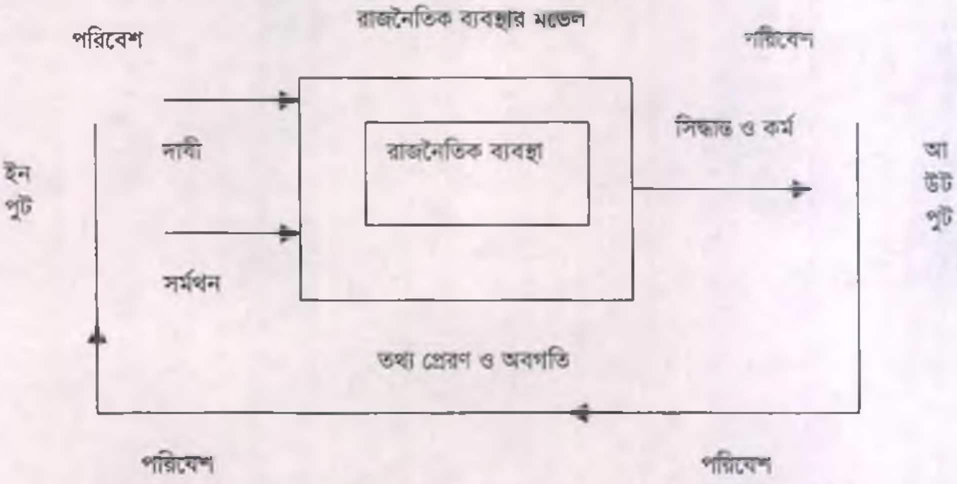

সূত্র: এমাজ উদ্দীন আহমেদ, তুলনামূলক রাজনীতি: রাজনৈতিক বিশ্লেষণ – (মূল David Easton, a political Framework.)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষমতা চূড়ান্ত। এবং এতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের দাবী উত্থাপন করা সম্ভব ও সেই অনুযায়ী ফলাফল অর্জিত হতে পারে। কিন্তু সেজন্য দাবী উত্থাপনে সক্ষম হতে হবে এবং প্রভাব বিস্তারে দক্ষ হওয়া প্রয়োজন। যথাযথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রে পৌছাঁতে পারলে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা অর্জিত হতে পারে। অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ও রাষ্ট্র ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

২.৪ রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর ও নারীর অবস্থান

রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উন্নয়নে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য। কারণ একটি গতিশীল উন্নয়ন প্রক্রিয়া সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ কিভাবে করা যাবে তা বস্তুত একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, নিছক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়।[২৪] এবং এই সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থাকতে না পারলে প্রকৃত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সুতরাং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের প্রকৃতি জানা প্রয়োজন।

কিন্তু রাজনীতিতে নারীর উপস্থিতি প্রথম থেকেই সংকটপূর্ণ। রবার্ট এ ডাল আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা শুরু থেকেই বর্তমান আকৃতিতে ছিলো না। ধীরে ধীরে রূপান্তরের মাধ্যমে বর্তমান রূপে এসেছে। আনুমানিক ৫০০ খীষ্টাব্দ পূর্বে প্রাচীন গ্রীসে জনগণের সরকারের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। প্রায় একই সময়ে রোমানদের মধ্যে জনসরকারের উদয় ঘটে। রোমানরা তাদের এই পদ্ধতিকে 'রিপাবলিক' বা প্রজাতন্ত্র নাম দেয়। পরের দুহাজার বছরে সকল নাগরিকের অংশ নেবার অধিকার রয়েছে এমন বিশ্বাস নিয়ে তৈরী হয় জনসরকারের ধারনা। সতের ও আঠারো শতকে নাগরিকসভায় সরাসরি অংশ নেবার কার্যত ও কাঙ্খিত বিকল্প হিসেবে উপস্থিত হয় প্রতিনিধিত্ব। প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার, গণপ্রজাতন্ত্র কিংবা সংসদীয় সরকার- নানা অভিধায় অভিহিত এই রাজনৈতিক পদ্ধতিগুলি জণসরকারের তত্ত্ব ও প্রয়োগের এখতিয়ারকে রাষ্ট্রের বৃহত্তর পরিমন্ডলে সম্প্রসারিত করেছে।[২৫]

আধুনিক জনভিত্তিক সরকারে ধীরে ধীরে কিছু প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটলেও, বিশ শতকের আগে অবধি এসব প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রবেশ ঘটেনি। আধুনিক জনভিত্তিক সরকারকে যে বিষয়গুলির দিকে আলাদা করে দেখানো হয তার মধ্যে দুটি লক্ষ্যণীয়, তা হলো

৩. কার্যত সকল (প্রাপ্ত) বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার রয়েছে ।

৪. আর এসব নির্বাচনে সকল (প্রাপ্ত) বয়স্ক ব্যক্তির লোকপদে নির্বাচনপ্রার্থী হবার অধিকার রয়েছে।[২৬]

কিন্তু এই দুই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সকল গণতন্ত্র ও প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় (প্রাপ্ত) বয়স্ক ব্যক্তির এক বিরাট আনুপাতিক অংশকে দেশের যে আইনের তারা অধীন সেইসব আইন প্রণয়নে অংশীদার হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়। এথেন্সের সুপ্রসিদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীদের অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। বিশ শতকের আগে অবধি, সকল (প্রাপ্ত) বয়স্ক মানুষের অর্ধাংশ নারী প্রতিটি দেশেই জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এরকম দেশগুলির মধ্যে সুইজারল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও রয়েছে অথচ এই দুই দেশই পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন গণতন্ত্রগুলির অর্ন্তভূক্ত।[২৭]

এভাবে দেখা যায়, নারী রাষ্ট্র ক্ষমতায় শুরু থেকেই বঞ্চিত ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের রাজনীতিতে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভোটাধিকার অর্জনের মাধ্যমে নাগরিক হিসেবে মর্যাদা আদায়ের পর ক্রমে তারা লোকপদে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার অর্জন করেছে। সময়ের বির্বতনে নারীরা রাজনীতির কেন্দ্রে প্রবেশের মাধ্যমে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২.৫ নারীর ক্ষমতায়ন

উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর সম্পৃক্তির ক্ষেত্রে আরেকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়ন শব্দটি একটি জনপ্রিয় পরিভাষা হয়ে ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি থেকে কল্যাণ, উন্নয়ন, অংশগ্রহণ ও দারিদ্র বিমোচনের মত শব্দগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়। প্রক্রিয়া হিসেবে ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপুর্ণ উপাদান যার মাধ্যমে মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং বাধাঁ বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়।

ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায়:

১. বস্তুগত সম্পদ, যার মধ্যে রয়েছে, স্থানিক সম্পদ যেমন- জমি, জলাশয় ও বনভূমি ইত্যাদি, মানবিক সম্পদ যেমন- মানবদেহ এবং আর্থিক সম্পদ, যেমন -অর্থ;

২. বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, যেমন- জ্ঞান,তথ্য এবং ধারনা ইত্যাদি;

৩. আর্দশিক সম্পদ যেমন- একটি নির্দিষ্ট আর্থ- সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়; - এই তিন ধরনের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।[২৮]

অর্থাৎ বস্তুগত, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণকে ক্ষমতায়ন বলে। এ ধরনের সম্পদকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। এ সকল একটি বা অনেকগুলি সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি বা সামাজিক ক্ষমতার উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়।[২৯]

চিত্র: ২.৩ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতায়ন

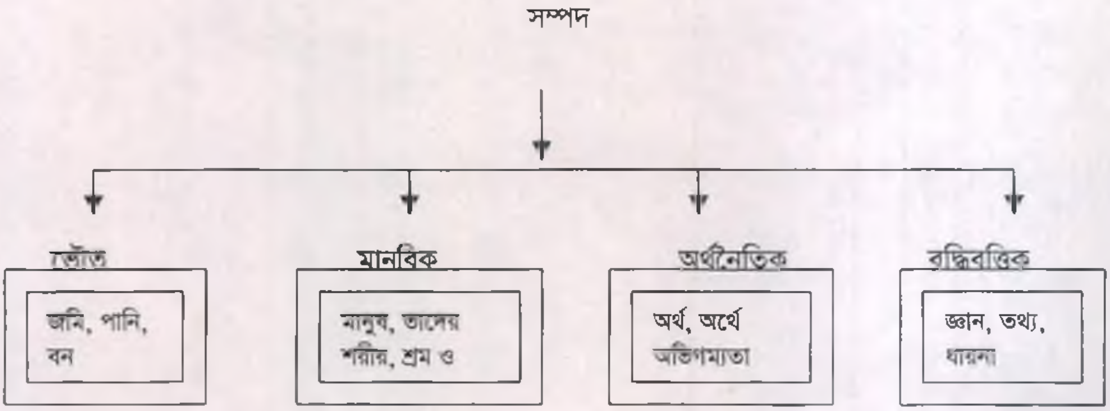

ক্ষমতায়নকে দেখা হয়েছে মূলত নারী ইস্যুতে সম্পৃক্ত করে। ‘ক্ষমতায়ন একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া ও সেই প্রক্রিয়ার ফসল। এর অর্থ হল ক্ষমতায়িত করার জন্য সচেতন করা হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া এবং নারী যখন সচেতন হয়ে উঠবে তা হচ্ছে এ প্রক্রিয়ার ফসল। ক্ষমতায়ন আত্মনির্ভরশীলতা বা স্বনির্ভরতা (self reliance) থেকে পৃথক, কারণ এতে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই ক্ষমতা অর্জন করা এবং ক্ষমতার উৎসের উপর অধিকার অর্জনের প্রক্রিয়াকে বুঝায়। ক্ষমতায়ন ক্ষমতা ও উন্নয়নের মধ্যকার আন্ত:সর্ম্পক সর্ম্পকিত কিছু মৌলিক ধারনা সর্ম্পকে নতুন দিক নির্দেশনা দান করে।’ [৩০]

Development, Crysis and Alternative Versions-Third World Women’s Perspective-এ সেন এবং গ্রাউন বলেছেন যে, নারীর ক্ষমতায়নের অর্থ হচ্ছে অধস্তনতার কাঠামোর রূপান্তর। এরমধ্যে থাকবে আইন, পারিবারিক আইন, সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অধিকার। নারীর নিজের শরীর এবং শ্রম এবং সামাজিক এবং আইনী প্রতিষ্ঠান এর উপর নারীর নিয়ন্ত্রণ। তারা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একদিকে সম্পদ (অর্থ, জ্ঞান, প্রযুক্তি), দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং নেতৃত্ব এবং অন্যদিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সংলাপ, সিদ্ধান্ত এবং নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ এবং দ্বন্দ্ব নিরসনে দক্ষতা অর্জন এর জন্য প্রয়োজনীয়তা আরোপ করেন।

Kate Young নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টিকে দেখিয়েছেন 'অবস্থা' ও 'অবস্থানের' সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'অবস্থা' হচ্ছে দরিদ্র নারী যেভাবে জীবনযাপন করে, কম মজুরী, পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যসেবার অভাব, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকা প্রভৃতি। আর 'অবস্থান' মানে পুরুষের সাথে তুলনামূলকভাবে নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যদা।[৩১]

ক্ষমতায়ন পদ্ধতির স্পষ্ট ও বিশেষ সংজ্ঞায়ন করেছে Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)। DAWN ১৯৮৫ সালে নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব উইমেন -এর আগে কিছু নারী ব্যক্তিত্ব এবং নারী সংগঠনকে নিয়ে গঠিত হয়। DAWN এর উদ্দেশ্য বিশ্বের নারী সমাজের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা নয়, বরং তাদের লক্ষ্য বিকল্প সমাজ ব্যবস্থা গঠনের চিন্তাশক্তি গঠন করা। যার মূল উদ্দেশ্য এমন এক পৃথিবী গঠন করা যেখানে প্রত্যেকটি দেশ এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার সর্ম্পক হবে শ্রেণী, লিঙ্গীয় সর্ম্পক এবং বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্যহীন। এই ভবিষ্যৎ পৃথিবী গঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীরূপে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিবেচনা করা হয় দূরদৃষ্টি থেকে, যে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।[৩২]

নারীর ক্ষমতায়নের কিছু গুরুত্বপুর্ণ দিক রয়েছে, যেমন-

❒ সামাজিক ভূমিকা বৃদ্ধি

উচ্চ স্বাক্ষরতা, অধিক হারে সম্পত্তির অধিকার, উচ্চহারে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ, ঋণে প্রবেশাধিকার, প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক হারে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ এগুলো হলো - নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক। এর মাধ্যমে শুধুমাত্র নারীর কল্যাণ অর্জনে সহায়ক হবে না বরং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে তাদের ভূমিকাকে আরো শক্তিশালী করবে।[৩৩]

❒ বৈষম্য দূরীকরণ

ক্ষমতায়ন পদ্ধতি নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য এবং পরিবার যে নারীর অধস্তনতার উৎস এটা বলে থাকে। সেই সাথে এটাও মনে করে যে, নারীর প্রতি নির্যাতনের যে অভিজ্ঞতা তা তাদের বর্ণ, শ্রেণী, উপনিবেশিক ইতিহাস, এবং আর্ন্তজাতিক অর্থনীতির পরিমন্ডলে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন। যা এটাই নির্দেশনা দান করে যে, নারীকে একই সাথে বিভিন্ন

পর্যায়ে বিদ্যমান নির্যাতনমূলক কাঠামো ও অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে। যে প্রক্রিয়া এ সকল ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় সামাজিক মর্যদায় প্রতিষ্ঠিত করে তাই হল নারীর ক্ষমতায়ন।[৩৪]

❒ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা

ক্ষমতায়ন পদ্ধতি নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতার ইঙ্গিত দেয়। এই স্বনির্ভরতা ও অভ্যান্তরীণ শক্তি কিভাবে নিদির্ষ্ট হচ্ছে তা নির্ভর করে নারী তার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্পগুলো গ্রহণ করতে পারছে কিনা এবং গুরুত্বপুর্ণ বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে নিজ জীবনের পরিবর্তন আনতে পারছে কিনা তার উপর অর্থাৎ নিজ জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে কিনা । নাজমা চৌধুরী ক্ষমতায়ন বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, নারীর ক্ষমতায়ন অর্থ এই নয় যে, ‘যারা ক্ষমতার চেয়ারে অধিষ্ঠিত আছেন, নারীরা তাদের সরিয়ে নিজেরা ক্ষমতায় আসবেন। .... । নারীর ক্ষমতায়ন বলতে আমরা নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি, তার জীবন, তার অবস্থান, তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তি বৃদ্ধি বুঝাচ্ছি।’[৩৫] ক্ষমতায়ন এভাবেই সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অধিকার দেয়, কারণ সিদ্ধান্তগ্রহণের বৈধ ক্ষমতা ব্যক্তিকে ক্ষমতাবান করে বৈধতার অধিকার থেকে।

❒ পুরুষের সাথে সমতা

ক্ষমতায়ন অর্থ হলো যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে সব বিরাজমান কাঠামোগত অসমতা নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের পশ্চাৎপদ অবস্থায় রাখে তা থেকে উত্তরণ। এই যৌথ প্রচেষ্টায় পুরুষও অংশীদার, ক্ষমতার জন্য পুরুষদের সঙ্গে নারীর বৈরীমূলক সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা নয়। ক্ষমতায়ন সর্ম্পকিত আলোচনার আর্দশিক ধারনা হলো পুরুষের সঙ্গে সহাবস্থানে, সম মর্যদায় নারীর অবস্থান প্রয়োজন, কেননা নারীও সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক। প্রক্রিয়া হিসেবে উন্নয়ন বহুমাত্রিক, যার সঙ্গে নারীও সম্পৃক্ত। সমাজের যে সকল কর্মকান্ডে নারী নিয়োজিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার যথাযথ মুল্যায়ন হয় না। ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই নারী সমাজে যথাযথ মূল্যয়ানে অধিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ সহাবস্থানে দাড়াঁবার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হবে। কারণ জ্ঞান, আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জনই হল ক্ষমতায়ন।

নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী সমস্যা তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, আইনগত, পরিবেশগত, অর্থাৎ সার্বিক অস্তিত্বে পশ্চাৎপদ অবস্থান এবং এসব ক্ষেত্রে নারী -পুরুষের বৈসম্যের নিরসন ঘটানো, নারীর স্বকীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও অবদানের স্বীকৃতি, এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। ১৯৯০- এ প্রণীত বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের টাস্কফোর্স রিপোর্টে বলা হয়েছে, নারীর ক্ষমতায়নের অর্থনৈতিক, আইনগত ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যমান। সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হতে হলে এই সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত বা মাত্রা ধারণ করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নের মূখ্য উদ্দেশ্য শুধু নারীর শক্তি সঞ্চয়নই নয়। বস্তুতপক্ষে নারীর ক্ষমতায়ন সুসম ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটানোর একটি মাধ্যম।[৩৬]

❒ নারীর ক্ষমতায়নে PFA

PFA- বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন, বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা। চর্তুথ বিশ্ব নারী সম্মেলন ১৯৯৫ এ বৈশ্বিক ঐকমত্য স্বরূপ এই মূল দলিল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। এতে দারিদ্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, নির্যাতন ও সশস্ত্র সংঘাত দূরীকরণ, অর্থনীতি সহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর সমান সুযোগ এবং পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নীতি নির্ধারণ এবং নেতৃত্বে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের দিক নির্দেশনা খোজা হয়েছে। কারণ সামাজিক ইস্যু হিসেবে নারী উন্নয়ন সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত যা নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। তবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন যদি প্রয়োজনীয় শর্ত হয় তবে নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন পর্যাপ্ত শর্ত এবং দুটি শর্ত পূরণ হলেই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফসল হিসেবে নারী সচেতায়িত হলেও নারীর প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সরকারী নীতি নির্ধারণে নারী প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়িত না হওয়ায়।[৩৭]

বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে নারী অধিকার আদায়ের সংগ্রাম এগিয়ে যায়। মূলত: PFA হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের এজেন্ডা এবং চর্তুথ বিশ্ব নারী সম্মেলনের মূল দলিল। PFA এর

১৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি অর্জনের জন্য নারীর ক্ষমতা লাভের সুযোগসহ সমতার ভিত্তিতে সমাজের কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতি সাধনের জন্য প্রতিটি পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নসহ সকল কার্যক্রমে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণসহকারে কার্যকর, দক্ষ, এবং পারস্পরিক শক্তিবৃদ্ধিমুলক জেন্ডার সচেতন নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অপরিহার্য।[৩৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক কর্তৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ফলপ্রসু ভূমিকা পালনের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

২.৬ উন্নয়ন ও রাজনীতিতে লিঙ্গ সমতা এবং টেকসই উন্নয়ন ধারনার বিকাশ

উন্নয়ন একটি ব্যাপক বিষয়। গবেষণার শুরুতেই বলা হয়েছে উন্নয়ন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রত্যয়। সুতরাং আংশিকভাবে কিংবা খন্ডিতভাবে উন্নয়নকে দেখার সুযোগ নেই। এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রচলিত উন্নয়ন ধারার সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হয়েছে। উন্নয়ন এখন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে সীমাবদ্ধ নয়। উন্নয়ন শুধু প্রবৃদ্ধি অর্থে উন্নয়ন হতে পারে না। এখানে অর্থনীতি কোন সার্বভৌম শক্তি নয়। বস্তুত অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা, প্রবৃদ্ধিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা সর্ম্পূণ কৃত্তিম এবং অর্থহীন। একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া তখনই অর্থপূর্ণ হতে পারে যখন তার মধ্য দিয়ে:

'১. একটি দেশের জনগণ নিজেদের উন্নয়ন লক্ষ্য, পদ্ধতি, রাজনীতি, সমাজ সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হবেন,

২.যখন ঐ দেশের ব্যাপক জনগণ দারিদ্রসীমার ওপরে অবস্থান করবেন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের মত মৌলিক অধিকারসমূহ লাভে সক্ষম হবেন,

৩. যখন ব্যাপক জনগণ এই উন্নয়ন সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায়, রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতার প্রকৃত অংশীদার হবেন এবং

৪.যখন এই সমাজে নারী পশ্চাৎপদ বিচ্ছিন্ন একটি জনগোষ্ঠী থেকে মুক্ত হয়ে ব্যাক্তি হিসেবে বিকাশের সুযোগ পাবে এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে'।[৩৯]

২.৬.১ উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা

উন্নয়নের দর্শনে এ কথা আজ সুস্পষ্ট যে উন্নয়ন নিছক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, এর প্রকৃত অর্থ মানব উন্নয়ন যা নারী- পুরুষের সমতার বিষযটিকে অর্থাৎ জেন্ডার প্রেক্ষিতটিকেও ধারণ করে। নারীর সম অধিকার (সম্পত্তি ভোগ, ক্ষমতা, পছন্দ ও সিদ্ধান্তগ্রহণে) ও সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে না পারলে কখনই সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বর্তমানে বৈশ্বিক পর্যায়ে উন্নয়নের মাত্রা নির্ধারণে মানব উন্নয়নের ধারনাকে অন্যতম প্রধাণ নির্ণায়ক নির্ধারিণ করা হয়েছে। এই মানব উন্নয়ন ধারনার মূল বক্তব্য:

❒ মানব উন্নয়ন ; ধারনা

মানব উন্নয়ন ধারনা উন্নয়ন ও অগ্রসরতার উপায়ের/মাধ্যমের (Means) চাইতে অভীষ্টতার (Ends) বিষয়টিতে ফোকাস করে। উন্নয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের জন্য দীর্ঘ, স্বাস্থ্যকর এবং উদ্ভাবনীময় জীবন উপভোগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা।[৪০] যদিও এটিকে একটি সাধারণ সত্য বলে মনে হয় কিন্তু তাৎক্ষনিকভাবে প্রয়োজনীয় পণ্য ও সম্পদের সংকুলান করতে গিয়ে প্রায়শ:ই তা ভূলে যাওয়া হয়।

মানব উন্নয়ন মানুষের পছন্দের (Choice) সুযোগ বৃদ্ধি এবং তাদের অর্জিত কল্যাণের মাত্রা পরিমাপ উভয়কেই চিহ্নিত করে। অন্যতম জটিল হলো দীর্ঘ এবং স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করা, শিক্ষিত হওয়া এবং একটি মানসম্মত জীবন মান উপভোগ করা। অতিরিক্ত পছন্দের (Choice) মধ্যে আছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মানবাধিকারের নিশ্চয়তা এবং আত্ম সম্মান। এই ধারনা মানব উন্নয়নের দুটি দিককে পৃথক করে। একটি হলো মানবিক সক্ষমতা/দক্ষতা (Capability) তৈরী করা, যেমন স্বাস্থ্য অথবা জ্ঞানের উন্নয়ন। অন্যটি হলো কাজ অথবা বিশ্রামের জন্য মানুষের ঐসব অর্জিত দক্ষতার ব্যবহার।[৪১]

মানব উন্নয়ন ধারনার ব্যাপ্তি ঘটেছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে। অন্যতম সূচক হলো মানব উন্নয়ন সূচক।

মানব উন্নয়ন সূচক (HDI)

১৯৯০ সনের প্রথম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রত্যাশিত আয়ু, শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং আয়ের সমন্বয়ে গঠিত সূচকের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিমাপের একটি নতুন পথের সাথে পরিচয়

করিয়ে দেয়। মানব উন্নয়ন সূচক হলো মানব উন্নয়নের তিনটি মূল উপাদানের সমন্বয়: দীর্ঘায়ু, জ্ঞান এবং জীবন মান। দীর্ঘায়ু পরিমাপ করা হয় প্রত্যাশিত আয়ু দিয়ে। জ্ঞান পরিমাপ করা হয় বয়স্ক স্বাক্ষরতা এবং স্কুলে গমন এর সমন্বয়ে। জীবন মান পরিমাপ করা হয় ক্রয় ক্ষমতা, সেই দেশের জীবন ধারন খরচের সঙ্গে এডজাস্ট করে প্রকৃত জি. ডি. পি পার ক্যাপিটার উপর ভিত্তি করে।[৪২]

মানব উন্নয়ন সূচকের মাধ্যমে পরিমাপ করার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়নের বিষয়টিতে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে লিঙ্গভিত্তিক দুটো সূচক নির্ধারণ করার মাধ্যমে। ১৯৯৫ এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন নারীর মযর্দাকে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন পরিমাপের দুটি নতুন পরিমাপকের সূচনা করে।

- প্রথম পরিমাপক: *লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়ন পরিমাপক (GDI)* যা HDI এর মত একই মূল দক্ষতা দিয়ে অর্জনকে পরিমাপ করে, কিন্তু এই অর্জনে নারী- পুরুষ অসাম্যের বিষয়টিকে চিহ্নিত করে।

- দ্বিতীয় পরিমাপক: *লিঙ্গ ক্ষমতায়ন পরিমাপক (GEM)* যা নারীদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পর্যায়ের অগ্রগতির মুল্যায়ন করে। এটা পরীক্ষা (Examine) করে যে, নারী এবং পুরুষ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে অংশ নিতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছে কিনা। যখন GDI ফোকাস করছে দক্ষতা বৃদ্ধিকে, তখন GEM সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জীবনের সুযোগসমূহ থেকে সুবিধা আদায়ের বিষয়ে মনযোগ দিচ্ছে।[৪৩] সুতরাং উন্নয়ন ধারনার পরিপূর্ণতা এসেছে বিভিন্ন পরিমাপকের সমন্বয়ের মাধ্যমে। উন্নয়ন পরিমাপের মাপকাঠিতে লিঙ্গ পরিমাপক বর্তমানে অন্যতম।

উন্নয়ন ধারায় নারীর সম্পৃক্ততার লক্ষ্যে প্রণীত এইসব নতুন উদ্যোগের পেছনে নারীর ক্ষমতায়ন ধারনার বিকাশ, উন্নয়ন স্কুলের পর্যালোচনা কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা যায়।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে বস্তুগত, মানবিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণকে ক্ষমতায়ন বলে। সুতরাং নারী যখন এই নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে সক্ষম হবে তখনই কেবল উন্নয়নের ভাগীদার হতে পারবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাপী নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্যের ক্ষেত্রে প্রধানত: দুটো বিষয় কাজ করছে।

প্রথমত; নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা-

ক. দৈনন্দিন কাজ ও ভূমিকার ক্ষেত্রে;
খ. দায় দায়িত্বের ক্ষেত্রে;
গ. ব্যবহৃত সময়ের ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয়ত; পুরুষের তুলনায় নারীর সীমিত অধিকার-

ক. সম্পদের ক্ষেত্রে- যেমন অর্থ, ঋণ, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, অবকাশ ও বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে;
খ. পছন্দের ক্ষেত্রে- যেমন, নিয়ন্ত্রণ, স্বাধীনতা, জীবন যাপন, বিয়ে, সন্তান ধারণ ও লালন পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে;
গ. সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে - যেমন, ক্ষমতা ও নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

এই বৈষম্য দূর করা ও সর্বক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন অর্জন এবং উভয় ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয় হলো নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাধিকার এবং নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থানের উন্নয়ন।[৪৪]

২.৬.২ নারীর রাজনৈতিক কর্তৃত্বে অংশগ্রহণ ও উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা

রাজনেতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই নারী প্রকৃত অর্থে সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের পাশাপাশি সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নিজের অবস্থানকে সুসংহত ও দৃঢ়করণে সক্ষম হবে, যা নারী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতায়নের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু রাজনৈতিক শক্তিই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব তাই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৯১ সনে বাংলাদেশের তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে গঠিত টাস্কফোর্স প্রণীত রিপোর্ট প্রণিধানযোগ্য। টাস্কফোর্স মনে করে যে, নারীকে রাজনীতিতে সক্রিয় করে তুলতে হবে এবং উন্নয়নের বাহক ও ভোগসত্ত্বাধিকারী হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে মন্ত্রীপরিষদ, জাতীয় সংসদ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ও সরকারী নীতি র্নিধারণী ক্ষেত্রসমূহে নির্বাচন ও নিয়োগের মধ্যমে রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায় ও ক্ষেত্রসমূহে নারীর দৃশ্যমানতা ও কার্যকর উপস্থিতি

বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। টাস্কফোর্স এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে দলীয় কর্মসূচিতে অর্ন্তভূক্তকরণ, সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায়ে অর্ন্তভূক্তি, উন্নয়ন বিষয়ক সরকারী দলিলপত্রে নারীর ভূমিকা ও অবস্থানগত সঠিক ঘোষণা প্রদান এবং উপযুক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতি। এভাবেই নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া জোরদার করা সম্ভব। সিদ্ধান্তগ্রহণ নারীর সমান অংশগ্রহণ সাধারণ ন্যায়বিচার বা গণতন্ত্রের জন্য একটি দাবীই শুধু নয়, বরং নারীর স্বার্থরূপে বিবেচনা করার মত একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবেও একে দেখা চলে।[৪৫] উন্নয়ন ও রাজনীতির এই সম্পৃক্ততাকে নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যেও তুলে ধরা যায়:

চিত্র: ২.৪ উন্নয়ন ও রাজনীতির সম্পৃক্ততা

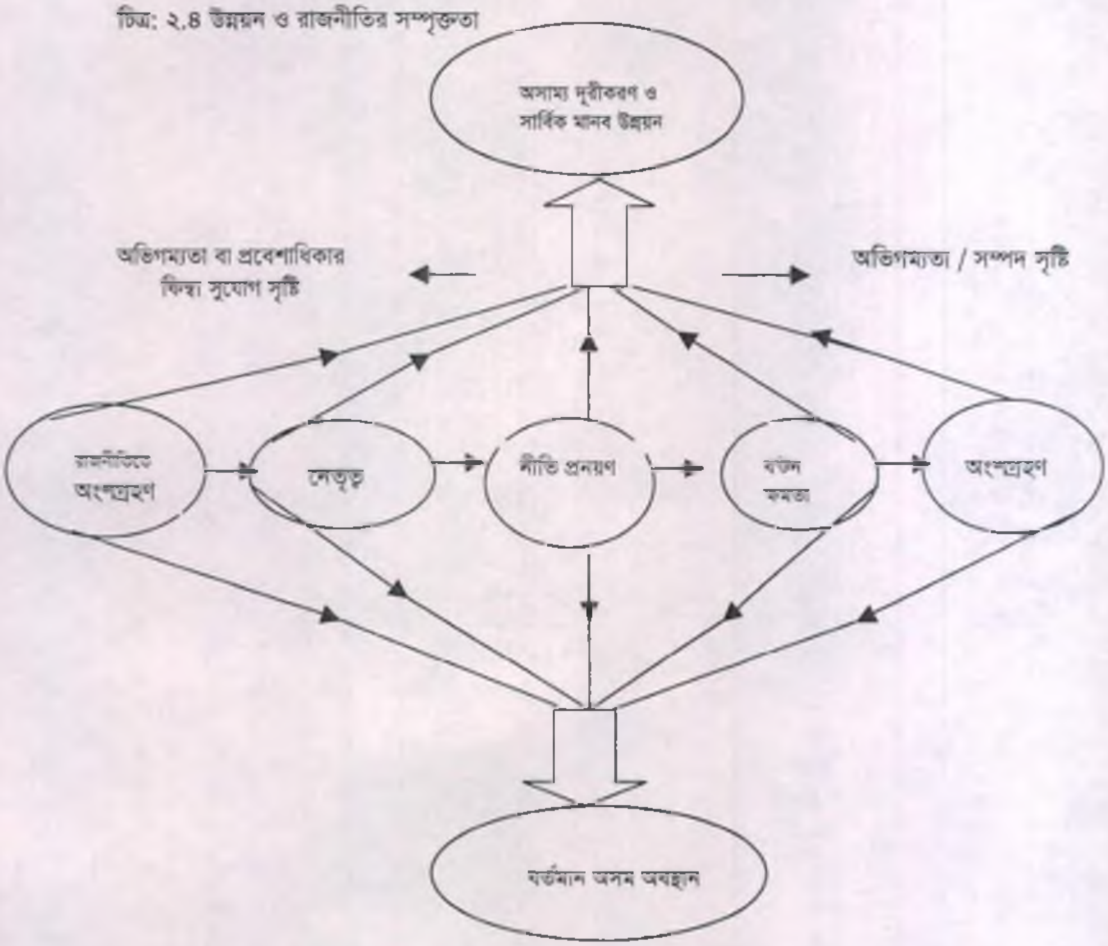
অসাম্য দূরীকরণ ও
সার্বিক মানব উন্নয়ন
অভিগম্যতা বা প্রবেশাধিকার
কিম্বা সুযোগ সৃষ্টি
অভিগম্যতা / সম্পদ সৃষ্টি
রাজনীতিতে
অংশগ্রহণ
নেতৃত্ব
নীতি প্রনয়ণ
বণ্টন
ক্ষমতা
অংশগ্রহণ
বর্তমান অসম অবস্থান

(প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের উন্নয়ন মডেল অণুসরণে)

এই চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ অবস্থানে থাকার জন্যই ক্রমান্বয়ে নারী রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নকে পূর্ণাঙ্গ মাত্রা প্রদানের ব্যাপারে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আবার কয়েকটি ধাপ রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একক। প্রতিটি বিদ্যমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া উন্নয়ন এজেন্টের বিশ্বাস,আর্দশ বা দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। রাজনৈতিক দলকে যদি একটি উন্নয়ন এজেন্ট হিসাবে দেখা যায় তাহলে রাজনৈতিক দলের দর্শন নির্ধারিণ করে দেয় তাদের উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারনা। উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল ও কার্যকর রাখতে হলে উন্নয়ন মডেল ও প্রক্রিয়ায় নারী সহ সমাজের সকল জনগোষ্টীর অর্ন্তভূক্তি ও অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে জাতীয় স্বর্থের অংশ হিসেবে নারী উন্নয়নকে পূর্নাঙ্গ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য মাত্রা হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।[৪৬]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধরন। উন্নয়ন এজেন্ট হিসাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অপরিহার্য ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে। তাই নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ জরুরী। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া প্রায় অসম্ভব। সামরিক বা বেসামরিক, স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র এবং ধর্মতন্ত্র অসম ক্ষমতা কাঠামোকে পুঁজি করে টিকে থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে ব্যালটের মাধ্যমে রাজনৈতিক আকাংখা তুলে ধরা এবং দাবী পূরণে জনপ্রতিনিধিদের উপর চাপ তৈরীর সুযোগের মাধ্যমে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সম্ভাবনা তৈরী হয়, যা ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নির্ধারকের ভূমিকায় অধিষ্টিত করার পথ সুগম করতে পারে। সুতরাং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভূমিকা গুরুত্বপুর্ণ।[৪৭]

রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ উন্নয়ন কৌশল এবং উন্নয়ন দর্শন নির্ধারণকারী হিসেবে রাষ্ট্রের সকল ধরনের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। এক্ষেত্রে নারীর অর্ন্তভূক্তির যোক্তিকতার পক্ষে বলা যায়, টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডে দেখা গেছে যে, নারী উন্নয়ন উপাদান পেলে এর সুফল পরিবারের সদস্যদের উপর বর্তায় এবং সার্বিকভাবে পরিবারের চাহিদা পূরণ হবার এবং পরিবারের সদস্যদের জীবনের গুণগতমান উন্নত হবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। তাই উন্নয়ন ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি বিবেচনা করে নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসীন হওয়া তথা পুর্ণাঙ্গ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করার জন্য নারীদের অর্ন্তভূক্তি নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।[৪৮]

২.৬.৩ টেকসই উন্নয়ন ধারার বিকাশ

আধুনিকায়ন উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে সকলের উন্নয়ন সাধিত না হয়ে শুধুমাত্র একটি অংশের উন্নয়ন সাধিত হলে এবং বহুমুখী বিপর্যয় সংগঠিত হওয়ার কারণে এখন এমন এক সময় এসেছে যখন মানুষ বিকল্প উন্নয়ন কৌশলের কথা ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। বলা হচ্ছে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের কথা। উপরোক্ত আলোচনায় সেই কাঙ্খিত উন্নয়নের বিভিন্ন অপরিহার্য উপাদানের কথা উঠে এসেছে। প্রচলিত উন্নয়ন ধারার বিপর্যয়কে রুখতে জোর দেয়া হচ্ছে পরিবেশনির্ভর, জণকল্যাণমূখী, টেকসই উন্নয়নের উপর। এই উন্নয়ন ধারায় বৈশিষ্ট্য হবে নিম্নরূপ:

❐ টেকসই উন্নয়নের কিছু নীতি

প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই উন্নয়ন

জনগণমুখীনতা

জেন্ডার সংবেদনশীলতা

আগে মৌলিক চাহিদা পূরণ

বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়ন

তৃণমূল গনতন্ত্র

শান্তি ও অহিংসার বোধ জাগ্রত করা

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী

উন্নয়ন মূল্যবোধ বিকাশ[৬৯]

টেকসই উন্নয়ন ধারার মডেল নিম্নরূপ:

চিত্র: ২.৫ টেকসই উন্নয়ন ধারার মডেল

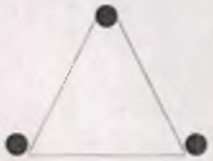
সামাজিক ন্যায্যতা: অর্থনৈতিক
সামাজিক, সাংস্কৃতিক
পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা
আন্ত:প্রজন্ম সাম্যতা: আন্ত:প্রজন্ম
আন্ত:রাষ্ট্র [৭০]

অর্থাৎ টেকসই সমাজ ও রাষ্ট্র অর্জনের লক্ষ্যে সকলের জন্য কল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, একটি দেশের সরকারে প্রত্যেক নারী/পুরুষের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। একটি জবাবদিহিমূলক

সরকার ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জন নিশ্চিত করার জন্য নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থানের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। সিদ্ধান্তগ্রহণের সকল স্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর প্রেক্ষাপট সম্পৃক্ত করা না হলে ক্ষমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব নয়।[৫১] লিঙ্গসমতাভিত্তিক ও যর্থাথ ন্যায্য সমাজ গঠনের মাধ্যমে এই স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ধারা প্রতিষ্ঠার যে সম্ভাবনা সূচিত হয়েছে তার পুর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হবে এটাই কাম্য।

অধ্যায়ের আলোচনার শেষে বলা যায় যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, টেকসই উন্নয়ন ধারা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্ন্তভূক্তকরণ রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমেই প্রচলিত শোষণমূলক ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন সম্ভব। অর্থাৎ উন্নয়ন ও রাজনীতির সুসম সমন্বয়ের মাধ্যমেই নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

উন্নয়ন হচ্ছে জীবন পরিক্রমার ঈপ্সিত গন্তব্য। আবার উন্নয়নে পৌঁছানোর ধারাবাহিক পরিক্রমার শীর্ষে রয়েছে রাজনীতি। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায় থেকে দূরে রেখে অসম নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে নারীকে ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে। তাই একদিকে উন্নয়ন পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করে রাজনৈতিক অঙ্গনেও প্রবেশাধিকার অর্জন, অন্যদিকে রাজনীতির শীর্ষে আসীন হয়ে উভয় প্রত্যয়ের সংযোগে বর্তমান বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সমতা ভিত্তিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এক সুসম সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

এই অধ্যায় ছিল মূলত গবেষণার কাঠামোগত আলোচনা। ‘রাজনীতি’, ‘উন্নয়ন’, এবং ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ এই তিনটি বিষয়কে এই গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং এই তিনটি বিষয়ের সম্পৃক্তি ঘটানোর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ধারা প্রতিষ্ঠা ও সুসম সমাজ গঠন সম্ভব। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এই কাঠামো অনুসরণ করে আলোচ্য প্রত্যয়গুলোতে নারীর বর্তমান সীমাবদ্ধতা আলোকপাত করার মাধ্যমে আগামী দিনের সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণায় ।

তথ্য নির্দেশিকা

১. কমলা ভাসিন, "প্রচলিত উন্নয়ন বনাম টেকসই উন্নয়ন" *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ষ্টেপ টুওয়ার্ডস, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ. ৫৪-৫৫

২.শামীমা পারভীন, "নারীর ক্ষমতায়ন", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ষ্টেপ টুওয়ার্ডস, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, ১৯৯৮।

৩.কমলা ভাসিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত

৬. শামীমা পারভীন, প্রাগুক্ত।

৭.উন্নয়ন ও জেন্ডার বৈষম্য, *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ষ্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, সপ্তম সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃ. ১৯

৮. বেলা নবী,"এক নারীবাদী পুরুষ: জন স্টুয়ার্ট মিল", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ষ্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, চতুর্থ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ.৪৩

৯.Easter Boserup, *Women's Role in Economic Development*, London, 1970.

১০.অশোকা বন্দরাগে রচিত এবং মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও মিলু শামসুন নাহার অনুদিত, "উদারনীতিবাদ, মার্ক্সবাদ এবং মার্ক্সসবাদী -নারীবাদ", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা: ২২

১১. পুর্বোক্ত

১২. পুর্বোক্ত

১৩.পুর্বোক্ত

১৪. মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, "নারী এজেন্ডা ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা", *নারী ও রাজনীতি* ,নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪, পৃ.৪৫

১৫.পুর্বোক্ত, পৃ.৫০

১৬.Website: Through a gender lens: Resources for Population, Health and Nutrition project.

১৭.Ibid

১৮. Candida March, Ines Smyth and Maitrayee Mukhopadhy " *A Guide to Gender-Analysis Frameworks''*, OXFAM, Oxford, 1999.

And

Caroline O.N, Moser, *"Gender Planning and Development: Theory, Practise and Training''*, Routledge, 1993.

১৯. রবার্ট এ ডাল রচিত ও মঈনউদ্দীন আহমেদ অনূদিত, *আধুনিক রাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

২০.মঈনউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

২১.এমাজ উদ্দীন আহমেদ, *তুলনামূলক রাজনীতি: রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৯১, এ- লেখক কর্তৃক অনূদিত। (মূল রচনা: David Easton, *A Framework for Political Analysis*, Englewood)

২২. মঈনউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত

২৩. পূর্বোক্ত

২৪.নাজমা চৌধুরী এবং অন্যান্য ''নারীর ক্ষমতায়ন'' উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, *টাস্কফোর্স প্রতিবেদন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২।

২৫.মঈনউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত

২৬.পূর্বোক্ত

২৭.পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬

২৮. আবেদা সুলতানা, 'নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি: একটি বিশ্লেষণ'', *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা: ২, ১৯৯৮, উইমেন ফর উইমেন পৃ. ৫১

২৯.শামীমা পারভীন, 'নারীর ক্ষমতায়ন', *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, চতুর্থ বর্ষ, চর্তুদশ সংখ্যা, ১৯৯৮, ষ্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, পৃ. ৩৮

৩০.আবেদা সুলতানা, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১

৩১.পুর্বোক্ত

৩২. মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, "রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ" *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি*, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৭, পৃ. ১৮০

৩৩.Binayak Sen:"Bangladesh poverty analysis: Trends, Policies and Institutions, 2000", Hossain Jillur Rahman & Mahbub Hossain edited, *Rethinking rural Poverty- Bangladesh as a case study*, University Press Limited, 1995.

৩৪. শাহীন রহমান, "জেন্ডার পরিভাষা/ শব্দকোষ", *উন্নয়ন পদক্ষেপ,* স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ৭ম সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃ. ৯১

৩৫.ড: নাজমা চৌধুরী, ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন শীর্ষক সেমিনারের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫, পৃ. ২৬

৩৬. নাজমা চৌধুরী এবং অন্যান্য "নারীর ক্ষমতায়ন" উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, *টাস্কফোর্স প্রতিবেদন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ২০

৩৭. আবেদা সুলতানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৩৮.পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

৩৯.নাজমা চৌধুরী এবং অন্যান্য "নারীর ক্ষমতায়ন", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০

৪০.Website: Website: Moez Doraid,*"Analytical Tools for Human Development"*, Human Development Report Office, August, 1997, http://www.undp.org/hdro/anatools.htm, 12.10.2000.

৪১.*মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন*- ১৯৯৯, UNDP

৪২.পূর্বোক্ত

৪৩. Website: Moez Doraid, "*Analytical Tools for Human Development*", Human Development Report Office, August, 1997, http://www.undp.org/hdro/anatools.htm, 12.10.2000.

৪৪.আবেদা সুলতানা, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০

৪৫.নাজমা চৌধুরী এবং অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫

৪৬.পূর্বোক্ত

৪৭.পূর্বোক্ত

৪৮.পূর্বোক্ত পৃ. ৪৫-৪৬

৪৯.কমলা ভাসিন, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪

৫০.এজাজুল হক চৌধুরী, "হায়িত্বশীল উন্নয়ন", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ষ্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, চতুর্থ বর্ষ, চর্তুদশ সংখ্যা, ১৯৯৮

৫১.আবেদা সুলতানা, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০

তৃতীয় অধ্যায়

উন্নয়ন ধারনা-বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

৩.১ উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা

৩.২ বিশ্বব্যাপী শ্রমশক্তিতে নারীর অবস্থান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী

৩.২.১ শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা ও তার মূল্যায়ন

- ❒ কৃষি ও নারী
- ❒ গার্হস্থ্য কাজ ও মজুরীলব্ধ শ্রমের তুলনামূলক পরিমাপ
- ❒ শ্রমবাজারে প্রবেশ এবং প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ
- ❒ বিভিন্ন খাতে শ্রম বিনিয়োগ

৩.২.২ পেশাভিত্তিক অধ:স্তন অবস্থান

৩.২.৩ রাষ্ট্রীয় সুযোগ ও অধিকারে বৈষম্য

৩.৩ উন্নয়নে নারী: জাতিসংঘের অবস্থান

৩.৩.১ জাতিসংঘ চার্টারে নারী

৩.৩.২ নারী দশক ও বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সম্মেলন

৩.৩.৩ জাতিসংঘ কাঠামোয় নারী

গবেষণার বিষয়বস্তুর মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো রাজনীতিতে যথাযথ অবস্থানের প্রেক্ষিতে উন্নয়নে নারীর পূর্ণ সম্পৃক্ততার বিষয়টিতে ফোকাস করা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নীতি নির্ধারণে রাজনীতির মুখ্য অবস্থান এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের বহুমাত্রিক ব্যাপ্তির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ের আলোচনায় উন্নয়ন প্রত্যয়ের ব্যাপকতার আলোকে নারীর অতীত অবস্থান, বর্তমান পরিবর্তনশীল প্রেক্ষিত ও ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিষয়টি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস রয়েছে। উন্নয়নে নারীর প্রকৃত অবস্থান বিশ্লেষণ করার জন্য সমাজ কাঠামোয় নারীর অবস্থান, কর্মের বিভাজন, নারীর কর্মের স্বীকৃতি, নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গী, প্রভৃতি আলোচনার প্রেক্ষিতে বর্তমান বিশ্ব শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের প্রকৃতি এবং প্রশাসনিক অধস্তনতা তুলে ধরার পাশাপাশি আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জাতিসংঘের গৃহীত উদ্যোগ সর্ম্পকে ব্যাপক আলোচনা এই অধ্যায়ের অর্ন্তভূক্ত।

৩.১ উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা

উন্নয়ন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রত্যয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির ভিত্তিতে উন্নয়ন সাধিত হতে পারে। অর্থনীতি, রাজনীতি এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে উন্নয়ন সম্ভব। একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নগত অবস্থান বোঝার জন্য সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্বের ও অংশীদারিত্বের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীর সম্পৃক্তকরণ অর্থে উন্নয়ন অর্থ হলো ‘সনাতন মূল্যবোধের দূর্বলীকরণ, প্রজনন হার হ্রাস, নগরায়ন বৃদ্ধি, নারীর জন্য ব্যাপক শিক্ষা ও শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ এবং নারীর যথাযথ ভূমিকা সর্ম্পকে ধারনার ব্যবহারিক পরিবর্তন।’[১]

উন্নয়নে নারীর অবস্থান নির্দিষ্ট করতে হলে প্রচলিত ব্যবস্থায় নারীর সার্বিক অবস্থান এবং ভূমিকা পর্যালোচনা প্রয়োজন। প্রচলিত সমাজ কাঠামোতে নারীর অধস্তন অবস্থান লক্ষ্যণীয়। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব ব্যবস্থায় নারীর ভূমিকার পুর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হয়না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবমূল্যায়ন করা হয়। কর্মের অসম শ্রেণীবিভাগ, গার্হস্থ্য কাজ এককভাবে নারীদের উপর চাপিয়ে দেয়া এবং তাকে কর্ম হিসাবে স্বীকৃতি না দেয়া, পুনরুৎপাদনমূলক কাজের অবমূল্যায়ন, প্রযুক্তি থেকে দূরে রেখে সনাতন কাজে আটকে রাখা, বিনা মজুরিতে শ্রম ও অসম মজুরি নির্ধারণের মাধ্যমে নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে এবং যুগের

পরিবর্তনে যতই আধুনিকতার কথা বলা হোক নারীর পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর অবস্থান টিকিয়ে রাখার প্রয়াস কোনও কোন সমাজে এখনো বর্তমান। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে অর্ন্তভূক্তকরণে বৈষম্য প্রকট আকারে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, নারী বরাবর পুরুষশাসিত সমাজে উপেক্ষিত থেকে গেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ও দাবী উথাপিত হওয়ার মাধ্যমে সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সামনে এসেছে।

বস্তুতপক্ষে: আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে পূর্ণাঙ্গ মানব উন্নয়ন ধারনার বাস্তবায়ন ঘটাতে চাইলে অর্ধেক মানব সম্পদ নারীকে বাদ রেখে যে তা সম্ভব নয় এটা এখন স্পষ্ট হয়েছে। তাই পরিবর্তনের ধারনা জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীরাও তাদের অবস্থার পরিবর্তন এবং মর্যদা আদায়ের ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। বিশ্বব্যাপী নারীর অবস্থানের যথার্থ মূল্যায়নের সুযোগ এসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে কিছুটা পার্থক্য সত্ত্বেও নারীর অবস্থান সার্বিকভাবে অনগ্রসর ও একইভাবে অবমূল্যায়নকৃত- এই বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে গবেষণার আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক থেকে বিষয়টিকে দেখা হয়েছে। উন্নয়নে নারী প্রকৃতপক্ষে কোথায় আছে তা নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে।

উন্নয়নে নারীর ভূমিকা নিয়ে নীতি নির্ধারকদের ধারনা এক ধরনের জটিলতা তৈরী করে। প্রায়শ:ই বলা হয় যে, নারীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে হবে। উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ কথাটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এভাবে যে, এর অর্থ নারী উন্নয়ন কার্যক্রমে অনুপস্থিত। এই ধারনা একেবারেই ঠিক নয়। মূলত: অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শ্রম বিশেষজ্ঞায়নের জটিল কৌশলের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি। সমাজে উন্নয়নের প্রথম ধাপে সকল পণ্য এবং সেবা পারিবারিক গ্রুপের মধ্যে উৎপন্ন হতো, কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান হারে নির্দিষ্ঠ কাজে বিশেষজ্ঞতার সৃষ্টি হলো এবং পারিবারিক গ্রুপের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হলো পণ্য ও সেবার বিনিময়। কিন্তু একেবারে আদিম অবস্থায় পারিবারিক স্বয়ংসর্ম্পুণতার সময়ও কিছু কিছু শ্রমবিভাজন ছিলো নারী-পুরুষ-শিশু ও বৃদ্ধের জন্য। বস্তুত: তখন থেকেই ক্রমে কর্ম বিভাজন থেকে লিঙ্গ বৈষম্যের সূচনা।[২] অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় শুরু থেকেই নারীরা তাতে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে, কিন্তু কর্মের যে বিভাজন তৈরী হয়েছে তাতে নারী ক্রমেই পিছিয়ে পড়েছে।

উৎপাদন ব্যবস্থার শুরু থেকেই নারীরা যে অসমতার আর্বতে আবদ্ধ হয়েছিল, ক্রমেই তার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে শ্রম বিভাজনের ক্রমবর্ধমান প্রসারে নারীর অবস্থান প্রান্তিক হয়েছে। এই প্রান্তিকতা শুধু অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নয়, বরং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা, তাদের অর্জন ও প্রাপ্তি প্রতিটি বিষয়েই প্রযোজ্য। বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলের নারীরা বেশী মাত্রায় এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, নারী উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত অধিকাংশ নারী বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের নারী অর্থনীতির অ-পর্যবেক্ষণকৃত খাতে কাজ করছে যা অংশগ্রহণ বলে বিবেচ্য নয় এবং তাদের সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়। এই ভ্রান্তি দূর করে এভাবে প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করতে হবে যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী প্রান্তিক নয়, কেন্দ্রীয়। এবং নারীর সম্পৃক্তকরণ বলতে সরকার ও বে-সরকারী কার্যক্রমে অর্ন্তভূক্তকরণ নয়, বরং উন্নয়নের ফলে নারীর ক্ষেত্রে কি ঘটছে, তাদের ভূমিকা ও তারা কি লাভ করছে এসবই উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিবেচ্য হওয়া উচিত।[৩]

উন্নয়নে নারীর অর্ন্তভূক্তকরণ সর্ম্পকে নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে ধারনা পরিবর্তনের পাশাপাশি কর্মের ধারনা পরিবর্তনের বিষয়টিও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার প্রয়োজন। উন্নয়নে নারীর বর্তমান ভূমিকার স্বীকৃতি চাইলে কাজের ধারনার পরিবর্তন জরুরি। নারীর কর্মের অব-মূল্যায়ন বা অ-স্বীকৃতির কারণ হিসেবে বর্তমানে এই মত অনেকাংশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নারীদের কাজ কর্মের স্বীকৃতি পাচ্ছেনা, কারণ মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমশক্তিতে তারা নেই। তাই বলা হচ্ছে, কর্মের ধারনাকে বিস্তৃত করা উচিত যাতে নারীর যে সকল কাজের মজুরি নেই কিন্তু অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে এবং যার মাধ্যমে পরিবারের অন্য সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পায় সে সব কাজকে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। নারীর কাজের স্বীকৃতি না থাকার আরেকটি কারণ হলো পরিসংখ্যানে প্রাপ্ত তথ্যের ভ্রান্তি। জরীপের প্রশ্নপত্রের ধরন এবং জরীপ পরিচালনার সময় পুরুষ সদস্যদের প্রভাব প্রকৃত অবস্থাকে আড়াল করে। তাই নারীর শ্রম অদৃশ্য থেকে যায় এবং জাতীয় শ্রমশক্তিতে স্থান পায়না। এভাবেই নারীর ভূমিকা অস্বীকৃত থেকে যায়।[৪] অর্থাৎ কর্মের পরিধি বিস্তৃতকরণ এবং সঠিকভাবে পরিসংখ্যানে অর্ন্তভুক্তকরণের বিষয়টিও অত্যন্ত জরুরি।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান নির্ণয় ও শ্রমের স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে নারীর মতামত গ্রহণের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে জাতীয় নীতি প্রণেতাগণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় নারীর মতামতকে অর্ন্তভূক্ত করা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন।[৫] ফলে, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন নারীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিবেচনা করা হয় না বলে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সার্বিক রূপ লাভ করতে পারে না। প্রথমত: পরিকল্পনা একমুখী ও নারীর প্রতি বিমুখ হয় কিংবা নারীর জন্য সহজগম্য হয় না। দ্বিতীয়ত: বাস্তবায়ন পর্যায়ে নারীর উপযোগী পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় না। ফলশ্রুতিতে মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়ে নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিজের সুস্পষ্ট অবস্থান চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। অর্থাৎ বলা যায়, নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবদান রাখছে কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিবন্ধকতার কারণে তার অংশগ্রহণ পূর্ণ স্বীকৃতি পাচ্ছে না।

৩.২ বিশ্বব্যাপী শ্রমশক্তিতে নারীর অবস্থান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী

বিশ্বব্যাপী শ্রমশক্তিতে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণের জন্য আর্ন্তজাতিক শ্রমবাজারে নারীর অবস্থান সর্ম্পকে বিস্তারিত জানা প্রয়োজন। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পেশাগতভাবে নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থান এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীরা কি ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে তা জানা প্রয়োজন। এই অংশের আলোচনায় ধারাবাহিকভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.২.১ শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা ও তার মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শুরুতেই আলোচনায় উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সেই আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নীতি নির্ধারণের জটিলতার কারণে একদিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অবদানের স্বীকৃতি নেই। আবার অন্যদিকে, নারী পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই দ্বৈত সমস্যার প্রেক্ষিতে বিশ্ব শ্রম শক্তিতে নারীর সীমাবদ্ধ অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

উন্নয়নের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা নির্দিষ্ট করে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে নারীর অংশীদারিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে তা হলো শ্রমশক্তিতে নারীদের ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ। আশি'র দশকের গোড়াঁর দিকে উৎপাদনমূলক কাজের ধারনায় এক

পরিবর্তনের ধারা তৈরী হয় এবং গৃহস্থালী কাজ পর্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। দেখা যায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্মসূচীতে অর্থনীতির বিভিন্ন ইস্যুতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বিষয়ে মনোযোগ দেয়া হয়নি।[৬] তখন থেকে শ্রমবাজারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত হয়। এই গবেষণায় শ্রমশক্তির বিভিন্ন খাতে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে।

• কৃষি ও নারী

কৃষি ও নারীর সম্পর্ক সু-প্রাচীন। কৃষির শুরুতে পুরুষেরা মূলত শারীরিক সামর্থ্যযুক্ত কাজ বেশী করতো এবং নারীরা কৌশলপূর্ণ কাজ বেশী করতো। যেহেতু কৃষি ক্রমে পেশী শক্তির উপর নির্ভরতা কমিয়ে এনেছিল তাই আশা করা হয়েছিল লিঙ্গ বৈষম্য ক্রমে কমে আসবে। কিন্তু তা হয়নি, বরং পুরুষরা আধুনিক পদ্ধতিতে অর্থকরী ফসল উৎপাদনে চলে যায় এবং নারীরা সনাতন পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে থেকে যায়। এভাবে ক্রমে কৃষি উন্নয়ন পরিক্রমায় পুরুষের শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারীরা পিছিয়ে পড়েছে।[৭] নারীর শ্রম উৎপাদনশীলতার এই নিম্নমুখীনতা কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত তার মর্যদাকেও নিম্নমুখী করেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে দেখা যায়, এশিয়ার একটি বড় অংশে নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মজীবি জনসংখ্যা কৃষিকাজে নিযুক্ত। যদিও নারীরাও এই খাতে মুখ্য কিন্তু সাম্প্রতিক কালে তাদের অবস্থান দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। কিন্তু এশিয়ার কৃষিখাতে ভূমির মালিকানা, কাজের মূল্যায়ন এবং আয়ের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য প্রকট। কৃষিতে প্রযুক্তির প্রবর্তনও নারীদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কাজের চাপ কমে, এই বিষয়গুলো এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে উদ্বৃত্ত শ্রমের বাজারে নারীদের কর্মের সুযোগকে সীমিত করে তোলে।[৮] তাছাড়া প্রযুক্তির বিকাশ যেহেতু সবক্ষেত্রে হয়নি তাই গৃহের অভ্যন্তরে কৃষিকাজের চাপ কমেনি, তাই এই সুযোগ নারী-পুরুষের জন্য সমানভাবে সুফল বয়ে আনতে পারেনি। কৃষি বিষয়ক জরীপগুলো সাধারণত: উৎপাদন ও ভূমি ব্যবহারকে ফোকাস করে, মানব সম্পদের ব্যবহার ও গৃহস্থালী কাজকে গুরুত্ব দেয়না।[৯] আদমশুমারী ও শ্রমশক্তির জরীপে যদিও জনসংখ্যার কাজকে ব্যাপকভাবে দেখা হয় তবু তাতে নারীদের শ্রম প্রতিবেদনভূক্ত হয়না। কারণ তাদের অধিকাংশ কাজই অ-মজুরীপ্রাপ্ত ও গার্হস্থ্যসংক্রান্ত। কিন্তু কয়েকটি পরিসংখ্যানে নারীদের অদৃশ্য কাজের ব্যাপ্তি তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৯১-এ ভারতীয় শুমারীতে ৭৩% গ্রামীণ নারী অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয়

নয়। কিন্তু ১৯৮৭-৮৮ সনের পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের জরীপে দেখা যায় ৬০% গ্রামীণ এবং ১৫% শহুরে নারী জ্বালানী সংগ্রহ, বাগান, রান্না, অথবা পশুপালনে ব্যস্ত থাকে যা অর্থনৈতিক কাজ হিসাবে জরীপে আসেনা। তাছাড়া ৫২% গ্রামীণ নারী ও ৯% শহুরে নারী গোবর সংগ্রহ করে জ্বালানীর জন্য এবং ৬৩% গ্রামীণ ও ৩২% পৌর নারী বাইরে থেকে পানি সংগ্রহ করে। এস.এন.ও এবং আই.এল.ও সুপারিশ অনুযায়ী এগুলো সবই অর্থনৈতিক কাজ। পাকিস্তানে মহিলাদের অফিসিয়াল অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ৩% (৮০ সনের জনসংখ্যা জরীপ) থেকে ১২% (একই বছরের শ্রমশক্তি জরীপ)-এ পার্থক্য দেখা যায়। ১৯৮০ সনের কৃষি জরীপ অনুযায়ী ৭৩% নারী কৃষি সংক্রান্ত গার্হস্থ্য কাজের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাজে সক্রিয়। ১৯৯০/৯১ এর শ্রমশক্তি জরীপে নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের হার ৭% যখন প্রশ্নপত্র হয় গতানুগতিক অথচ যখন প্রশ্নপত্র হয় নির্দিষ্ট কাজ ভিত্তিক যেমন, ধান রূপান্তর, বীজ সংগ্রহ প্রভৃতি তখন এই হার ৩১%। বাংলাদেশে ১৯৮৫/৮৬ সনের শ্রমশক্তি জরীপে নারীর হার ১০%। কিন্তু যখন ১৯৮৯ সনের শ্রমশক্তি জরীপের প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট কাজ ভিত্তিক হলো তখন অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের হার গিয়ে দাড়াঁলো ৬৩%-এ।[১০] অর্থাৎ পরিসংখ্যানগত তথ্যের মধ্যেও নারীর অবস্থানকে পিছিয়ে রাখা হয়।

কৃষিতে নারীর অবস্থান সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে:

১.ভূমির মালিকানাতে নারীর অংশীদারিত্বের অভাব

২.শ্রমশক্তি জরীপের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মানদন্ড অণুসরণ না করা

৩.কৃষি সংক্রান্ত গার্হস্থ্য কাজের মূল্যায়ন না করা

উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে বলা যায় যে, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ক্ষেত্রে জটিলতার কারণেই মুলত: নারী কৃষি খাতে পশ্চাৎপদ অবস্থানে রয়েছে।

• গার্হস্থ্য কাজ ও মজুরীলব্ধ শ্রমের তুলনামূলক পরিমাপ

শ্রমশক্তির বিভিন্ন খাতের আলোচনায় অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হলো গার্হস্থ্য কাজ ও মজুরীলব্ধ শ্রমের তুলনামূলক পরিমাপ। বিশ্বব্যাপী শ্রমশক্তির হিসেবে নারী পিছিয়ে থাকে কর্ম মূল্যায়ন পরিমাপের ভিন্নতার কারণে। সামাজিক ব্যবস্থার দীর্ঘ সময়ের প্রচলিত মূল্যবোধের কারণে নারী ও পুরুষের জন্য কিছু স্বতন্ত্র কর্ম পরিধি রয়েছে। লিঙ্গ বিভাজন কর্মের বিভাজন তৈরী করে অসমতার প্রেক্ষিত তৈরী করে ও টিকিয়ে রাখে।

অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রে পরিবার ও কাজ ক্রমাগত একসংগে জড়িত থাকে। অধিকাংশ পুরুষের জন্য কাজ অর্থ হলো র্নিদিষ্ট সময় বাড়ীর বাইরে থেকে আয় উৎপাদনকারী চাকুরী।[১১] অর্থাৎ নারীর জন্য কর্মের পরিধি ব্যাপক কিন্তু তার মূল্য কম। অন্যদিকে পুরুষের কর্ম এলাকা র্নিদিষ্ট ও সীমিত অথচ মূল্য বেশী। কর্মের হিসাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে দেখা গেছে অধিকাংশ রাষ্ট্রে নারীরা সপ্তাহে ৩০ ঘন্টা বা আরো বেশী সময় গার্হস্থ্য কাজে ব্যয় করে, যেখানে পুরুষেরা সপ্তাহে ১০-১৫ ঘন্টা ব্যয় করে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে এই হার বেশী।[১২] আগে এই মজুরীবিহীন শ্রমের কোন হিসাব না থাকলেও বর্তমানে অনেক প্রতিবেদনে তা অর্ন্তভূক্ত হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, যখন গৃহের মজুরীবিহীন অর্থনৈতিক কাজকে হিসাবে নেয়া হয় তখন নারীরা বিশ্বের শ্রমের ৫৫% সম্পন্ন করে। অর্থাৎ নারীর গার্হস্থ্য কাজ ও গৃহের বাইরের কর্মক্ষেত্রের কাজ সংযুক্ত হলে বিশ্ব শ্রমশক্তির অর্ধেকের বেশী নারীদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। সময়ের পরিবর্তনে অনেক নারী গার্হস্থ্য কাজের পাশাপাশি মজুরীপ্রাপ্ত শ্রমশক্তিতে নিয়োজিত হয়েছে। ১৯৯৪ সনে উন্নয়নে নারী শীর্ষক বিশ্ব জরীপে দেখা গেছে আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীদের নজিরবিহীন অনুপ্রবেশ ঘটছে। ১৯৯০-এ বিশ্বব্যাপী ৮৫৪ মিলিয়ন নারী অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় যা বিশ্ব শ্রমশক্তির ৩২%। ১৫ বছর বা তার উর্ধ্বে নারীরা শ্রমশক্তিতে আছে যা সকল নারীর এক তৃতীয়াংশ (৩৪%)।[১৩] কিন্তু কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ রয়ে গেছে পূর্বের মতই সম্পূর্ণ পুরুষসুলভ এবং সর্ম্পূণভাবে নারীর জীবনবিমুখ। ফলে নারীকে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয় প্রাইভেট ও পাবলিক স্পেসের কাজের মধ্যে সমণ্বয় ঘটাতে গিয়ে। এবং এর অনিবার্য পরিণতি হলো নারীর জন্য দ্বৈত কর্মদিবসের বোঝা বহন।[১৪] নারী তাই কখনো কখনো অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা স্বাধীনতা পেলেও সামগ্রিকভাবে অধিক কাজের চাপে আরো বেশী শোষিত হচ্ছে। নারীদের এই অধিক কাজের বোঝার উদাহরণ নীচের ছকটির মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

সারণী: ৩.১ তিনটি দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রে সময়ের ব্যবহার, ১৯৮৯/৯২

'অর্থনৈতিক কাজের সপ্তাহব্যাপী শ্রমঘন্টা'

	বেতনভূক্ত	জীবনধারণযোগ্য	মোট	গৃহস্থালী কাজে সপ্তায় শ্রন(ঘন্টা)	সপ্তাহে মোট শ্রমঘন্টা

বাংলাদেশ বয়স ৫+					
নারী	১৪	৮	২২	৩১	৫৩
পুরুষ	৩৮	৩	৪১	৫	৪৬
ভারত বয়স ১৮+					
নারী	২৮	৭	৩৫	৩৪	৬৯
পুরুষ	৪৩	৪	৪৭	১০	৫৭
নেপাল বয়স ১৫+					
নারী	১৮	১৭	৩৫	৪২	৭৭
পুরুষ	২৯	১২	৪১	১৫	৫৬

সূত্র World's Women 1995, Page 108

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নারীর গার্হস্থ্য শ্রম এবং বাইরের কর্মক্ষেত্রের শ্রমের তুলনামুলক পরিমাপের বিষয়ে কয়েকটি বিষয় আলোচনায় এসেছে:

১.অর্থনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকল গার্হস্থ্য কাজের কর্মের অন্তর্ভূক্তকরণ না হওয়া

২.কর্মের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মজুরীবিহীন কাজকে প্রতিবেদনভূক্ত করার নিশ্চয়তা সৃষ্টি না হওয়া

৩.প্রাইভেট ও পাবলিক স্পেস উভয় ক্ষেত্রে কাজের স্বীকৃতি ও পরিমাপের স্পষ্টতা না থাকা।

৪.নারীদের বাড়ীর বাইরে কাজ করার ব্যাপারে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা।

৫.পাবলিক স্পেসের কাজের পরিবেশ নারীর প্রতি সংবেনশীল না হওয়া।

৬.নারীর পরিবর্তিত ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে তার গার্হস্থ্য কাজে পুরুষের সহযোগিতা না থাকা।

এই বিষয়গুলো উন্নয়নে নারীর যথাযথ ভূমিকা নির্ণয়ে সীমাবদ্ধতা তৈরী করে।

- ## শ্রমবাজারে প্রবেশ এবং প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ

আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীর প্রবেশেরও ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে পুরুষেরা দিনমজুরীর কাজের সন্ধানে নিজ এলাকা ছেড়ে অন্য অঞ্চলে যায় এবং তখন নারীরা এমন ধরনের কাজে নিযুক্ত হয় যা আগে সাধারণভাবে পুরুষেরা করতো।[১৫] পরবর্তীতে এই ধারা আরো গতিশীল হয় এবং এই ধারাবাহিকতা এখনো বর্তমান। যেসব রাষ্ট্রে পুরুষরা ব্যাপক হারে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন (Migrate) করেছে এবং যেখানে শিক্ষা ও চাকুরীর সুযোগ বেশী সেখানে নারীদের পাবলিক স্পেসে প্রবেশের হার বেশী। পাশাপাশি নারীপ্রধান পরিবারে অর্থনৈতিক

সহযোগিতার জন্য নারীদের চাকুরী খুঁজে নিতে হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তনের আলোকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি পরিবর্তনের ফলে নারীদের শ্রমবাজারে প্রবেশের প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীর প্রবেশের আরেকটি বিশেষ টার্নিং পয়েন্ট হলো ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে নারীর প্রবেশাধিকার। ৮০'র দশকের শুরুতে অনেক ক্ষুদ্র ঋণ দাতা প্রতিষ্ঠান স্বল্প আয়ের নারীদের অর্ন্তভূক্ত করলো এবং পরিবর্তনের এক সম্ভাবনাময় বাহক হিসেবে তাদের আবিষ্কার করলো। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, স্বল্প আয়ের নারীরা যদি বাজারে নির্ধারিত সুদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক কার্যক্রমে প্রবেশাধিকারের সুযোগ পায়, তাহলে তারা ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে এবং নিজেদের আয় এবং সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। এও দেখা গেছে নারীরা তাদের নিজেদের আয় এবং সম্পদ বৃদ্ধির পর তাদের পরিবারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বৃদ্ধিতে তার ব্যবহার করে। বর্তমানে আর্ন্তজাতিকভাবে অগ্রণী কয়েকটি ক্ষুদ্র ঋণ দাতা প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রমে নারীদের ব্যাপক হারে অর্ন্তভূক্ত করছে নিজেদের আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং উন্নয়নের নিশ্চয়তার সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে।[১৬] মাইগ্রেশন, ক্ষুদ্র ঋণ যখন নারীদের শ্রমবাজারে প্রবেশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তখন নারীদের অর্জিত যোগ্যতাকে দমিয়ে রাখা ও প্রাপ্য অধিকারকে দমন করে শ্রমবাজারে নারীর প্রবেশাধিকারকে সীমিত করার ঘটনাও ঘটছে।

অর্থাৎ, শুধু গৃহের বাইরে প্রবেশের সুযোগ তৈরী হয়নি, এর বিপরীত চিত্রও বিরাজ করছে। বিভিন্ন উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ও পূর্ব ইউরোপের পরিবর্তনকালীন সময়ে দেখা গেছে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও সরকারী ব্যয়ের সংকোচন অনেক ক্ষেত্রে নারীদের কাজের সুযোগ হ্রাস করেছে। কখনো কখনো জোর করেই নারীদের শ্রমবাজারের বাইরে রাখছে।[১৭]

শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের সুযোগ উন্নয়নে অংশীদারিত্ব অর্জনের অন্যতম বাহক হলেও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকদের সুস্পষ্ট ও লিঙ্গ সমতাভিত্তিক নির্দেশনা না থাকার কারণে আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীর প্রবেশাধিকার সীমিত ও পুরুষের ইচ্ছার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

- বিভিন্ন খাতে শ্রম বিনিয়োগ

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নারীরা ভিন্ন ভিন্ন খাতে শ্রম বিনিয়োগ করে। নারীদের ক্ষেত্রে মজুরীপ্রাপ্ত ও মজুরীবিহীন শ্রম বিনিয়োগে খাত অনুযায়ী ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। লিঙ্গ বৈষম্য সকল ক্ষেত্রেই লক্ষ্যণীয়। কৃষি, শিল্প এবং চাকুরী খাতে শ্রমশক্তির বন্টনে অধিকাংশ অঞ্চলে লিঙ্গ বৈষম্য লক্ষ্যণীয়। পূর্ব ইউরোপের বাইরে উন্নত অঞ্চল এবং ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে প্রায় ৭৫% শ্রমশক্তির নারী কাজ করছে সার্ভিস সেক্টরে। সাব সাহারা আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম অংশ নারী-পুরুষ চাকরিতে নিযুক্ত। এই হার সাধারণত ৩০% এর কম। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণত শিল্প প্রতিষ্ঠানে নারীদের চেয়ে পুরুষের নিয়োগ বেশী হয়। সাব সাহারা অঞ্চলে বিশেষত: নারীদের জন্য কৃষিই হচ্ছে মূল শ্রমশক্তি। এখানে প্রায় ৭৫% নারী কৃষিতে নিযুক্ত এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ৫৫% নারী কৃষিতে নিযুক্ত। এই দুই অঞ্চলের ক্ষেত্রেই কৃষিতে নিযুক্ত অনেক নারী মজুরীপ্রাপ্ত শ্রমশক্তিতে নেই, যারা কৃষি সংক্রান্ত মজুরীবিহীন কাজ করছে। অনেক নারী বাইরে যাবার সুযোগের অভাবে কৃষি ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজে নিযুক্ত থাকে। সাব সাহারা আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার শিল্পখাতে ২০% এরও কম নারী নিযুক্ত। কয়েকটি ব্যতিক্রম হচ্ছে মালয়েশিয়া (২৬%), হন্ডুরাস (৩৪%), ম্যাক্সিকো (৩৫%), এবং সিঙ্গাপুর (৪২%)। যখন বেতনপ্রাপ্ত চাকরির সুযোগ অপ্রতুল থাকে তখন অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিযুক্তি দেখা দেয়। আফ্রিকার দেশগুলোতে এই প্রবণতা বেশী। পশ্চিম এশিয়ায় ১০% এর কম নারী এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকলেও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে এই হার বেশী। কোরিয়ায় ৪১%, ইন্দোনেশিয়ায় ৬৫% নারী অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত আছে।[১৮]

৩.২.২ পেশাভিত্তিক অধস্তন অবস্থান

বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে পাবলিক স্পেসে নারীদের কর্মে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপুর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো পেশার ধরন। অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন হারে নারীরা পুরুষের তুলনায় বিভিন্ন পেশাগত গ্রুপে নিয়োজিত হয়।

সারণী: ৩.২ প্রধান পেশাগত গ্রুপে নারী-পুরুষ শ্রমশক্তির বন্টনের শতকরা হার,

"প্রধান পেশাগত গ্রুপে নারী-পুরুষ শ্রমশক্তির বন্টনের শতকরা হার, ১৯৭০ এবং ১৯৯০"

শ্রমশক্তিতে লিঙ্গভিত্তিক বন্টনের শতকরা হার

	পেশাভিত্তিক ও ট্যাকনিক্যাল এবং প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত		কারণিক, বিপণণ ও সেবামূলক		কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত		উৎপাদন ও পরিবহনশ্রমিক ও কর্মী	
	১৯৭০	১৯৯০	১৯৭০	১৯৯০	১৯৭০	১৯৯০	১৯৭০	১৯৯০
	নারী							
উন্নত অঞ্চল	১৩	২৩	৪৯	৪৮	১৪	৮	২০	১৫
উত্তরআফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া	২৫	২১	২৬	৩৫	৩৭	২৭	৯	৯
সাব-সাহারা আফ্রিকা	৫	৬	২৭	২৩	৫৪	৫৩	৭	৯
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয়	১৩	১৫	৫৪	৫৫	১১	৫	১৫	১৪
পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া	৮	৯	৩১	৩৮	৩৩	৩৫	২০	১৪
দক্ষিণ এশিয়া	৪	১১	৮	১২	৬৫	৪৪	২১	১৯
ওশেনিয়া	১৬	১৭	২২	৩৭	৫৮	২১	৩	১৩
	পুরুষ							
উন্নত অঞ্চল	১৩	২০	২০	২২	১৫	৯	৪৮	৪৩
উত্তরআফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া	৭	১১	২৫	২৯	২৪	১৮	৩৮	৩৫
সাব-সাহারা আফ্রিকা	৪	৫	১৪	১৪	৪৮	৫০	২৮	২১
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয়	৬	১১	১৬	২৫	৪৪	২১	২৭	৩৬
পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া	৭	৯	২৫	২৩	৩২	৩৭	২৯	২৯
দক্ষিণ এশিয়া	২	৫	১০	২০	৭৩	৩৯	১৩	২৬
ওশেনিয়া	৭	১৩	৯	১৫	৬৭	৩২	১৭	২৮

p§œ:The Word's women 1995-Trends and Statics,United Nations publications, page:125

শ্রমবাজারে লিঙ্গভিত্তিক অবস্থানের ক্ষেত্রে সকল অঞ্চলের ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ সত্য হলো কারণিক (Clerical) ও সেবাপ্রদানমূলক (Sales or Service) কাজ এবং পেশাভিত্তিক ও কারিগরী কাজে নারীদের যতটা দেখা যায়, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এবং উৎপাদনমূলক (Production) ও পরিবহন সংক্রান্ত কাজে নারীরা ততটাই কম দৃশ্যমান।

- পেশাগত ভিন্নতা ও অসাম্য

বাইরে কর্মক্ষেত্রে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট বিভিন্ন পেশা আছে যেখানে উচ্চহারে নারীদের কেন্দ্রীকরণ ঘটে। আবার এও দেখা যায় নারীরা যখন অধিক হারে পূর্বে পুরূষ নিয়ন্ত্রিত পেশায় আসতে শুরু করে তখন ঐ পেশার মর্যদা হ্রাস পায়। লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের কারণে পুরূষের তুলনায় নারীদের আয় কম। কারণ পুরূষেরা

সাধারণত: উচুঁ আয়ের পদে নিযুক্ত থাকে এবং নারীরা নিম্নপদে। পেশার ক্ষেত্রে এই ভিন্নতা পারস্পরিক সম্পৃক্ত আরো কয়েকটি বিষয়ে প্রভাব তৈরী করে। যেমন, দক্ষতা, দায়িত্ব, মর্যদা এং ক্ষমতায় বৈষম্য তৈরী হয়।[১৯] এসব বৈষম্য নারীদের ক্রমশই: পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ করে তোলে।

নারীদের পশ্চাৎপদ অবস্থানের আরেকটি গুরুতাপূর্ণ কারণ হলো মজুরী বৈষম্য। উপরোক্ত কারণগুলো নারীদের স্বল্প মজুরী প্রাপ্তিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। নারীদের স্বল্প মজুরীর আরেকটি কারণ হলো খন্ডকালীন চাকুরী। ইউরোপীয় ইউনিয়নে নারীরা পুরুষের তুলনায় খন্ডকালীন চাকুরী বেশী পছন্দ করে। এই কর্মীরা মূলত: নারী কেন্দ্রীভূত এবং স্বল্প মজুরীর পেশায় কাজ করে। প্রসূতিকালীন ছুটির অ-পর্যাপ্ততা নারীদের পূর্ণদিবস কাজের ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা।[২০]

খন্ডকালীন চাকুরীতে মনযোগ এবং পূর্ণ দিবস চাকুরীতে সীমাবদ্ধতা নারীদের পেশাগত প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দেয় এবং উচ্চ প্রশাসনিক পদে নারীদের স্বল্প হারে উপস্থিতির প্রেক্ষাপট তৈরী করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ সংস্থাগুলোতে চিফ এক্সিকিউটিভ হিসাবে ১৯৯৩ সনে নারীর হার ১%, সিনিয়র ম্যানেজার ২%, সেক্টোরাল ম্যানেজার ১০%। সার্বিকভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সকল অঞ্চলে নারীর সংখ্যা কম হলেও আগের তুলনায় কিছুটা হার বেড়েছে। ইউরোপের বাইরে অন্যান্য উন্নত অঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬% থেকে ৩৩%। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, হাঙ্গেরী, সুইডেন ও যুক্তরাষ্ট্রে ৪০% নারী প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করছে। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে এই হার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮% থেকে ২৫%-এ। পশ্চিম ইউরোপে ১২% থেকে ১৮% এবং সাব সাহারা আফ্রিকায় ৮% থেকে ১৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।[২১] পুরুষের তুলনায় নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থানের তেমন কোন বড় ধরনের পরিবর্তন হয়নি। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সনে এই পরিবর্তন দেখানো হচ্ছে: ছক- ব্যবস্থাপনায় নারী: পশ্চাৎপদ অবস্থান

সারণী: ৩.৩ প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনামূলক পেশায় অঞ্চলভেদে পুরুষের তুলনায় নারীর হার, ১৯৮০ ও ১৯৯০, ১০০ জন পুরুষের বিপরীতে নারী

অঞ্চল	১৯৮০	১৯৯০
আফ্রিকা	১০	১৮

এশিয়া ও প্যাসিফিক	৯	১০
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয়	২৪	৩৪
পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য	২৩	৪১
বিশ্ব	১৯	৩৪

সূত্র: WOMEN: Looking Beyond 2000, Page: 47

সুতরাং দেখা যায়, পেশাগত ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী নারীরা সমতাভিত্তিক জীবনব্যবস্থা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। কম-বেশী প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই নারীরা পুরুষের তুলনায় অধস্তন পেশাগত মর্যদা ভোগ করছে। তবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমুহে নারীরা অপেক্ষাকৃত অগ্রসরতা অর্জন করেছে। আরেকটি লক্ষণীয় পরিবর্তন হচ্ছে পূর্বের তুলনায় বৈশ্বিক পর্যায়ে নারীদের নিম্ন হারে প্রশাসনিক অবস্থানের কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে।

এই অংশের আলোচনার শেষে বলা যায়, পেশাভিত্তিক অধস্তনতা বিভিন্নভাবে নারীদের পিছিয়ে রাখছে। পুরুষের তুলনায় সীমিত অংশগ্রহণ, স্বল্প বেতন, মর্যদার ঘাটতি, ক্ষমতার ব্যবধান প্রতিটি বিষয় পরস্পর সম্পৃক্ত ও উন্নয়নের ধারায় কার্যকর শক্তি। বস্তুত, কর্মজগতের এই পশ্চাৎপদতা সার্বিকভাবে নারীদের উন্নয়নে অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে।

৩.২.৩ রাষ্ট্রীয় সুযোগ ও অধিকারে বৈষম্য

রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নারী-পুরুষ সকলের কিছু সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বিশ্বব্যপী নারীরা এইসব সুযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পত্তি, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রতিটি বিষয়ে নারীরা পশ্চাৎপদ অবস্থানে রয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখা যায়, এখন পর্যন্ত বিশ্বের নিরক্ষরের মধ্যে নারী দুই-তৃতীয়াংশ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য অনেকাংশে কমে এসেছে। ২০০৫ সালের মধ্যে এই বৈষম্য সম্পূর্ণ রোধ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী

নারীদের ভর্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।[22] তবে বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলেই তা পুরুষের তুলনায় কম। স্বাস্থ্য খাতে দেখা যায়, নারীদের মধ্যে মাতৃ মৃত্যু হার অনেক বেশী। তাছাড়া নারীরা পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের প্রসবজনিত জটিলতায় ভোগে। অধিকাংশ নারী পুরুষের তুলনায় অধিক হারে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। সম্পত্তির ক্ষেত্রেও নারীরা পুরুষের তুলনায় কম অংশের মালিকানা পায়। বর্তমান সময়ে আরেকটি অত্যন্ত বিপদজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে নারীদের জন্য- তা হচ্ছে মৌলবাদের উথান। সামগ্রিকভাবে মৌলবাদ উন্নয়নের বিপরীতে অবস্থান করলেও নারীরা এর প্রধান শিকারে পরিণত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আফগানিস্থানের তালেবানী শাসন সে দেশের নারীদের একটি সর্ম্পূণ প্রজম্মকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে পর্যায়ক্রমে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বর্হিজগতে প্রবেশাধিকার সবদিক থেকে রূদ্ধ করে নারীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রাচীন সমাজে। ফলে একটি জাতি পশ্চাৎপদতার আর্বতে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারীরা বিশেষভাবে বৈষম্যের মুখোমুখি হয়। রাজনীতির পুরুষসুলভ পরিবেশ নারীদের জন্য বিরূপ পরিস্থিতি তৈরী করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সকল ধরনের সুযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী অনগ্রসর অবস্থ্নে আসীন। এবং সকল ক্ষেত্রে এই পশ্চাৎপদতার মূলে রয়েছে সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় নীতির অভাব।

বিশ্ব পর্যায়ের আলোচনায় উন্নয়নে নারীর অবস্থান দেখাতে গিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে নারীর বর্তমান সীমাবদ্ধ অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করার সুবিধার্থে। নারীর বিপুল শ্রম এখন পর্যন্ত রয়েছে অ-স্বীকৃত। বিভিন্ন কারণের প্রেক্ষাপটে সীমিত আকারে শ্রমবাজারে নারীর অনুপ্রবেশ ঘটলেও নারী সম সুযোগ অর্জন করতে পারেনি। মজুরী বৈষম্য, কর্মক্ষেত্রের বিরূপ পরিবেশ, কাজের ধরনের পার্থক্য, পেশাগত ভিন্নতা সব মিলিয়ে নারী উন্নয়নে কাঙ্খিত সাফল্য পায়নি। প্রথমত নারী যথাযথ অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এবং দ্বিতীয়ত নারী উন্নয়নের সুফল সমানভাবে ভোগ করতে পারেনি। ফলে উন্নয়নে নারীর সম অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

কিন্তু বিশ্বব্যাপী নারীর এই অসম অবস্থান নিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে এই অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ চলছে। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ আর্ন্তজাতিক সংস্থা জাতিসংঘের ভূমিকা জানা একান্ত প্রয়োজন।

৩.৩ উন্নয়নে নারী: জাতিসংঘের অবস্থান

জাতিসংঘ হচ্ছে সর্বোচ্চ আর্ন্তজাতিক সংস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের কেন্দ্রস্থল এই প্রতিষ্ঠান নারীর সর্ম্পকে কি ভাবছে এবং কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা এবার বিশ্লেষণ করা হলো।

৩.৩.১জাতিসংঘ চার্টারে নারী

জাতিসংঘ চার্টার একটি আর্ন্তজাতিক দলিল। জাতিসংঘ চার্টারে লিঙ্গভেদে সমতা সর্ম্পকে স্পষ্ট বলা হয়েছে: The people's of the United Nations determine to reaffirm faith the fundemental human rights, in the only dignity and worth of the human rperson, in the equal rights of men and women----"[২৩]

চার্টারের প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, জাতিসংঘের লক্ষ্য হচ্ছে ---গোত্র, লিঙ্গ, ভাষা কিংবা ধর্মভেদে কোন পার্থক্য না করে মৌলিক স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের প্রতি সম্মান রক্ষায় উৎসাহ ও পৃষ্টপোষকতা দানে আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা অর্জন করা। ' ১৯৪৮ সনে গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় বলা হয়েছে---' সকল মানুষ স্বাধীন এবং সমান মর্যদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে' দ্বিতীয় ধারায় আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কোনরকম পার্থক্য না করে যেমন গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষাভেদ না করে প্রত্যেককে এই ঘোষণায় সকল অধিকার ও স্বাধীনতার সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে।[২৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জাতিসংঘ চার্টারে নারীর প্রতি কোনভাবেই লিঙ্গ বৈষম্য করা হয়নি। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে।

৩.৩.২ নারী দশক ও বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সম্মেলন

চার্টারের মূলনীতি ও সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে আরো সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট প্রস্তুতি নেয়া হয় লিঙ্গভিত্তিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য। এই প্রচেষ্টা জোরালো হয় ৭০ এর দশকে। সমতা ও মানবাধিকারে নারীর অবস্থান স্বীকৃত হয় জাতিসংঘের নারী দশক উন্নয়নের এক কেন্দ্রীয় ইস্যু হিসেবে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ১৯৭৯ সনের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ৩৪তম সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত দলিল (CEDAW)।[২৫] ১৯৭৬-৮৫ নারী দশকে বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়। সরকারগুলো এ ব্যাপারে সচেতন হয়। উন্নয়নে নারী বিষয়ে Women in development (WID) নারী সম্পৃক্ততা নিয়ে কাজ করে। ১৯৭৯ তে প্রকাশিত UNITER রিপোর্ট শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে নারী ও প্রযুক্তি' তে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে প্রযুক্তির উন্নতিতে নারীদের জন্য কি সমস্যা তৈরী হয়েছে তার ব্যাখ্যা রয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়ন এসেছে পুরুষের হাতে এবং তাদের কাজে। তাই নারীরা রয়ে গেছে অনুৎপাদনশীল ও সনাতন কাজে। আই.এস. এস রিপোর্টে বলা হয়েছে উন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে নারীরা যতদিন পর্যন্ত সমাজ ও উন্নযন প্রক্রিয়ায় প্রান্তিকভাবে টিকে আছে সেখানে সাম্য অর্জন করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সম্মেলনগুলোতে নারী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯৮০ সনে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত মধ্যদশক সম্মেলনে গবেষক ইনগ্রিড পামারের পর্যবেক্ষণে তুলে ধরা হয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা। ১৯৮২ তে নেদারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় 'উইম্যান এন্ড দি ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অর্ডার' এর উপর এনজিও কনফারেন্স। তাতে বলা হয়, উত্তর ও দক্ষিণ উভয়ের জন্য এখন আমাদের প্রয়োজন আরেকটি উন্নয়ন। নারীদের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তাদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে। শুধুমাত্র তখনই উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক টার্ম হিসেবে বিবেচ্য হবেনা, বরং মানবিক বিষয় হিসেবে বিবেচ্য হবে।[২৬] ১৯৮৫ এর নাইরোবী কনফারেন্সকে সামনে রেখে সংগঠিত হয় 'উন্নয়নে নারী' শীর্ষক বিশ্ব জরীপ। সাধারণ পরিষদের নির্দেশনা অনুযায়ী এই জরীপে যে সব বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা হয় সেগুলো হচ্ছে:

ক) উন্নয়নের প্রতিটি খাতে সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে নারীদের বর্তমান ভূমিকা

খ) উন্নয়নে অংশগ্রহণের ফল হিসেবে বিশেষত: আয়, কাজের প্রকৃতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা কি অর্জন করছে তার পরিমাপ

গ) জাতীয়, আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে এজেন্ট সুবিধাভোগী হিসেবে নারীদের ভূমিকার উন্নয়নে পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণ।

ঘ) সার্বিক উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে এ ধরনের অগ্রসরতার সম্ভাব্য ফল

জরীপে শিল্পখাতে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোতে (Export Processing Zone-EPZ) সম্পুরক শ্রমিক হিসেবে নারীদের অস্থায়ী নিয়োগ, কৃষিতে অদৃশ্যমান শ্রম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ব্যবসা, প্রতিটি খাতে নারীদের অব-মূল্যায়নকৃত অবস্থাকে তুলে ধরে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হয়।[২৭]

World Survey এর পাশাপাশি UNDP (United Nations Development Program) উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে পৃথক একটি Study করে, যা ছিলো ১৯৮০-এর কোপেনহেগেন সম্মেলনের follow-up কার্যক্রম। এক্ষেত্রেও বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়। DAWN এর পক্ষ থেকে সম্মেলনে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এতে বলা হয়, “চলমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় যেখানে সম্পদ, ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ জনগণের এক ক্ষুদ্র অংশের জন্য সংরক্ষিত সেখানে নারীর জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা এবং নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।”[২৮]

নাইরোবী সম্মেলনে দেখা যায় WID তেমন কার্যকর হয়নি। তখন Gender and Development (GAD) ধারনার সূত্রপাত ঘটে। নাইরোবী সম্মেলনের চূড়ান্ত দলিল হিসেবে Forward Looking Strategies(FLS) গৃহীত হয় নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে। এর মূল বিষয় হচ্ছে সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি।

“সমতা হলো একইসঙ্গে লক্ষ্য ও উপায়। যার মাধ্যমে ব্যক্তি আইনের অধীনে সম মর্যদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রাপ্তির মাধ্যমে নিজেদের মেধা ও দক্ষতার উন্নতি ঘটিয়ে জাতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সুবিধাভোগী ও সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারে।---(প্যারাগ্রাফ ১১) ”

“উন্নয়ন অর্থ হলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানব জীবনের অন্যান্য দিক যেমন, তেমনি মানুষের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের এবং

শারীরিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ সহ সামগ্রিক উন্নয়ন।" ---- (প্যারাগ্রাফ ১২)।

শান্তি বলতে শুধু জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে যুদ্ধ সন্ত্রাস এবং শত্রুতার অনুপস্থিতি বোঝায় না। বরং সমাজের অভ্যন্তরে মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের পূর্ণ বিকাশ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা ভোগ করাকে বোঝায়। (প্যারাগ্রাফ১৩)।

FLS এ বলা হয়েছে, উন্নয়নে নারীর বুদ্ধিজীবী, সিদ্ধান্ত প্রণেতা, নীতি প্রনয়ণকারী, পরিকল্পনাকারী এবং অবদানকারী ও সুবিধাভোগী হিসেবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। (প্যারাগ্রাফ ১৫) এটি নতুন পদক্ষেপ যে, UN সিষ্টেমে সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের চোখে নারীকে অবজেক্ট নয় সাবজেক্ট হিসেবে দেখা হচ্ছে। বলা হয়েছে, এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে উন্নয়নের নতুন কৌশলকে পৃষ্টপোষকতা করবে এমন রাজনৈতিক সদিচ্ছা যা নারীর অগ্রসরতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে এবং সর্বাগ্রে বর্তমান অসম অবস্থা ও কাঠামো যা ক্রমাগত নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে নারী ইস্যুকে সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেয় এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন। উন্নয়ন এখন পৃথক থাক্তে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে সমাজে নারীর কেন্দ্রীয় ভূমিকা স্বীকৃত হবে এবং তার যর্থাথ মূল্যায়ন হবে। এর ফলে কৌশলে নারী তার আইনগত ও গুরুত্বর্পূণ অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। এবং স্থায়ী উন্নয়নের জন্য এই পরিবর্তন জরুরী (প্যারাগ্রাফ ২১)। FLSএ উন্নয়ন ধারনায় নারীদের আত্মনির্ভরশীলতাকে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। FLS দলিলে সমতা ও কল্যাণকে উন্নয়নেব মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দুই হাজার সন অবধি এই দলিল সীমিত হারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারসমূহের দৃষ্টি আর্কষণ করতে পারে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সম্মেলনে নারী ইস্যু আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। ১৯৯৫ সনে অনুষ্ঠিত হয় বেইজিং চর্তুথ বিশ্ব নারী সম্মেলন। এবং ঘোষিত হয় বেইজিং প্ল্যান ফর এ্যাকশন। দশক ধরে বহু নিরীক্ষাধর্মী গবেষণা ও তৃণমূল পর্যায়ে বিশ্বব্যাপী বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রতিনিধিদের মতৈক্যের মাধ্যমে বারোটি বিষয় চিহ্নিত করা হয় সমস্যা হিসেবে। দারিদ্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী নির্যাতন, যুদ্ধাবস্থা, অর্থনীতি, নীতি ও নির্বাচন প্রক্রিয়া, মানবাধিকার, গণমাধ্যম, পরিবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কন্যা শিশুর অধিকার, এই বারোটি বিষয়ের মধ্যে সামগ্রিকভাবে নারীর অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে। এবং বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এবং রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[২৯]

২০০০ সালে অনুষ্ঠিত হয় বেইজিং+৫ সম্মেলন। বেইজিং প্ল্যান ফর এ্যাকশন এর অগ্রগতি, বাস্তবায়নে সমস্যা, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের অগ্রগতি ও বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

এছাড়া জাতিসংঘের বিভিন্ন সংগঠন উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইউনিসেফ মহিলাদের সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। সংঘবদ্ধ গ্রুপ হিসেবে তারা যে সব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, তা সামাজিক সম্পদ বলে সম্পৃক্ত করা ও নির্ধারিত সরকারী সম্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়াজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে ইউনিসেফ। এবং একজন ব্যক্তি হিসেবে যে সব ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে সেগুলো হচ্ছে, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, স্যানিটেশন পর্যবেক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষার প্রশিক্ষক এবং পরিবারের প্রভাব স্থাপনকারী। ইউনিসেফের উচিত বলে নির্ধারণ করা হয়েছে, উৎপাদনকারী, ম্যানেজার, শিক্ষক, স্বাস্থ্য কর্মী, ইনকাম আর্নারস প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীদের সক্রিয় ভূমিকা বৃদ্ধি করা। এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশগ্রহণে সহায়তা এবং তাদের নিকট সেবা পৌছাঁনোর নিশ্চয়তার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সর্বোচ্চকরণ নিশ্চিত করা।[৩০]

একইভাবে ইউএনডিপির সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ও সুবিধাভোগী হিসেবে নারীদের অর্ন্তভূক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য নয়, বরং এই দৃঢ় প্রত্যয় থেকে যে, দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে, যখন নারীরা আরো কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত হবে। এই উদ্যোগ নাইরোবীতে ১৯৮৫ তে- গৃহীত নারী দশক অনুযায়ী Forward Looking strategies অনুযায়ী স্বীকৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারগুলোকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনে উৎসাহিত করেছে। ইউএনডিপির কর্মীরা নিয়মিত স্টাফ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে উইম্যান ইন ডেভেলপমেন্ট (WID) বিষয়ক ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে প্রশিক্ষিত হয়। এগ এবং বে-সরকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদানের লক্ষ্যে Women in Development বিভাগের পক্ষ থেকে ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ এবং স্প্যানিশ ভাষায় WIDLINK নামক এক পৃষ্ঠার একটি কান্ট্রি প্রোফাইল বের করা হয়।[৩১] সুতরাং বলা যায়, জাতিসংঘ পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সম্মেলন ও তার ভিত্তিতে বিভিন্ন

কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে নারীর জন্য উন্নয়ন ও নারীকে উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে কার্যকর উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে।

৩.৩.৩ জাতিসংঘ কাঠামোয় নারী

নারীর অগ্রসরতা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও নীতিমালা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে জাতিসংঘ কাঠামোয় একাধিক আন্ত:রাষ্ট্রীয় অংগ সংগঠন রয়েছে। সাধারণ পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কমিশন অন দ্যা স্ট্যাটাস অব উইম্যান এর সুপারিশ Economic and Social Council (ECOSOC) গ্রহণ করে এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে চূড়ান্ত স্বীকৃতির জন্য সাধারণ পরিষদে প্রেরণ করে। সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বিশেষত: যেগুলো জরীপের মাধ্যমে গৃহীত হয় তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সকল সদস্য রাষ্ট্র বাধ্য। CEDAW এর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট বিচার সংক্রান্ত CEDAW কমিটি রয়েছে। The United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW) একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এছাড়া UNDP এর দায়িত্বের অংশবিশেষ পালন করে নিজস্ব Division for Women in Development এর মাধ্যমে।[৩২]

জাতিসংঘ কাঠামোয় নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতিসংঘ চার্টারে বলা হয়েছে "The United nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs".[৩৩] এই বক্তব্য স্বত্বেও সমান প্রতিনিধিত্ব থেকে নারীরা এখনো অনেক দূরে। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ৪৯ জন সভাপতির মধ্যে নারীরা মাত্র দুজন। ১৯৫৩ সনে অষ্টম সেশনে ভারতের বিজয়ণ লক্ষী পন্ডিত এবং ১৯৬৯ সনে চব্বিশতম সেশনে লাইবেরিয়ার এনজি ব্রুকস। জাতিসংঘ কর্মীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২০% এর কম নারী সিনিয়র লেভেলে আছেন। বাকীরা সবাই এন্ট্রী লেভেল ও মিড লেভেলে। ১৯৭২ সনে প্রথম এক জন নারী সহকারী মহাসচিব পদে নির্বাচিত হন। এই পর্যায়ে নারীদের নিয়োগ দুই থেকে তিন এ সীমাবদ্ধ থেকে ১৪৯৯৩/৯৪ সনে তা পৌছেঁছে বারো জনে। বিভিন্ন মিশনগুলোতে দেখা যায় মিলিটারী শান্তি কমিশনে নারীদের হার খুব কম। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পলিসি এজন্য দায়ী। বে-সামরিক শান্তি মিশনে নারীদের হার কিছুটা বেশী।[৩৪] এই হচ্ছে

জাতিসংঘের মোটামুটি চিত্র। অর্থাৎ জাতিসংঘ নারীর উন্নয়নে উদ্যোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও নিজস্ব কাঠামোতে নারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি। যেহেতু জাতিসংঘ একটি সম্মিলিত সংস্থা, তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া পূর্ণ সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রগুলোর নীতি নির্ধারণী ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সে দিক থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেলেই জাতিসংঘের পক্ষে প্রকৃত সংঘের ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

অধ্যায়ের উপসংহারে এসে বলা যায়, বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন পরিক্রমায় নারীর অবস্থানের বাস্তব চিত্র তুলে ধরাই ছিলো এই অধ্যায়ের আলোচনার উদ্দেশ্য। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যদিও নারীরা উন্নয়ন পরিক্রমায় আছে, কিন্তু তার কোন নির্দিষ্ট মাত্রা বা সঠিক পরিমাপযোগ্য মানদন্ড নেই। দুটো সীমাবদ্ধতার বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। *প্রথমত:* নারীর বিপুল উৎপাদনশীল শ্রম কর্মের স্বীকৃতি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। *দ্বিতীয়ত:* আধুনিকতা ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে নারী পুরুষের সাথে সমানভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে সনাতন কাজে আটকে আছে। পাশাপাশি যা লক্ষ্যণীয় বলে বিবেচিত হয়েছে তা হলো, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নারীরা বিভিন্ন মাত্রায় ও বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব শ্রমশক্তিতে এগিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ শক্তি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে নারীদের অর্ন্তভূক্তির ব্যাপারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সুযোগ ও অধিকার প্রদানের ভিন্নতাও লক্ষ্যণীয়। আর্ন্তজাতিকভাবে জাতিসংঘের ভূমিকা ও উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কিন্তু জাতিসংঘ গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের সফলতা নির্ভর করে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সদিচ্ছা ও রাষ্ট্রসমূহের নিজস্ব নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার ভিত্তিতে। এই পর্যায়ে এসে অনেক প্রচেষ্টা তাই সীমিত হয়ে পড়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রক্ষণশীল নীতির কারণে। এই অধ্যায়ে জাতিসংঘের বর্তমান চিত্র তুলে ধরে বাস্তব অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়নের পূর্ণাঙ্গতা আনয়নের ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ে অগ্রসরতা অর্জন করা একান্ত জরুরি।

পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা তাই সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। এই পর্যায়ে নারীদের সীমিত অবস্থানই নারীদের জন্য উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা বলে অনুমিত হয়।

তথ্য নির্দেশিকা

১.উন্নয়ন পদক্ষেপ, ষ্টেপ টুওয়ার্ডস, ঢাকা, ১৯৯৬

২.Easter Boserup, *Woman's Role in Economic Development,* George Allen & Unwin LTD, London, 1970.

৩.Rounaq Jahan & Hanna Papanek eds., *Women and Development-Perspective from South and SouthEast Asia,* Bangladesh institute of Law & international affairs, Dhaka.

৪.Ibid.

৫.Rehman Sobhan, *Planning and Public Action for Asian Women,* University press Ltd., 1992.

৬.*The World's Women 1995-Trends and Statistics,* A world Report. United Nations Publications, Newyork, 1995.

৭.Easter Boserup, op.cit

৮.*The World's Women 1995-Trends and Statistics*, op.cit.

৯.Ibid.

১০.Ibid, P. 114

১১.Ibid.

১২.Ibid.

১৩."Women and Economic decision making", *Women: looking beyond 2000,* United Nations Publications,

১৪.Ibid. p.42

১৫.Easter Boserup, op.cit.

১৬.*The World's Women 1995-Trends and Statistics*, op.cit.

১৭.Chapter: Girls and Women, *UNICEF annual Report,* 1996.

১৮.Ibid.

১৯.Ibid.

২০.*Women: looking beyond 2000,* United Nations Publications.

২১.*The World's Women 1995-Trends and Statistics*, op.cit, P.153.

২২. Website

২৩.Hilkka Pietila and Jeanne Vickers, *Making Women Matter: The role of the UN,* United Nations Publications.

২৪.Ibid.

২৫.আয়েশা খানম, *বেইজিং কর্ম পরিকল্পনা- অনুদিত*

২৬.Ibid.

২৭.Ibid.

২৮.Ibid.

২৯.Ibid.

৩০.Jeanne Vickers, Program for women and Girls; *Women and the world Economic Crysis,* Zed books Ltd., London and NewJersy.

৩১.Ibid.

৩২.*The World's Women 1995-Trends and Statistics*, op.cit.

৩৩.Ibid.

৩৪. Ibid.

চতুর্থ অধ্যায়

উন্নয়নে নারী: বাংলাদেশ অভিজ্ঞতা

৪.১ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে 'উন্নয়নে নারী' শীর্ষক ধারনা

৪.২ নারীর অধ:স্তন আর্থ-সামাজিক অবস্থান

৪.৩ রাষ্ট্রের অবস্থান ও নারী: উন্নয়ন ধারনা

৪.৩.১ সংবিধানে নারী

৪.৩.২ রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের দ্বৈততা এবং পুরুষ প্রাধান্য

৪.৩.৩ আইন ও বিচার ব্যবস্থা - সামাজিক প্রথা এবং উন্নয়নে নারী

৪.৪ নারী ও উন্নয়ন: সরকারী পদক্ষেপ

৪.৪.১ সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী

৪.৪.২ সরকারী সংস্থাসমূহে নারীর অংশগ্রহণ

৪.৪.৩ শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী নীতির বাস্তবতা

৪.৪.৪ আন্তর্জাতিক উদ্যোগের ব্যাপারে সররকারের ভূমিকা

৪.৫ শ্রমশক্তিতে নারী: উন্নয়ন সম্পৃক্ততা ও প্রতিবন্ধকতা

৪.৬ উন্নয়নে নারীর অবস্থান: বে-সরকারী উদ্যোগ

বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে ম্যাক্রো লেভেলে উন্নয়নে নারীর অবস্থানগত মর্যদা বিশ্লেষণের পর মাইক্রো লেভেলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিক্রমায় নারীর ভূমিকা আলোচনা করা প্রয়োজন। বিশ্ব পর্যায়ে যেমন, তেমনি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও উন্নয়ন ধারায় নারীর অবস্থান পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ এবং নিম্নমুখী। উন্নয়নে অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা, উন্নয়ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমের অ-স্বীকৃতি ও অব-মূল্যায়ন, এবং উন্নয়নের ফলে প্রাপ্ত অর্জন থেকে নারীকে বিচ্যুতকরণ সকল দিক থেকেই বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করে। ইতোপূর্বে বিশ্ব পর্যায়ে আলোচনায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর যে বঞ্চিত ও অনগ্রসর অবস্থানের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা বাংলাদেশের নারীদের ক্ষেত্রেও কম-বেশী পরিবর্তন সাপেক্ষে একইভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উন্নয়নকে একটি প্যারাডাইমের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে:

ক.দারিদ্র বিমোচন

খ.স্ব-নির্ভরতা

গ.গণতন্ত্রায়ন

ঘ. নারীর ক্ষমতায়ন

বিদ্যমান সম্ভাবনা ও সম্পদের সচেতন, সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ দ্বারা উন্নয়নের এই নির্ণীত মাত্রা অর্জন সম্ভব।[১] বাংলাদেশ এই ঈপ্সিত মাত্রার কোথায় আছে তা জানার জন্য বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনার মাধ্যমেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর সীমাবদ্ধ অবস্থান। এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় সন্ধানের মাধ্যমে ইতিবাচক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনই এই গবেষণার লক্ষ্য।

৪.১ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ‘‘উন্নয়নে নারী’’ শীর্ষক ধারনা

উন্নয়ন পরিকল্পনার চিন্তনে “উন্নয়নে নারী” শীর্ষক ধারনাটি একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। বস্তুতপক্ষে, ৭০’র দশক থেকে সার্বিক আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলা জনগোষ্ঠীকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য স্বীকৃতির ফলস্বরূপ ‘‘উন্নয়নে নারী’’ শীর্ষক ধারনাটির প্রসার লাভ ঘটে। এ ধারনার প্রসারের প্রয়োজনীয়তার পেছনে দুটি পরিপূরকমূলক যৌক্তিকতা রয়েছে। যথা- প্রথমত: একটি জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশকে অবহেলায়, অবজ্ঞায় ও অস্বীকৃতির মাঝে ফেলে রাখা অনভিপ্রেত ও অমানবিক

এবং দ্বিতীয়ত: দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বিবেচিত কলাকৌশলের ভিত জোরদারকরণ সম্ভব।[২]

বাংলাদেশে বিরাজমান একটি অনগ্রসর আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে বিশেষত: যেখানে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী তথা মহিলা জনগোষ্ঠী চরমভাবে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে তাদের উন্নয়নের পথে সমস্যাসমূহকে চিহ্নিতকরণ এবং পাশাপাশি তাদের উন্নয়ন বৈভবকে রেখে মহিলা জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূলধারায় আনয়নের উদ্দেশ্যে স্থান ও সময়োপযোগী কলাকৌশল নির্মাণ ও নির্ধারণ বিশেষ প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে “উন্নয়নে নারী” শীর্ষক ধারনার দুটি বিষয়কে আলাদাভাবে বিবেচনাধীন রাখা প্রয়োজন। একটি হচ্ছে, অর্থনেতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ সহজতর করা; অন্যটি হচ্ছে দেশের আইনগত ও মূল্যবোধগত কাঠামোকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রচেষ্টার সহায়ক হিসেবে নির্মাণ করা। দ্বিতীয় দিকটি বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রণিধাণযোগ্য।[৩]

৪.২ নারীর অধস্তন আর্থ-সামাজিক অবস্থান

সামাজিকভাবে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান অধস্তন ও অসম। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিটি পর্যায়েই বাংলাদেশের নারীদের শ্রম, মেধা নিয়োজিত আছে, কিন্তু তার মূল্যায়ন নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর গাহর্স্থ শ্রমের যেমন মূল্য নেই তেমনি নেই আর্থিক কর্ম জীবনের পূর্ণ স্বীকৃতি। পুরুষের চেয়ে অধিক শ্রম বিনিয়োগ করেও নারী উন্নয়নের অংশীদার নয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিন্যাসে সমাজের মূল নিয়ন্ত্রণ পুরুষের হাতে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ভূমির মালিকদের হাতেই থাকে সমাজের ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়নের অধিকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার - মানবিক, নাগরিক ও জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন না কোনভাবে নারী বৈষম্যের শিকার।[৪] নারীরা উন্নয়নের পুরো সুফল ভোগ করতে পারে না, কারণ প্রায়শ:ই তারা পরিকল্পনা প্রনয়ণ, কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যায় বা তাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। সমাজ ও অর্থনীতিতে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রাপ্য স্বীকৃতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের অবদানের যথাযথ ব্যবহার এবং তাদেরকে উন্নয়নের সম্পূর্ণ সুফল পৌঁছে দেয়া সম্ভব। উন্নয়ন প্রেক্ষিতে সাধারণভাবে নেতৃত্ব এবং নির্দিষ্ট করে নারী নেতৃত্ব পরস্পর সম্পৃক্ত।[৫]

পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানাই তাদের ক্ষমতার উৎস, এবং তাদের সিদ্ধান্তই সমাজে অনুমোদিত। নারী সামগ্রিক উৎপাদনশীল কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেও তা থেকে কোন প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি নেই। অনেক ক্ষেত্রে অর্থ আয়কারী নয় বলে তাদের কাজের স্বীকৃতি নেই কর্ম হিসাবে। তাই তারা বাদ পড়ে যায় শ্রমিকের হিসাব থেকে। আবার যেসব নারী বাইরের কর্মজগতে প্রবেশ করেছে তারাও পুরুষের সমান মর্যদা পায়না। এই বাস্তবতা বাংলাদেশের নারীদের অধস্তন অবস্থার চিত্রই তুলে ধরে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর এই অধস্তন অবস্থানে নারীকে পুরুষের সম-সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। বরং এমনভাবে নারীর ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয় যাতে নারী হয়ে ওঠে নির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী এবং ত্যাগের প্রতিমূর্তি। নারীর গার্হস্থ্য কাজকে কর্মের স্বীকৃতি না দিয়ে বরং পারিবারিক সনাতন মূল্যবোধের চর্চা হিসেবে দেখা হয়। তাই নারীর অর্থনৈতিক ভিত্তি দূর্বল থাকায় দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতর হয় নারী। অধস্তন হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী হয় বৈষম্যের শিকার। শিক্ষায়, পুষ্টিতে, সম্পত্তিতে, আইন, সামাজিক ও সংস্কৃতগতভাবে দেশের মহিলা জনগোষ্ঠী পিছিয়ে আছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশের পরিবারে চিকিৎসা খরচ পুরুষের জন্য ২৪ টাকা, নারীর জন্য ১৮ টাকা। সরকারী হিসাব অনুযায়ী মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি ঘন্টায় ৩ জন। শিক্ষা খাতে নারীর জন্য ব্যয় করা হয় শতকরা মাত্র ৩১ ভাগ, পুরুষের জন্য বরাদ্দ ৬৯ ভাগ।[৬] এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য সংবিধানের ১৯ নং ধারা 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবেন'[৭] এর সুস্পষ্ট লংঘন।

নারী দেশের অর্ধেক জনগোষ্টী। সাংবিধানিকভাবে নারীর জন্য পুরুষের সমতা স্বীকৃত হওয়া স্বত্ত্বেও সামাজিকভাবে নারীরা বঞ্চনার শিকার। তারাই শুধু বাল্য বিবাহ, দ্রুত ও বারবার সন্তান ধারন, এবং উচ্চমাত্রার মাতৃ মৃত্যুর শিকার। তারা নিরক্ষরতা, ক্ষুধা ও অ-পুষ্টির দায় বহন করে। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পর্দা, বিবাহ ও ধর্মীয় বিভিন্ন নিয়মাচারেরের মাধ্যমে নারীদের অসম ও অনগ্রসর অবস্থানে রাখা হয়। নারীর প্রতি এই নেতিবাচক আচরণ ক্রমাগত নির্ভরশীলতা ও অবদমন করার চক্রে নারীদের আবদ্ধ করে রাখে। নারীর প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণের ফলশ্রুতিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী পিছিয়ে পড়ে সার্বিকভাবে। উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও কার্যক্রমের সম্পদের নিয়ন্ত্রণে নারী-পুরুষের অসম প্রবেশাধিকার রয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রায়শ:ই তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়। কারণ

শ্রমশক্তিতে নারীদের অবদানের প্রকল্পের ও গৃহে নিয়োজিত শ্রম অংশ এড়িয়ে যাওয়া হয়। সনাতন শ্রম বিভাজন অনুযায়ী নারীরা বেশীরভাগই অর্থনীতির অ-স্থিতিশীল ও স্বল্প মজুরীর খাতে নিয়োজিত হয়। পরিবারে অসম ক্ষমতার সর্ম্পক এবং নারীর গতিশীলতার উপর নিয়ন্ত্রণ উৎপাদন নির্ভর দারিদ্র দূরীকরণ নীতি ও কার্যক্রমের প্রভাবকে দূর্বল করে।[৮] অর্থাৎ সামাজিকভাবে নারীর অধস্তন অবস্থান প্রতিষ্ঠিত।

৪.৩ রাষ্ট্রের অবস্থান ও নারী: উন্নয়ন ধারনা

বাংলাদেশে উন্নয়নে নারীর অবস্থান কোথায় তা আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় জন্য বাংলাদেশের নারীদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবস্থান দ্বি-মুখী। প্রথমেই দেখা যেতে পারে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অবস্থান সংবিধান নারীকে কিভাবে দেখছে।

৪.৩.১ সংবিধানে নারী

সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান সম্মানজনক। সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় স্পষ্টভাবে নারীর সমানাধিকারের কথা উল্লেখ আছে। সংবিধানের ৭ নং ধারায় স্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ১০, ১৯, ২৭, ২৮ এবং ২৯ ধারা অনুযায়ী বিশেষভাবে উল্লেখপূর্বক নারী-পুরুষে কোন বৈষম্য করা হয়নি এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এই ধারাগুলোর মূল বক্তব্য লিঙ্গ বৈষম্যহীন ও সার্বিক অর্থে সমতাভিত্তিক রাষ্ট্রের কথাই তুলে ধরে।

৭ নং ধারা:

৭/ (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।[৯]

১০ নং ধারা: জাতীয় জীবনে নারীদের অংশগ্রহণ

জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।[১০]

১৯ নং ধারা: সুযোগের সমতা

সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।[১১]

২৭ নং ধারা: আইনের দৃষ্টিতে সমতা

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।[১২]

২৮ নং ধারা: ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

(১) কেবল ধর্ম গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।

(২) রাষ্ট্র ও গণ জীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে।

(৩) কেবল ধর্ম গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবেনা।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবেনা।[১৩]

২৯ নং ধারা: সরকারী নিয়োগ লাভের সুযোগের সমতা

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।

(২) কেবল ধর্ম গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবেনা।

(৩)এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই -

(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হতে ,

(খ) কেন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়গত ব্যাক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হতে,

(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।[১৪]

উপরোক্ত ধারাসমূহ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় সংবিধানে নারীকে সমান অধিকার এবং উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে সম্পূর্ণভাবে।

সুতরাং বলা যায় সংবিধান নারীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছে।

৪.৩.২ রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের দ্বৈততা এবং পুরুষ প্রাধান্য

বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রাষ্ট্র একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। যদিও বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে এক দূর্বল প্রকৃতির রাষ্ট্র (soft state) বলা যায়, যেখানে বহুবিধ, ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী স্বার্থ বিদ্যমান। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই ধরনের বিভিন্নতা ফুটে ওঠে নারী সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে।[১৫] রাষ্ট্রের মতাদর্শ এখানে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। “বাংলাদেশে রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত রাষ্ট্রের জবরদস্তি এবং সিভিল সমাজের স্বাধীনতার মধ্যে। রাষ্ট্র সিভিল সমাজের পরিসর অনবরত গ্রাস করেছে। এই অস্বীকৃতি এবং গ্রাসের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বোধ হ্রস্ব হয়েছে। সমাজের মধ্যে ক্রিয়াশীল ভিন্নতা এবং বিভিন্নতা স্বীকৃতি লাভ করেনি যা কিনা সিভিল সমাজের ভিত্তি, বহুত্ববাদের কেন্দ্র এবং মূল।”[১৬] রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মূল ক্ষমতার চর্চা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের চরিত্রের কারণে ক্ষমতার বিন্যাস হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে এবং তার প্রভাব পড়েছে নারীদের জীবনে। রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ নারীর ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রেক্ষাপট তৈরী করে তা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের মাত্রাকে প্রভাবিত করে। ‘সংকটময় মুর্হূতে’ নারীরাই সর্বপ্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হয় - এই বাক্যটিকে পূর্ণবার সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে যুদ্ধকালীন বাংলায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের মতার্দশ। একাত্তরে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্রীয় মতাদর্শে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয়। স্বাধীনতার পর শুরুতেই রাষ্ট্রীয় মতাদর্শে নারীকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বলে স্বীকৃতি দেয়া হয় সংবিধানে সম-মর্যদা প্রদানের মাধ্যমে।

সরকারের সেক্যুলার রাজনীতি এবং সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ নারী মুক্তির সহায়ক মতাদর্শ ছিল। এই সরকারের মতাদর্শে ধর্ষিতা নারীদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার একটি মতাদর্শ ছিল 'বীরাঙ্গনা' খেতাব দান। যা নারীকে দেখার মানসিকতার প্রগতিশীল মনোভঙ্গী আনয়ন করে। স্বাধীনতার পর ৭২ থেকে ৭৫ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের কাঠামো দাঁড় করাতেই তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের মনযোগ কেন্দ্রীভূত ছিলো। ফলে, তখন পৃথকভাবে নারীদের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া সম্ভব হয়নি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত একটি দেশের বাস্তব অবস্থার আলোকে। নারী তখন পৃথকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিলনা। তখন সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীলতা অর্জন ছিল জরুরী।[১৭]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারী-পুরুষ সকলের অংশগ্রহণ ছিল স্বতর্স্ফূত। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রের স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছিল মূলত: ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে। কিন্তু লিঙ্গ সমতার আর্দশ স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট ছিলো না। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুথানের মাধ্যমে ক্ষমতার পালা বদল সূচিত হবার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ পরিবর্তিত হয়েছে বারবার। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এখানে নিয়মতান্ত্রিক পথে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা কার্যকর ছিলোনা দীর্ঘ সময়। সামরিক এবং বে-সামরিক শাসনের আড়ালে স্বৈরতন্ত্র মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করেছে, যার ফলে অধিকতর শোষণের শিকার হয়েছে নারী। তারা ব্যবহৃত হয়েছে মাধ্যম হিসেবে। ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রে মতাদর্শিক পরিবর্তন ঘটেছে বারবার।

স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় মতাদশের্র বারবার পরিবর্তন ঘটেছে সংবিধানের সংশোধনীর মাধ্যমে, যার ফলে মূল আর্দশ ব্যহত হয়েছে। ৭৫'এর চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রথম ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ সূচিত হয়; গণতন্ত্রের সংকট সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হতে একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উত্তরণ রাষ্ট্রীয় চরিত্রকে বদলে দিয়েছিল। সিভিল সমাজের অংশগ্রহণের পরিসরকে সংকুচিত করেছিল। ১৯৭৯ সালে সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রারম্ভে, প্রস্তাবনার উপরে সন্নিবেশিত হয় ''বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'' (দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে) বাক্যটি। যার ফলে দেশে মুসলমান ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী বাদে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ধর্মকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অস্বীকৃতি জানানো হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট পরবর্তী অগণতান্ত্রিক সরকারের অসাংবিধানিক কর্মকান্ডের স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে বৈধতা দান করা হয়, যা রাষ্ট্রের

একনায়কতান্ত্রিক চরিত্রকে দৃঢ় করে। জারি করা হয় ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ, যা সংবিধানের জারীকৃত মৌলিক মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের পরিপন্থী। একই প্রক্রিয়ায় ১৯৮৬ সালে সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ পরবর্তী এরশাদ সরকারের দ্বারা ঘোষিত সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে প্রণীত সকল ফরমান, আদেশ, নির্দেশ, অধ্যাদেশ ও অন্যান্য আইন অনুমোদন করা হয়। ১৯৮৮ সালে গৃহীত হয় সংবিধানে অষ্টম সংশোধনী। এ সংশোধনীর একটি মূল দিক ছিল ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দান। ইসলাম ধর্ম এখানে সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্টীর মধ্যে সামাজিকভাবেই স্বীকৃত। সেখানে সাংবিধানিক ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম করার কোন যৌক্তিকতা নেই। এভাবে একের পর এক সংশোধনীর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্র ক্ষমতার আধাঁর। জণগণের সেখানে কোন অংশগ্রহণ নেই। রাষ্ট্রের কর্মকান্ডে জণগণের মতের প্রতিফলন নেই।[১৮]

এই কর্তৃত্ববাদী চরিত্রের রাষ্ট্র নারীকে কিভাবে দেখে তা জানা প্রয়োজন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, রাষ্ট্র নারীকে দেখেছে অধস্তন হিসেবে। নারীকে ব্যবহার করেছে তার ক্ষমতা সংহত করার উপায় হিসেবে। সিভিল সমাজের একটি শক্তি হিসেবে নারীকে দেখা হয়নি। এর প্রকাশ আমরা দেখি সংসদে নারী প্রতিনিধির জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে। যেখানে নারী সংখ্যাগরিষ্ট দলের সদস্যদের দ্বারা মনোনীত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীনভাবে নির্বাচিত। তারা কাজ করেন ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতা সংহতকরণের প্রতিভূ রূপে, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচিত না হওয়ার কারণে তাদের কোন জোরালো ভূমিকা রাখার অবকাশ নেই। আরও দেখা যায়, জিয়াউর রহমানের সময়ে সমর্থক গোষ্টী তথা নির্বাচকমন্ডলী তৈরীর মাধ্যমে নারীকে দেখা হয় উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে, নারীকে দেখা হয় পুনরুৎপাদনমুলক যন্ত্র হিসেবে। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে নারীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করা হয়। নারী সমাজ পরিণত হয় জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর একমাত্র গ্রহীতা হিসেবে।[১৯] বৈদেশিক আয়ের মূলধণ হিসেবেও নারীকে দেখা হয়েছে। মনে করা হযেছে নারী অব্যবহৃত মুলধণ। সুতরাং ৭৫ সালের বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ঢেউ এসে লাগে বাংলাদেশে এবং রাষ্ট্রের নীতি সেক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন। এই উন্নয়নকে যুক্ত করা হয় উইমেন এন্ড ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে।[২০] রাষ্ট্রীয় নীতি যখন 'মুক্তবাজার অর্থনীতি', তখনই প্রয়োজন নারী শ্রমশক্তির ব্যবহার। আশির দশকে বাংলাদেশে গার্মেন্টেসে শ্রমিক হিসেবে বিপুল সংখ্যক নারী শ্রমিকের যোগদান এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। দেশে সরকারী উদ্যোগ এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সরকারী কর্মকান্ডের বেসরকারীকরণ বা ব্যক্তি মালিকানাখাতে হস্তান্তরকে

মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রক্রিয়ার অংশ বলে মনে করা হয়। যদিও তৃতীয় বিশ্বে সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা আজ এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, বাজার অর্থনীতি অনিবার্যভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নবযুগের সূচনা ঘটায় না।[21] কিন্তু বাংলাদেশ এখনও মুক্তবাজার অর্থনীতির উপর জোর দিচ্ছে। যেহেতু রাষ্ট্রের সঙ্গে সিভিল সমাজের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক নেই, সমঝোতা নেই রাষ্ট্র-বিশ্বব্যাংকের, আই.এম.এফ এর মুখাপেক্ষী হয়ে আছে এবং তাদের মতানুযায়ী রাষ্ট্র তার সিদ্ধান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। সস্তা শ্রমশক্তি হিসেবে নারীকে ব্যবহার করা হচ্ছে পোষাক শিল্পে অধিক মুনাফার আশায় কিন্তু সেখানে শ্রম আইন মানা হচ্ছে না। নারী শ্রমিকদের নুন্যতম সুযোগ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হচ্ছেনা।[22]

আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে নারী উন্নয়ন ধারনার বিকাশ ও জাতীয় পর্যায়ে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাবে যে দ্বৈততা সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করা যায় এভাবে, সত্তর এর দশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারী মুক্তির বিষয়টি এদেশেও সাড়া জাগায়। নারী উন্নয়নে বিপুল অর্থ আসতে থাকে। তখন সরকার নারীদের বিষয়ে মনযোগী হয় বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাবে নারীরা আনুষ্ঠানিক শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। কিন্তু তাদের এই অর্ন্তভূক্তির মধ্যে রয়ে যায় এক ধরনের শোষণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গার্মেন্টস শিল্পে নারীরাই মূল শ্রমশক্তি। কিন্তু এক্ষেত্রেও মজুরী বৈষম্য মারাত্মকভাবে বিরাজমান। তবু নারীরা সনাতন গার্হস্থ্য কাজের বাইরে অর্থ আয়ের লক্ষ্যে বাইরের পেশায় আগ্রহী হয় যা তাদের কর্ম জীবনের স্বীকৃতি দেয়। ইতিবাচক দিক হলো এতে নারীরা পাবলিক স্পেসে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। সীমাবদ্ধতা হলো মূল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থেকে গেছে পুরুষের হাতে। দেখা গেছে গার্মেন্টস শিল্পে যেমন নারীরা অধিকাংশই নিম্ন পর্যায়ের শ্রমিক তেমনি বিভিন্ন প্রকল্পভিত্তিক সাহায্যে যেমন, পরিবার পরিকল্পনা খাত যে ক্ষেত্রে প্রচুর সাহায্য এসেছে তাতে নারীকে এককভাবে ভোক্তা হিসাবে ব্যবহার করে নারীর শরীরের উপর তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বদলে পুরুষের ইচ্ছার হাতিয়ারে পরিণত করেছে। ফলে নারী পুরুষ নির্ভরশীলতার বাইরে আসতে পারেনি। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব নারীকে উন্নয়নে প্রবেশের সুযোগ দিলেও তাকে নিম্ন পর্যায়ে আটকে রেখেছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ নারীকে কোন স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিতে পারেনি।[23]

রাষ্ট্রের মতাদর্শ আর্ন্তজাতিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র একদিকে সাহায্যদাতা বিভিন্ন দেশ বা সংস্থার মতাদর্শ অনুসারে নারীকে উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করে, যা নারীর অংশগ্রহণের পরিসরকে বিস্তৃত করে। অন্যদিকে নারীর

জন্য বলবৎ রেখেছে পারিবারিক আইন। যেখানে নারীর অধিকার, স্বাধীনতা খন্ডিত, সীমিত। ধর্মীয় গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত ব্যক্তিক আইনের কোন সংশোধন করা হয়নি, ফলে আইনটি নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে অসম রয়ে গেছে। ব্যক্তিক আইনের আওতায় রয়েছে মোটামুটিভাবে বিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদ, তালাক, বহুবিবাহ, সন্তানের অবিভাবকত্ব ইত্যাদি, যা নারীর সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো রাষ্ট্রের নীতিগত আদর্শ নারীর সামাজিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র একইসঙ্গে পশ্চিমা ধণতান্ত্রিক দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী দেশগুলোর মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং সর্ম্পক স্থাপন করেছে। একই সঙ্গে নারীর বাইরের কাজের সুযোগ এবং পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সরকারী পর্যায়ে দ্বৈততা তৈরী করে। এই দ্বৈততার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নারীদের জীবনে। রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের বিপরীত সর্ম্পক এই দ্বৈততা কাটিয়ে উঠতে সমস্যা তৈরী করে।[২৪]

সমাজে নারী মুক্তি তখনই সম্ভব যখন সিভিল সমাজের স্বাধীনতা ব্যাপকতা পায়, শক্তিশালী হয় এবং পরিসর ব্যাপ্তি লাভ করে। নারী সংগঠনগুলো সিভিল সমাজের প্রতিভূ। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী চরিত্রকে নারী সমাজ যদি অনবরত বিরোধীতা করে তাহলেই নারীর পরিসর বৃদ্ধি পাবে, অংশগ্রহণ বাড়বে। এই মুর্হূতের বাংলাদেশে চলছে এর সঙ্কট। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শে নারী বিষয় প্রাধান্যপূর্ণ নয়। অথচ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী চরিত্রটি রয়েই গেছে গণতান্ত্রিকতার আবহে।[২৫] সুতরাং নারী শোষিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শিক জটিলতার আর্বতে।

বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের একটি সংকটকাল অতিক্রান্ত হচ্ছে। মৌলবাদী শক্তির উত্থানও নারীর উন্নয়ন কর্মকান্ড বিরোধী। মৌলবাদের উত্থান ও তাকে প্রশ্রয় ও সহায়তা দানের ফলে আজ দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় অর্জিত গণতান্ত্রিক সূচনা আবারো সংকটের আবর্তে আবদ্ধ হতে চলেছে। এবং এর সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে নারী।

৪.৩.৩ আইন ও বিচার ব্যবস্থা - সামাজিক প্রথা এবং উন্নয়নে নারী

উন্নয়নে নারীর পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণের সুযোগ বিঘ্নিত হয় রাষ্ট্র প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের কারণে। আইনে রয়েছে বৈষম্য। নাগরিকত্ব আইন, উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি পারিবারিক আইন নারীর অধিকার বিরোধী। Safe Custody নারীর নিরাপত্তার বদলে তাকে নির্যাতিত করছে। আর্থ সামাজিক অবস্থার মধ্যেই

নিহিত আছে সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ। বাংলাদেশের নারীদের ক্ষেত্রে এর অধিকাংশই বিপক্ষে গেছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে একই সঙ্গে সিভিল ল' এবং পার্সোনাল ল' এর ব্যবহার নারীর অধিকারকে সংকুচিত করেছে। পারিবারিক আইন নারীর সমান সুযোগের বিরোধী। উন্নয়ন যেহেতু একটি সামগ্রিক প্রত্যয়, তাই আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির আনুকূল্য ছাড়া, সমতা বিধান ছাড়া উন্নয়ন বাস্তবায়িত হতে পারেনা। শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার জন্য নারী পিছিয়ে পড়ে প্রতিযোগিতায়। তাই অনেক ক্ষেত্রে সম অংশগ্রহণের সুযোগ ব্যবহার থেকে নারী বঞ্চিত হয়। আবার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত সুযোগের জন্য উপার্জন কম থাকার সিদ্ধান্ত প্রণয়নে ভূমিকা থাকেনা। অর্থাৎ আর্থ সামাজিক অবস্থার কারণে একদিকে যেমন নারী উন্নয়নে সম অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তেমনি উন্নয়নের ফলে পুরুষ কেন্দ্রীক অবস্থার কারণে নারীর জীবনে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জিত হয়না।

মূলত: রাজনীতি, অর্থনীতি সবক্ষেত্রে নারী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব খুবই কম। প্রতিটি পর্যায়ে পুরুষ নিয়ন্ত্রণ থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অবস্থান নুন্যতম। উন্নয়নের অন্যতম বাহক ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া অবস্থান ক্ষমতায়নের সম্ভাবনাকে সীমিত করে। তাই মূল উন্নয়ন ধারায় নারীর অবস্থান প্রান্তিক, কেন্দ্রীয় নয়। এতে নারীর জন্য উন্নয়ন যেমন সুফল বয়ে আনেনা, তেমনি উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্তকরণ পূর্ণতা পায়না। সীমাবদ্ধতা ও অস্পষ্টতা কোন লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য আনতে পারেনা। তাই রাষ্ট্রের ইতিবাচক ও সক্রিয় অবস্থান জরুরি। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন।

সময়ের পরিবর্তনে চিন্তাধারায় পরিবর্তন হচ্ছে। রাজনীতির নারী শূণ্য অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। অর্থনীতিতে নারীর পদচারণা দেখা যাচ্ছে। আইন সংস্কার হচ্ছে, সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রের এই গতিশীলতাই নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে পারে সম্পূর্ণভাবে। রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ পুরুষ কেন্দ্রীকতা ছেড়ে নারীর প্রতিও কিছুটা দৃষ্টিপাত করছে এটাই আশার কথা। প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীর সম্পৃক্তি ঘটছে, সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মায়ের স্বীকৃতি এসেছে। সরকারী, বে-সরকারী পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগ ও আর্ন্তজাতিক অবস্থান বাংলাদেশের নারীদের জন্য পথ কিছুটা উন্মুক্ত করেছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সামান্য।

৪.৪ নারী ও উন্নয়ন: সরকারী পদক্ষেপ

সরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ ছাড়া কোন উন্নয়ন কার্যক্রমই যথাযথভাবে অগ্রসর হতে পারেনা। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এবং আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে উন্নয়ন ধারনা সর্ম্পূণ করার ক্ষেত্রে নারীর সম অংশগ্রহণ ও সুযোগের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে সার্বিকভাবে। এখন প্রয়োজন মতের প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের সংবিধানে নারী পুরুষ সমতার কথা থাকলেও আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতার কারণে নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে। তাই সমতা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন নারীর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং উন্নয়নে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করা। বাংলাদেশের সংবিধান নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া স্বত্ত্বেও সনাতন আচরণের কারণে এবং সুযোগের অভাবে নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। তাই বাংলাদেশ সরকারের একটি ঘোষিত নীতি হল নারীকে পুরুষের পাশাপাশি আনবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪.৪.১ সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরী ও বাস্তবায়নের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার পর্যায়ভিত্তিক কার্যক্রমের ছক বলা যেতে পারে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার তার মতাদর্শ অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত সর্বমোট পাচঁটি পাচঁশালা পরিকল্পনা এবং একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছাড়া কোন দলিলই একটি জাতীয় আশা-আকাঙ্খাকে কেন্দ্র করে প্রণীত হয়নি। বলাবাহুল্য সেই পরিকল্পনাও পরবর্তীকালে একটি কাগুজে দলিলে পরিণত হয। পরবর্তীকালে সবগুলো পরিকল্পনা দলিলই বস্তুত বিদেশী সাহায্যনির্ভর প্রকল্পের সমষ্টি হয়ে দাড়িঁয়েছে। এবং দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে সবগুলো পরিকল্পনার প্রধাণ কাজ হয়ে দাড়িয়েছে আগের পরিকল্পনার অসমাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত করা। ফলে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক অগ্রগতি সাধিত হতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই বৃহত্তর উন্নয়নের অংশ হিসেবে নারীদের অবস্থানও পশ্চাৎপদই থেকে গেছে। তবে আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে নারী ইস্যু একসময় প্রাধান্য বিস্তার করলে বিদেশী সাহায্য সংস্থার ইচ্ছানুযায়ীই নারীরা ব্যবহৃত হয়েছে পরিকল্পনাগুলোতে। বাস্তবতার আলোকেই সরকারী পর্যায়ে নারী উন্নয়ন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী

কিছুটা প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু তা মোটেও যথেষ্ট নয়। সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনার দিকে তাকালে দেখা যায়:

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) গ্রহণের সময় দেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থার আলোকে শুধুমাত্র নারীর পুর্নবাসন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নারী শিক্ষা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা সেখানে উল্লেখিত। নারী উন্নয়ন, নারীর প্রতি বৈষম্য অপনোদনের বিষয়টি আলোচনাতেই আসেনি।[২৬]

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০) গৃহীত হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তীকালীন পুর্ব প্রস্তুতি হিসেবে যেখানে প্রথম উন্নয়ন ইস্যু হিসেবে নারী উন্নয়নকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। এ সময় উইম্যান এফেয়ারস ডিভিশন এবং বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় সংস্থা স্থাপন করা হয় নারী সর্ম্পকিত বিষয়াদি পরিচালনার জন্য। চাকুরী ক্ষেত্রে ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ এবং আয় উৎপাদনমুলক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণকে এই পরিকল্পনাতে গুরুত্ব দান করা হয়। চাকুরী ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে নারীর জন্য ১৫% কোটা সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়।[২৭]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) নারী উন্নয়নের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে এবং তা মূলত: কিছু দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধক প্রকল্প ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই লক্ষ্যে পচিঁশটি প্রকল্প বাস্তবায়নে ৯০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয় যা মোট বরাদ্দের ০.৫৬ ভাগ। এ সময়কালে আলাদাভাবে সচিবালয়ে নারী বিষয়ক বিভাগ খোলা হয় এবং পাবলিক সার্ভিসের নিম্ন পর্যায়ের চাকুরীতে নারীর জন্য ১০% কোটা নির্ধারণ করা হয়।[২৮]

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) মাতৃ মঙ্গল, পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র ঋণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া হয়। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো স্বতন্ত্র নারী বিষয়ক মন্ত্রনালয় গঠন, মা ও শিশু বিষয়ক কাউন্সিল গঠন। এ সময় চাকুরীতে নারীদের কোটা ১৫% করা হয়। নারী উন্নয়নে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৫০০ মিলিয়ন টাকা, যা মোট বরাদ্দের ০.১৩ ভাগ। এছাড়া অন্যান্য মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে নারীদের অর্ন্তভূক্ত করা হয়।[২৯]

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) সর্বপ্রথম উন্নয়নের মূলধারায় নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনার এই খন্ডে এসে প্রথমবারের

মত নারীকে উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে পৃথক অধ্যায় রচনা করা হয়। এতে দারিদ্র্য দুরীকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এবং উন্নয়নের বিষয় আলাদা রিপোর্ট হিসাবে বিবেচিত হয়।[৩০]

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০০) দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ, মহিলা মন্ত্রণালয়ের পলিসি ও এডভোকেসী ইউনিট, ঋণদান কার্যক্রম, ভি.জি.ডি প্রোগ্রাম, কর্মজীবী মহিলাদের বাসস্থান, মা ও বাচ্চাদের ডে-কেয়ার সার্ভিস, সহিংসতা কমানোর পদক্ষেপ, প্রশিক্ষণ তথ্য কেন্দ্র, লিঙ্গ সংক্রান্ত ডাটাবেসের উন্নয়ন, বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়, বিশেষভাবে নারীর স্বার্থে গৃহীত হয় কিছু কার্যক্রম। পরিকল্পনায় সিডো বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ, লিঙ্গ সমতা, আইনগত অধিকার, উন্নয়ন কাজে সম-সুযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা বৃদ্ধি, নারীর মানবাধিকার রক্ষা এবং এই ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে মনযোগ দেয়া হয়েছে।এছাড়া WID এর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নতকরণের কথা বলা হয়েছে। নারী ও শিশু বিষয়ক খাতে ২৭৮০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৩৭০ মিলিয়ন টাকা ব্যায় হবে নারী ও শিশু বিষয়ক ১৮টি স্পিলওভার প্রজেক্টে। এই লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।[৩১]

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সরকারী পর্যায়ে নারী ইস্যু ক্রমেই গুরুত্ব অর্জন করছে। তবে এই হার সন্তোষজনক নয়। লক্ষ্যণীয় যে, পরিকল্পনায় যে ব্যাপক পদক্ষেপের কথা বলা হয়, মেয়াদ শেষে দেখা যায় তার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ অগ্রসরতা আসেনি পর্যাপ্তভাবে।

৪.৪.২ সরকারী সংস্থাসমূহে নারীর অংশগ্রহণ

সরকারের পক্ষ থেকে নারীর সম-অংশগ্রহণের কথা বলা হলেও দেখা যায় সরকারী সংস্থাসমূহে নারীর অংশগ্রহণ যথাযথ নয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ের মতে, সরকারী কর্মকর্তা পর্যায়ে যে সব নারী ইতোমধ্যেই প্রবেশ করেছেন তাদের বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগের প্রধান বা সচিব পর্যায়ে যেতে কম করে হলেও ২০ থেকে ২২ বছর সময় লাগবে। তাই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। সরকার নন গেজেটেড পদে নারীদের জন্য যে ১৫ শতাংশ পদ সংরক্ষিত রেখেছে দেখা যায় সে ক্ষেত্রেও যথাযথ নিয়োগের ব্যাবস্থা করা হয় না।

এবার দেখা যাক সরকারী পর্যায়ে নারীদের অবস্থান:

- সরকারী ও জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীর হার- ৬% এর কম।
- রাষ্ট্রায়ত্ব ও জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীদের অবস্থান- ৬%
- ২৯টি ক্যাডারে (১৯৯৪) নিয়োজিত পুরুষ কর্মকর্তা- ২৪৮৩৫ জন
- ২৯টি ক্যাডারে (১৯৯৪) নিয়োজিত নারী কর্মকর্তা- ৪২৬৭ জন[৩২]

উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য সরকারী পর্যায় থেকে উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী হলেও বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান উপরের চিত্র থেকেই বোঝা যায়।

সরকারী প্রশাসনের উচ্চস্তরে নারীদের অবস্থান:

- ৫১ জন সচিবের মধ্যে নারী: ২ জন
- ৮০ জন অতিরিক্ত সচিবের মধ্যে নারী: ২ জন
- ৭ জন উপ সচিব
- ২ জন রাষ্ট্রদূত
- হাইকোর্টের বিচারপতি: ১ জন

পরিকল্পনা কমিশন ও নিবার্চন কমিশনে উচ্চপদে কোন নারী নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন বা কোন স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রধান হিসেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কোন নারী নেই। সেনাবাহিনীর উচ্চপদে, পিএটিসি রেক্টর পদে কোন নারী নেই।[৩৩] সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর এই শূণ্যতা উন্নয়নের পথে বড় অন্তরায়। তবে পূর্বের তুলনায় কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে সচিব পর্যায়ে মহিলা সচিবের সংখ্যা ছিল ১ জন, এখন ২ জন। অতিরিক্ত সচিব আছেন ৩ জন, ১৯৯৬ সালে ছিলেন ২ জন। যুগ্মসচিবের পদে আসীন আছেন প্রায় ১৪/১৫ জন মহিলা, ১৯৯৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ২ জন। উপসচিব পদে এখন নিযুক্ত হয়েছেন ২০/২৫ জন মহিলা। দুবছর আগে ছিল ৭ জন। এ পর্যন্ত ক্যাডারে একজন মহিলা রাষ্ট্রদূত ভূটানে নিযুক্ত হন। জিয়াউর রহমানের আমলে অবশ্য রাজনৈতিকভাবে একজন মহিলাকে শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনার করা হয়েছিল।[৩৪] অর্থাৎ নারীরা ক্রমেই এগিযে আসছে, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

এবার দেখানো হচ্ছে সরকারী চাকরীর বিভিন্ন শ্রেণীতে নারী ও পুরুষের বৈষম্যমূলক অবস্থান।

সারণী: ৪.১ সরকারী চাকরীর বিভিন্ন শ্রেণীতে নারী ও পুরুষের অবস্থান।

চাকরীর ধরণ	১৯৮৮			১৯৯১			১৯৯৩		
	নারী	পুরুষ	নারীর %	নারী	পুরুষ	নারীর %	নারী	পুরুষ	নারীর %
প্রথম শ্রেণী	৫৭৪০	৬৭১৯৫	৮.৫৪	৪৯৯৮	৭০৮৮৯	৭.০৫	৫৬২৮	৭৫৩১৪	৭.৪৭
দ্বিতীয় শ্রেণী	২১৬৬	৩৪৩৩৫	৬.৩	২৪২৮	৩৩৮৪৫	৭.১৭	২৬৪৪	৩৫৪২২	৭.৪৬
তৃতীয় শ্রেণী	৪৮২০৯	৫৩৮২৪৬	৮.৯৫	৫৪৮০৫	৪৫৯৩৮৪	১১.৯০	৬২০৭৯	৫৩৬০৪০	১১.৫৮
চতুর্থ শ্রেণী	১০৯৯৯	২১২৪৭৬	৫.১৭	১২৪৯৯	৩০৮২৬৯	৪.০৫	১২৮২০	২৪২৮৯০	৫
সকল শ্রেণী	৬৭১১৪	৮৫২২৫২	৭.৮৭	৭৪৭৩০	৮৭২৩৮৭	৮.৫৬	৮৩১৭১	৮৮৯৬৬৬	৯

সূত্র: বি.বি.এস, ১৯৯৬ (১৯)

উপরের চিত্র থেকেই স্পষ্ট হয় যে, সরকারী চাকুরীতে নারীদের অবস্থান এখনো অনেক পেছনে। এবং অগ্রসরতার হার মোটেই সন্তোষজনক নয়। তাদের এই পশ্চাৎপদ অবস্থান সরকারী নীতি নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখে যা নারী উন্নয়ন তথা সার্বিক উন্নয়নের জন্য মোটেও আশাপ্রদ নয়।

এবার দেখানো হচ্ছে মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অবস্থানগত বৈষম্য।

সারণী: ৪.২ সচিবালয়ে, অধিদপ্তরে এবং স্বায়ত্বশাসিত কাঠামোতে সিভিল কর্মকর্তা- কর্মচারীর সংখ্যা এবং ধরন অনুযায়ী নারী চাকুরের সংখ্যা

চাকুরীর ধরন	মন্ত্রণালয়		সরকারী দপ্তর		স্বায়ত্বশাসিত কাঠামো		মোট	
	মোট কর্মচারী	নারীর সংখ্যা	মোট কর্মচারী	নারীর সংখ্যা	মোট কর্মচারী	নারীর সংখ্যা	মোট কর্মচারী	নারীর সংখ্যা
প্রথম শ্রেণী	২০০০	২০১	৩৫২৫৫	৩৪৪৬	৪৩৬৮৭	১৯৮১	৮০৯৪২	৫৬২৮
দ্বিতীয় শ্রেণী	৭০	১১	১৩৫১৫	১২৩৩	২৪৪৮১	১৪০০	৩৮০৬৬	২৬৪৪
তৃতীয় শ্রেণী	৪১৮৭	৩৫৮	৪৫৮৪৩৩	৫৪৮৯০	১৩৫৪৯৯	৬৮৩১	৫৯৮১১৯	৬২৭৯
চতুর্থ শ্রেণী	২৩৫৪	২০৯	১৪৯২০২	৯৩৩৩	১০৪১৫৪	৩২৭৬	২৫৫৭১০	১২৮২০
সর্বমোট	৮৬১১	৭৭৯	৬৫৬৪০৫	৬৮৯০২	৩০৭৮২১	১৩৪৮৮	৯৭২৮৩৭	২৭৩৭১

সূত্র: বি.বি.এস, ১৯৯৬ (২০)

এক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর এই অপ্রতুল প্রতিনিধিত্ব তাদের অসম অবস্থার চিত্রকেই তুলে ধরে।

400438

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

৪.৪.৩ শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী নীতির বাস্তবতা

শিক্ষা অগ্রগতির পূর্বশর্ত। সরকারী পর্যায়ে নারীর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হলেও তার বাস্তবায়নে অগ্রগতি নেই। তাই শিক্ষার হার নারীর ক্ষেত্রে ২৪.২%, পুরুষের ক্ষেত্রে ৪৫.৫%। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর হার ক্রমেই কমে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার ৭৩.৪, তারমধ্যে ঝরে পড়ার সংখ্যা ১৭.৬। উচ্চ মাধ্যমিকে নারী শিক্ষার্থীর হার ২৯.৪। স্নাতক পর্যায়ে ৯.০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে নারী শিক্ষার্থীর অবস্থান ৩৫.০। বিশ্ববিদ্যালসমূহে নারী শিক্ষার্থী মাত্র ২৩.৫, মেডিকেলে ২৯.০, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩.৭। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ৫.০, কৃষি ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক শিক্ষায় ১৪.০। ফলে উন্নয়নের ধারায় নারী পিছিয়ে থাকে ক্রমাগত। সরকারী নীতি অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে ৬০ শতাংশ নারী নিয়োগের বিধান থাকলেও বাস্তবে নারী শিক্ষকের হার মাত্র ৩০ শতাংশ। মাধ্যমিক স্তরে ১৫ ভাগ এবং কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে মাত্র ২ ভাগ।[৩৫] আবার দেখা যায় সরকারী অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সুবিধা পায় মাদ্রাসা শিক্ষা যা নারী সমানাধিকারের ঘোর বিরোধী। এভাবে দ্বৈত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা সরকারের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করে।[৩৬]

এভাবে দেখা যায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারের উদ্যোগ প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে দাড়াঁয়। দৃঢ় অঙ্গীকার ও আন্তরিকতার অভাবে সরকারী অনেক কার্যক্রমই শেষ পর্যন্ত নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক হয়ে দাড়াঁয়। এবং উন্নয়নের সুফল নারী ভোগ করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিনের পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোতে নারীর যথাযথ প্রতিনিধিত্বের অভাবই নারীদের অসম অবস্থানকে টিকিয়ে রাখে একইভাবে। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীদের এই পশ্চাৎপদ অবস্থান তাদের অনগ্রসরতার চিত্রকেই তুলে ধরে। নারীর যর্থাথ অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়নের পূর্ণাঙ্গ মাত্রা প্রতিষ্ঠাও ব্যর্থ হয় এই বৈষম্যের কারণে।

রাষ্ট্রীক অবস্থান ও সরকারের ভূমিকা সর্ম্পকে ব্যাপক আলোচনার পর এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে নারীরা রাষ্ট্রীয় মতার্দশের বিভিন্নতার ফলে সৃষ্ট জটিলতা এবং সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে লিঙ্গীয় বৈষম্যের শিকার। ফলে জাতীয় জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নারী পুরুষের সম মর্যদা থেকে বঞ্চিত হয়ে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে অবস্থান করছে। এবং রাষ্ট্র ও সরকারের তথা নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষের যথাযথ উদ্যোগের অভাবে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের প্রতিটি

ক্ষেত্রে নারী পশ্চাৎপদ অবস্থানের মুখোমুখি হয়েছে। এই অধ্যায়ের আলোচনার শুরুতেই নারীর পশ্চাৎপদ ও অধস্তন অবস্থানের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তার মূল নিহিত রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় পরিমন্ডলের অসম নীতি প্রণয়ন ও অণুসরণের মধ্যে। নীতি নির্ধারণে বৈষম্য উন্নয়নে নারীর প্রবেশগম্যতাকে বাধাগ্রস্থ করে, উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নয়নের ফলে অর্জিত প্রাপ্তি লাভে বঞ্চিত করে। যার ফলশ্রুতিতে জাতীয় শ্রমশক্তিতে নারীর বিপুল উৎপাদনশীল শ্রম অ-স্বীকৃত থেকে যায় এবং আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়ে।

৪.৪.৪ আর্ন্তজাতিক উদ্যোগের ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা

আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে নারীর সম মর্যদা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত উদ্যোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একাত্মতা ঘোষণা করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাতীয় পর্যায়ে এবং সার্বিকভাবে বৈশ্বিক পর্যায়ে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত দলিল (সিডো)। জাতিসংঘ প্রণীত সিডো দলিলে নারী মুক্তির যে ব্যাপক পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে বাংলাদেশ ১৯৮৪ সনের ৬ নভেম্বর তাতে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু ধর্মীয় আইনের সঙ্গে সংগতির্পূণ না হওয়ায় তিনটি ধারা যথা:

২- নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে এমন আইন, বিধি, প্রথা, অভ্যাস ও দন্ত বাতিল করা, নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিবিদ্ধ করা, আইনের মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর সমতা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন

১৩(ক)-পারিবারিক সুযোগের অধিকার

১৬- ১(গ)- বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে সম অধিকার ও সমান দায়িত্ব

১৬- ১(চ)- শিশু রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ/প্রতিপালন, শিশুর অভিভাবকত্ব ও দত্তক গ্রহণের সমানাধিকার[৩৭] প্রভৃতি ধারাতে সংরক্ষণ সহ আংশিক স্বীকৃতি সহ অনুস্বাক্ষর করে। আশা করা হয়েছিল আইনের সংস্কার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে দলিলে র্পূণ স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থেই নারীর প্রতি বৈষম্য কমিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্যোগী হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন সরকার এই দলিলে র্পূণ স্বাক্ষরে মনযোগী হয়নি। ফলে পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে দলিলের ২টি অনুচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ নং ১৩ (ক) পারিবারিক সমান সুযোগ ১৬ ধারার (চ) শিশু রক্ষণাবেক্ষণ, শিশুর অভিভাবকত্ব ও দত্তক গ্রহণের সমানাধিকার এই ধারাগুলিতে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে স্বাক্ষর করা হলেও এখন পর্যন্ত ২ নং ধারা 'নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য

দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন' সম্পূর্ণ ও ১৬ ধারার (গ) বিয়ে বিচ্ছেদের সমান অধিকার, প্রভৃতি ধারায় স্বাক্ষর না করায় বৈষম্য অপনোদন হয়নি।

সিডো দলিলের বাস্তবায়নের অগ্রগতির লক্ষ্যে বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত হয় প্লাটফরম ফর একশন (PFA)। এটি নারীর জীবনের বিভিন্ন দিকের পরস্পর সংযুক্ততা এবং সর্বক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়। এতে ১২টি বিষয়কে চিহ্নিত করে যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিচর্যা, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকার, প্রজনন অধিকার প্রভৃতি সকল বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়। এই প্লাটফরম ফর একশন বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রসমূহকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছিল বেইজিং সম্মেলনে। সেই অঙ্গীকার অনুযায়ী ১৯৯৬ সনে জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (NAP)-এর কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯৭ সালের শেষে তা অনুমোদিত হয়। সরকার ৮ মার্চ ১৯৯৭ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করে।[৩৮] প্লাটফরম ফর একশন বাস্তবায়নের ব্যাপারে সরকারের সাফল্য, ব্যর্থতা দুই-ই রয়েছে।

বেইজিং সম্মেলন পরবর্তী পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত মূল মূল সাফল্যগুলির মধ্যে রয়েছে-

- স্থানীয় সরকারের সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নিবার্চনের বিধান তৈরী করে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
- সিডও সনদের ধারার উপর আরোপিত সংরক্ষণের ২টি ১৩ (গ) ও ১৬ (চ) প্রত্যাহার
- নারীর জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের চাকুরীর উচ্চ পদ নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে সুযোগ সৃষ্টি
- নারী ও শিশু নিপীড়ন রোধে আইন প্রণয়ন
- নারী ও শিশু পাচার রোধে সার্ক পর্যায়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ।
- দেশের অভ্যন্তরে ও আঞ্চলিকভাবে বিভিন্ন এনজিও , নারী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন ও সিভিল সোসাইটির মধ্যে নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি।

- বেইজিং পিএফএ, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও সিডও সনদের যথাযথ বাস্তবায়নের দাবীত এনজিও, নারী সংগঠন ও সিভিল সোসাইটির তৎপরতা বৃদ্ধি।
- জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের দাবী উত্থাপন
- ১৯৯৭ সালে সরকার ও পার্বত্য এলাকায় শান্তি বাহিনীর সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে বিগত দু দশক ধরে চলে আসা সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ঘটায়। এ থেকে গোটা জাতি, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসী সংখ্যালঘু জাতিগুলি উপকৃত হয়। এছাড়াও নারী নির্যাতনসহ যৌণ নিপীড়ন, বিশেষত পাহাড়ী নারীদের উপর সংঘঠিত নিপীড়নের পরিসমাপ্তি ঘটে।[৩৯]

বাধাঁ বিপত্তি ও চ্যালেঞ্জ

- সাধারণভাবে সমাজে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি
- সমাজে সহিংসতার সংস্কৃতি ও নির্যাতন করে রেহাই পেয়ে যাওয়া এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিমন্ডলে নারীর অধিকার উন্নয়নে অব্যাহত বাধাঁ বিপত্তি
- জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে দূর্বল রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার
- নারী ইস্যুতে কাজ করতে আগ্রহী ও অঙ্গীকারাবদ্ধ সংগঠনসমূহের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব
- নারীর অধস্তন সামাজিক অবস্থান যা সহজেই নারীকে সমাজে শিকারে বা টার্গেটে পরিণত করে
- অসম আইন বিশেষ করে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন
- রাষ্ট্র প্ররোচিত সহিংসতা -যেমন, সহিংস উপায়ে দেশের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহত্তম পতিতালয় টানবাজার থেকে যৌনকর্মীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে উচ্ছেদ, ঢাকা নগরীর বস্তি উচ্ছেদ
- সুশাসনের অভাব
- তৃণমুল পর্যায়ে নারীদের কাছে পৌছানোর ধীর প্রক্রিয়া

- বাজার নিয়ে গবেষণা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা দক্ষতায় নারীর সুযোগের অভাব
- মৌলবাদী গ্রুপ কর্তৃক নারী উন্নয়নে অব্যাহত বাঁধা
- সরকার ও এনজিওদের মধ্যে আন্ত:মন্ত্রনালয় পর্যায়ে সমণ্বয়ের অভাব
- সরকারের উচ্চ পর্যায়ে কর্মকর্তা এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতার অভাব[৪০]

উদ্ভূত প্রবণতা

- নীতিমালা, পরিকল্পনা ও প্রণয়ন করা কাঠামো গড়ে তোলা হলেও রাজনেতিক সদিচ্ছার ঘাটতির কারণে এর কার্য়কর বাস্তবায়ন হচ্ছেনা।
- নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু তা আবার প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে এবং প্রায়শ:ই তা সহিংস বিরোধীতা র মুখে পড়ছে, বিশেষ করে মৌলবাদীদের তরফ থেকে
- সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন এবং বিদ্যমান স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষ অবলম্বনকারীদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে
- উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের দাবী বৃদ্ধি পাচ্ছে: কিন্তু সরকার তার দায়দায়িত্ব বহন না করায় তা এখনও সুদূর পরাহত রয়ে গেছে।[৪১]

সুতরাং দেখা যায়, আর্ন্তজাতিক উদ্যোগের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। তবে এ ব্যাপারে যথাযথ প্রচার না থাকায় এই আর্ন্তজাতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতি রেখে নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও সকল শ্রেণীর সচেতনতা পরিলক্ষিত হচ্ছেনা ব্যাপকভাবে।

৪.৫ শ্রমশক্তিতে নারী: উন্নয়ন সম্পৃক্ততা ও প্রতিবন্ধকতা

❒ উন্নয়ন সম্পৃক্ততা

জাতীয় শ্রমশক্তিতে নারীর ভূমিকা নির্ণয় ও বাস্তবতা বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবস্থান চিহ্নিত করার করার ক্ষেত্রে শ্রমশক্তিতে নারীর অবদান ও স্বীকৃতির বিষয়টি অপরিহার্য। অর্থনৈতিক উন্নযনে নারী যে প্রধান একটি ভূমিকা পালন করে তা প্রথমবার

১৯৭০ এর দশকে নারী দশক ঘোষণার মাধ্যমে আলোচনায় আসে। লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব ১৯৭৬-১৯৮৫ পর্যন্ত আর্ন্তজাতিক নারী দশক ঘোষণা করেন। বিশ্বব্যাপী সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দ্বরা একটি বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয় যার মূল বিষয় ছিল- সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি এবং সম্পৃক্ত বিষয় ছিল স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান।[৪২] বাংলাদেশও সেই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। তবে সামাজিক প্রতিকূলতার কারণে এখানকার নারীরা পূর্ণাঙ্গভাবে এগিয়ে আসতে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছে। সামাজিক অধস্তন অবস্থান নারীদের প্রথাগত উৎপাদনমূলক কর্মের স্বীকৃতি প্রাপ্তি ও বৃহত্তর পর্যায়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিপত্তি তৈরী করে।

অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে নারীদের অংশগ্রহণ ও অবস্থানের বিষয়টি তুলে ধরলে এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যাবে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারী আগের তুলনায় সক্রিয়। যদিও কৃষি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বহু পুরনো। দেশের সামগ্রিক কৃষি কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ। ১৯৮৫-৮৬ তে কৃষিখাতে নারী শ্রমশক্তি ছিল ১ কোটি ৭৫ লাখ, সেখানে ১৯৮৯ তে শ্রমশক্তি জরীপের হিসেবে তা বেড়ে ৩ কোটি ৭০ লাখে দাড়িঁয়েছিল। বর্তমানে সেখানে ৮০ ভাগ মহিলাদের অংশগ্রহণ এ খাতে নারীদের বিরাট অগ্রগতির কথাই প্রমাণ করে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নারীদের এই প্রবেশগম্যতা যথাযথ ভাবে মূল্যায়িত হয় না।[৪৩] দেখা যায়, কৃষিতে, গার্হস্থ্য কর্মে ও অ-কৃষি কাজে মহিলারা নিভৃতে থেকেই উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখে যাচ্ছে। কিন্তু তারা উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে ও স্বীকৃতি লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যা কোন সমাজের সুস্থ বিকাশের পরিপন্থী। কৃষিতে নারীর এই ব্যাপক অংশগ্রহণের বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করে যা দেখা যায়, তা হলো-

- প্রায় শতকরা ৪৫ভাগ নারী শ্রমজীবী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকর্মে নিয়োজিত।
- কৃষিখাতে নিয়োজিত নারী শ্রমজীবীর প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ পারিবারিক শ্রম হিসেবে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে থাকেন।
- কৃষি ও অ-কৃষি খাতে নারী শ্রমিকের পারিশ্রমিক পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।
- মৎস উৎপাদন, পশুপালনও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারী ব্যাপকভাবে নিয়োজিত।[৪৪]

কৃষিতে ব্যাপক অবদানের পাশাপাশি নারীরা শহরমুখী শিল্প অর্থনীতিতেও অংশগ্রহণ করছে। সময়ের পরিবর্তনে, দারিদ্রতার চাপে নারীরা বর্তমানে গৃহের বাইরে আসছে। বহু বিবাহের ফলে অনেক পরিবার পুরুষ অভিভাবক হারিয়ে নারী নির্ভর হয়ে পড়ছে। BIDS সূত্রে বাংলাদেশের শতকরা ৩০ ভাগ পরিবার নারী প্রধান। এই নারীরা বাইরের কর্মজগতে প্রবেশ করছে। গ্রাম থেকে শহরে আসা ছিন্নমূল নারীরা শ্রমিক হিসেবে মজুরী বৈষম্য, যে কোন সময় উৎখাতের সম্ভাবনা, বাসস্থানের অনিশ্চয়তা নিয়েও টিকে থাকার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পোষাক শিল্পের স্থান তৃতীয়। এমন একটি লাভজনক খাতে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী। তবে পোষাক শিল্পে নারীর এই ব্যাপক অংশগ্রহণকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। কারণ বড় বড় শিল্প কারখানায় নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। তবে বাইন্ডিং, প্যাকেজিং ইত্যাদিতে খুব সীমিত সংখ্যক নারী কাজ করছে। সাম্প্রতিককালের রপ্তানীমূলক শিল্পে মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শিল্প খাতে নারীদের অংশগ্রহণকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়-

- শিল্প উৎপাদন খাতে নিয়োজিত শ্রমের শতকরা ৩৬ ভাগ এবং কারখানা শ্রমিকদের শতকরা ২৮ ভাগ নারী শ্রমিক
- নারী শ্রমিকগণ ব্যাপকভাবে ইউনিয়ন বর্হিভূত এবং পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় নারীর পারিশ্রমিক প্রায় এক- পঞ্চমাংশ।[৪৫]

এছাড়া ব্যবসায়িক পরিমন্ডলে নারীদের অংশগ্রহণ এখন কিছুটা বেড়েছে। খুব কম সংখ্যায় হলেও হোটেল ব্যবসা, বিজ্ঞাপন চিত্র তৈরী প্রতিষ্ঠানের কর্নধার হিসেবে নারী প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের আত্ম কর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায়ও তারা নিজেদের নিয়োজিত করেছে। দেশের মোট শ্রমশক্তিতে নারী তার অবস্থানকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করছে। তবে এখনও উন্নত, দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে তারা গড়ে ওঠেনি। শিল্প খাতে নারী-পুরুষ শ্রমিকের অংশগ্রহণের একটি তুলনামূলক ছক খাতওয়ারী দেখানো যেতে পারে শিল্প খাতে নারীদের অবস্থানের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার জন্য।

সারণী: ৪.৩ মূখ্য শিল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত (১৫ বছর ও তার উর্ধে) ১৯৯৫-৯৬

মুখ্য শিল্প	সমগ্র দেশ			নাগরিক			গ্রামীণ		
	নারী-পুরুষ উভয়	পুরুষ	নারী	নারী-পুরুষ উভয়	পুরুষ	নারী	নারী-পুরুষ উভয়	পুরুষ	নারী
মোট	৪০.৩	৩৩.২	৭.১	৮.৯	৭.০	১.৯	৩১.৪	২৬.২	৫.৩
কৃষি,বনজ, মৎস	২০.৬	১৭.৮	২.৮	১.০	০.৯	০.২	১৯.৬	১৭.০	২.৬
খনিজ ও উৎপাদন	৪.০	২.৬	১.৪	১.৬	১.০	০.৬	২.৪	১.৫	০.৯
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.১	০.১	-	০.১	-	-	০.১	-	-
নির্মাণ কাজ	১.০	০.৯	-	০.৩	০.৩	-	০.৭	০.৭	০.১
বাণিজ্য,হোটেল,রেষ্টুরেন্ট	৬.০	৫.৫	০.৪	২.২	২.০	০.২	৩.৫	৩	-
অর্থক্রান্ত,ব্যাবসা,সেবা	২.৩	২.২	-	১.০	১.০	-	১.৩	১.৩	-
দলীয় ও ব্যাক্তিগত সেবা	০.২	০.২	-	০.১	০.১	-	০.২	০.১	০.১
গৃহ ক্ষেত্র	৫.০	৩.৩	১.৪	২.২	১.৫	০.৭	২.৮	১.৯	১.০

সূত্র: বি.বি.এস, এল.এফ.এস ১৯৯৫-৯৬

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সামগ্রিকভাবে শিল্প খাতে নারীদের অবস্থান পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ। অথচ সংবিধানের ১০ নং ধারা অনুয়ায়ী জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত কররার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে' এই নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।

এখন পর্যন্ত বৈষম্যের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে বেশী হলেও ক্রমেই এই অসমতা কমে আসছে। ১৯৯০-৯১ সালে শ্রমশক্তির জরীপ অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তি ৫১.২ মিলিয়ন। এর মধ্যে ৩১.১ মিলিয়ন পুরুষ এবং ২০.১ মিলিয়ন হচ্ছে নারী। ১৯৯৫-৯৬ সালের শ্রমমক্তি জরীপ অনুযায়ী মোট শ্রমশক্তি ৫৬ মিলিয়ন। এর মধ্যে ৩৪.৭ মিলিয়ন পুরুষ এবং ২১.৩ মিলিয়ন হচ্ছে নারী। কাজেই এ জরীপ থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নের একটা অগ্রগতি চোখে পড়ে।[৪৬] কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সামান্য।

❒ প্রতিবন্ধকতা

বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতে শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের পুরো বিষয়টি চিহ্নিত করে বিস্তৃত পরিধিতে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। দেখা

যায় অর্থনীতির প্রতিটি খাতে নারীদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। কিন্তু তারপরও নারীরা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার। বৈশ্বিক পর্যায়ে উন্নয়নে নারী ধারনা এ দেশে বাস্তবায়িত হরা কঠিন হয়ে পড়ছে। শ্রমশক্তিতে নারীদের সীমিত অভিগম্যতার আলোকে বাংলাদেশে উন্নয়নে নারী ধারনা বিকাশে প্রধান অন্তরায় সমূহ নিম্নরূপ বলে চিহ্নিত করা যায়।

ক. আমাদের দেশে তথা সমাজে মহিলাদের বিষয়ে দীর্ঘদিনের লালিত অনাকাঙ্খিত নিয়ম, প্রথা ও বিশ্বাসজনিত কারণে ঘরে বাইরে মহিলারা দূর্বল, অসহায় ও নির্ভরশীল ও উপেক্ষিত হচ্ছে। ফলে তারা সার্বিক অর্থে আর্থ সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার, এবং এ অবস্থায় তাদেরকে আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে পূর্ণ অংশগ্রহণে বাঁধার সৃষ্টি করছে।

খ. আর্থ সামাজিক কর্মকান্ডে বিভিন্ন বাধাঁর মধ্যেও যে অবদান তারা রেখেছে তা যথাযথভাবে সরকারী পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হয়না, ফলে তারা যোগ্য স্বীকৃতি লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

গ. মহিলাদের পক্ষে কর্মসংস্থান লাভ বস্তুতপক্ষে দুরূহ, তাছাড়া তারা যোগ্য পারিশ্রমিক লাভ থেকে বঞ্চিত। কর্মক্ষেত্রে মহিলারা মূলত: অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ কাজে ব্যাপৃত থাকে এবং যে কোন প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রথম শিকার স্বাভাবিকভাবেই মহিলা গোষ্ঠী।

ঘ. শিক্ষার অভাবে মহিলারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি লাভে ব্যর্থ হয়।

ঙ. পর্যাপ্ত তথ্য ও পরিসংখ্যানের অভাবে মহিলাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডের মুলধারায় আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মাল্টি সেক্টোরাল প্রকল্প/ কার্যক্রম প্রণয়ন বাঁধার সম্মুখীন হয়।

চ. রাজনীতির ক্ষেত্রে উন্নয়নে 'নারী' বিষয়ক ধারনার পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতির অভাবে দেশের উন্নয়ন নীতিমালা নারীদের জন্য যথোপযুক্ত ভারসাম্যতা হাড়িয়ে ফেলে।[৪৭] ফলে উন্নয়নে নারী- এই ধারনার বিকাশ রূদ্ধ হয় বারবার। যদিও জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকারী পর্যায়ে জাতিসংঘ রেজ্যুলেশনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে এবং নারী দশক সম্পৃক্ত সকল সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। আর্ন্তজাতিক কর্ম পরিকল্পনায় স্বাক্ষরদানকারী হিসেবে নারীদের মৌলিক মানবাধিকার এবং সাংবিধানিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকা এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অর্ন্তভূক্তি তরাণ্বিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া সবকিছুই প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে বাংলাদেশে নারীরা উন্নয়নে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জন করতে পারছে না। যে সকল অন্তরায় সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে তার সবগুলোই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত বিষয়ক। অর্থাৎ বলা যায়, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অনুকূল পরিবেশ তৈরী না হলে শ্রমশক্তিতে নারীদের বিপুল শ্রমের যথাযথ প্রয়োগ হওয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ সর্ম্পকে আলোচনায় বে-সরকারী উদ্যোগ সর্ম্পকে ব্যাখ্যা তুলে ধরা যেতে পারে সার্বিক চিত্র পাওয়ার জন্য।

৪.৬ উন্নয়নে নারীর অবস্থান: বে-সরকারী উদ্যোগ

বাংলাদেশে নারীর অবস্থার পরিবর্তনে উন্নয়ন বে-সরকারী উদ্যোগ ও কর্মকান্ড গুরুত্বের দাবী রাখে। বিশেষ করে এনজিও এবং নারী আন্দোলনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

❒ এনজিওদের ভূমিকা

নারীর উন্নয়নে এনজিওগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির সূচনা এনজিও কার্যক্রমের মাধ্যমেই ব্যাপকতা পেয়েছে। বিশেষ করে তৃনমূল পর্যায়ের নারীদের অবস্থার পরিবর্তনে ইতিবাচক পদক্ষেপ এসেছে এনজিও থেকে। তাদের বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন, সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম, শিক্ষা কর্মসূচী, পরিবেশ সংরক্ষণ, আইনগত সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রম নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থান উত্তরণ ঘটিয়ে পুরুষের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মজীবনে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করেছে। যার মাধ্যমে নারী প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে ও উপযুক্ত পরিবেশে নারী পুরুষের সমান যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। নারীর স্বাধীন চিন্তা, আর্থিক স্বাধীনতা ক্ষমতায়নের পথ উন্মুক্ত করেছে। স্থানীয় সরকারে নারীর আগ্রহ ও যোগ্যতা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীর দায়িত্ববোধ ও সততা বেশী। তাই ঋণদান কার্যক্রমে দেখা যায় নারীদের ঋণ ফেরতের হার অত্যন্ত ভাল। এনজিও কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। শুরুতে দারিদ্র বিমোচনের উপর গুরুত্ব দিলেও এখন কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে পরিবার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসেবা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, পূর্ণবাসন থেকে গণতন্ত্র শিক্ষা কার্যক্রম পর্যন্ত। এনজিওদের এই ব্যাপক ভূমিকা সরকারের পাশাপাশি এবং অনেক সময় সরকারের প্রতি প্রভাব সৃষ্টি করে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের ব্যাপকতা বৃদ্ধি করতে পারে।

❐ নারী আন্দোলনের ভূমিকা

পুরুষ প্রাধান্যশীল সমাজে নারীর অধিকার অর্জনে দেশের নারী সংগঠন সমূহের অবদান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের আছে নিজস্ব ইতিহাস। এখানে নারী আন্দোলন হয়েছে সাংগঠনিকভাবে, কখনও ব্যক্তি পর্যায়ে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভের পর তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলনে নারী সমাজ টার্গেট গ্রুপের অর্ন্তভূক্ত হয়ে এনজিও কর্মকান্ডে জড়িত হয় সেইসাথে নারী দশকের প্রেক্ষাপটে উন্নয়নে নারী কর্মসূচী গৃহীত হয়। এর আগে থেকে মহিলা পরিষদ নারীর অধিকারের প্রশ্নে নারী আন্দোলনে জড়িত ছিল। তবে মহিলা পরিষদের মুল ফোকাস ছিল সেই সময়ে শ্রেণী সর্ম্পকিত।নারী দশক পরবর্তী পর্যায়ে নারী সংগঠনগুলো সমাজে, পরিবারে, রাষ্ট্রে সম অধিকার ও মর্যদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশেষ ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন পরিচালনা করে। ১৯৯৭ সালে সমমনা ১৪টি সংগঠন নিয়ে নারীর সমানাধিকারের দাবীতে "ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ" গড়ে ওঠে। ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ তাদের তাদের ১৭ দফা কর্মসূচীতে উল্লেখ করে যে, নারী নির্যাতন, শোষণ ও বৈষম্য দূর করার উপযোগী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ও শাসননীতি ছাড়া নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।[৪৮] ১৯৯৪ এ ফতোয়ার প্রকোপ নারী সংগঠনগুলোকে আবারো তৎপর এবং প্রতিবাদী করে তোলে। আর্ন্তজাতিক উদ্যোগের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ ও সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা আদায়ে নারী সংগঠনসমূহ ব্যাপক তৎপরতা চালায়। সিডো দলিলে পূর্ণ স্বাক্ষর প্রদান, ২০০০ সাল পর্যন্ত নাইরোবী অগ্রমূখী কর্মকৌশল (এন.এফ.এল.এস) বাস্তবায়নের জন্য নারী সমাজের পক্ষ থেকেই বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সরকারের মনযোগ আকর্ষণ ও পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে জোরালো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়া.দেশের অভ্যন্তরে প্রচলিত বৈষম্যমূলক অবস্থার অবসানের লক্ষ্যে নারী সংগঠন সমূহের সক্রিয় তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। রাজনীতর প্রশ্রয়ে মৌলবাদের পুণরায় উত্থান ও 'সকল প্রকার ফতোয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা' জারী হওয়ায় নারী সমাজের ঐতিহাসিক জয়ের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে মৌলবাদের হুমকী ও প্রকোপ এবং তাতে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলগুলোর কোন কোনটির সর্মথনের বিরুদ্ধে ২০০১ সালে নারী সংগঠনগুলা আবারো তৎপর এবং প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।

এই অধ্যায়ের আলোচনায় বাংলাদেশে উন্নয়ন সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের আলোকে নারীর উন্নয়ন সম্পৃক্ততা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়ন যেহেতু একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং ব্যাপক বিষয় তাই বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায় উন্নয়ন পরিক্রমা সীমিত হারে অগ্রসর হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নীতির দ্বৈততা, কাঠামোগত জটিলতার জন্য সীমাবদ্ধতার পরিধি অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। অধ্যায় শেষে বলা যায়, মুলত কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। তা হলো: বিশ্ব উন্নয়ন দর্শনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের সম্পৃক্ততা ও পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য। রাষ্ট্রের সংবিধানের অনুশীলন ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলের প্রতি মনযোগ দেয়া একান্ত প্রয়োজন। সরকার হচ্ছে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার প্রধান চালিকাশক্তি। তাই সরকারের নীতি ও আদর্শ বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ। শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং যথাযথ স্বীকৃতি প্রাপ্তি জরুরি। পাশাপাশি শুধু সরকারের উপর নির্ভর না করে বে-সরকারী উদ্যোগ গ্রহণও রাষ্ট্রের উন্নয়ন ধারাকে এগিয়ে নেবার ব্যাপারে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। উন্নয়নে নারীর অবস্থান নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে নারী সংগঠনের কার্যকর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নয়নকে নারী-পুরুষ সকলের জন্য অর্থবহ করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সকল পক্ষের কার্যকর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর যথাযথ অভিগম্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে লিঙ্গসমতাভিত্তিক যথার্থ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং তখনই কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জিত হতে পারে।

তথ্য সূত্র

১. *টাস্কফোর্স রিপোর্ট, মার্চ,* ১৯৯১, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মার্চ, ১৯৯১

২. পুর্বোক্ত

৩. পুর্বোক্ত

৪. Salma Khan, "women's Development and public Policy in Bangladesh", *Integration of Women in Development*, published by United Nations Information Centre, Dhaka, 1985, P.67

৫. Dr. sayeda rowshan Qadir, *Women Leaders in Development Organizations and Institutions*, p.21

৬. বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ কর্তৃক প্রকাশনা, *বাংলাদেশ নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান*

৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান

৮. Dr. sayeda rowshan Qadir, op.cit, p.22

৯.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান

১০.পুর্বোক্ত

১১.পুর্বোক্ত

১২.পুর্বোক্ত

১৩.পুর্বোক্ত

১৪.পুর্বোক্ত

১৫.মেঘনা গুহ ঠাকুরতা,"বাংলাদেশে নারী নির্যাতনঃ রাষ্ট্রের ভূমিকা", বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর এবং জারিনা রহমান খান (সম্পাদিত) , *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৩ , পৃ. ৭-৮

১৬.বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, "বাংলাদেশ এবং সিভিল সমাজ", *বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ এবং মৌলবাদ* , আগামী প্রকাশনী, পৃ. ১১-১২

১৭.সুরাইয়া বেগম, "রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ এবং অংশগ্রহণের সঙ্কট", *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি*, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৭, পৃ. ১১৯

১৮.পুর্বোক্ত পৃ.১২৬

১৯.মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, প্রাগুক্ত।

২০.সুরাইয়া বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

২১.রেহমান সোবহান, "অবাধ বাজার অর্থনীতিমুখীন সংস্কার ধারনার পূর্ণবিবেচনা ", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা,* ১০ খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা১৩৯৯, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পৃ. ৪৫

২২.সুরাইয়া বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

২৩.পুর্বোক্ত পৃ.১২৭

২৪.পুর্বোক্ত পৃ.১২৭-১২৮

২৫.পুর্বোক্ত পৃ.১২৮

২৬.প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

২৭.প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

২৮.দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

২৯.তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৩০.চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৩১.পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৩২. বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, প্রাগুক্ত

৩৩. বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, প্রাগুক্ত

৩৪.অদিতি রহমান ও পারভীন সুলতানা, *দৈনিক ইত্তেফাক,* ১৯৯৮।

৩৫. পুর্বোক্ত

৩৬. বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, প্রাগুক্ত

৩৭.CEDAW, United Nations, Newyork.

৩৮.একবিংশ শতাব্দী: সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি- বেইজিং প্লাস ফাইভ-এনজিও প্রতিবেদন-এনসিবিপিআর, *উন্নয়ন পদক্ষেপ, ষষ্ঠ বর্ষ, উনবিংশ সংখ্যা,* ষ্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট।

৩৯.পুর্বোক্ত

৪০.পুর্বোক্ত

৪১.পুর্বোক্ত

৪২.Salma Khan, "women's Development and public Policy in Bangladesh", *Integration of Women in Development*, published by United Nations Information Centre, Dhaka, 1985, P.67

৪৩.অদিতি রহমান ও পারভীন সুলতানা, প্রাগুক্ত

৪৪.*টাস্কফোর্স রিপোর্ট-মার্চ, ১৯৯১*, প্রাগুক্ত

৪৫. পুর্বোক্ত

৪৬.অদিতি রহমান ও পারভীন সুলতানা, প্রাগুক্ত

৪৭.*টাস্কফোর্স রিপোর্ট-মার্চ, ১৯৯১*, প্রাগুক্ত

৪৮.মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, "রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ", মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭-১৮৮।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজনীতিতে নারী: বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

৫.১ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

৫.২ রাজনীতিতে নারী: অভ্যুদয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা

৫.৩ নারীর রাজনৈতিক অবস্থান: সীমাবদ্ধতার চিত্র

৫.৪ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব

৫.৪.১ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হিসেবে নারী

৫.৪.২ রাষ্ট্র ও সরকার উপ প্রধান হিসেবে নারী

৫.৪.৩ মন্ত্রীসভায় নারী

৫.৪.৪ নারীর সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব

৫.৪.৪ আইনসভায় নারী স্পীকার

৫.৪.৫ আইনসভায় নারী স্পীকার

৫.৫ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

এই অধ্যায়ে মূলত বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ে বিশ্ব ব্যাপী উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায় নারীর অবস্থান, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধরন এবং সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর বাস্তব অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে উন্নয়ন একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ প্রত্যয়। বিভিন্ন প্রত্যয়ের সুষ্ঠু সমণ্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর উন্নয়ন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান হচ্ছে রাজনীতি।

গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য আলোচনায় শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজনীতি হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছাঁনোর প্রধান নির্ণায়ক শক্তি। রাজনীতি হল ক্ষমতার পরিমন্ডল। তাই গবেষণার এই অধ্যায়ে রাজনীতিতে নারীর অসম ও প্রান্তিক অবস্থান সর্ম্পকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ব্যাপক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীর সীমাবদ্ধ অবস্থান এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রেক্ষিতে সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫.১ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

রাজনীতি হল ক্ষমতার পরিমন্ডল। এটি দেশের সম্পদ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র । জাতীয় জীবনে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। বিস্তৃত পরিসরে রাজনীতি কাঠামো ও অবকাঠামোগতভাবে জনমত প্রতিফলনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রক্রিয়া। ম্যাক্রো ও মাইক্রো লেভেলে সম্পদের মোবিলাইজেশন ও বিতরণ, মূল্যবোধ সৃষ্টি ও প্রয়োগ, জনমত সংগঠন ইত্যাদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অর্ন্তভূক্ত। তৃণমূল পর্যায়ের কম্যুনিটি এ্যাকশন যেমন রাজনীতির অঙ্গ, তেমনি জাতীয় পর্যায়ে পাবলিক পলিসি এ্যাকটিভিজমও রাজনীতির উপাদান। সার্বিক জনকল্যাণ রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং এতে নারী-পুরুষ উভয়ের অংশীদারিত্বের প্রয়োজন।[১] কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্র পুরুষ নিয়ন্ত্রিত এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক একটি পরিমন্ডল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার জন্য 'রাজনৈতিক সক্ষমতা' ধারনাটিরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'রাজনৈতিক সক্ষমতা' পরিভাষাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন। 'রাজনৈতিক সক্ষমতা' কথাটির তিনটি সাধারণ প্রয়োগ রয়েছে। আর

এর ত্রিবিধ প্রয়োগেই ‘অংশীদারিত্বের’ ‘‘অবস্থার’’ উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। রাজনৈতিক সক্ষমতার সংজ্ঞাগুলি এরকম:

(১) গণতান্ত্রিক সমাজের একটি নিয়মাচার হচ্ছে যে, নাগরিকদের শাসন ব্যবস্থায় অংশীদার হওয়া উচিত ও তাঁদের এই অনুভূতি থাকা উচিত যে, কর্তৃপক্ষ তাদের এই অংশগ্রহণের প্রশ্নে সাড়া দেবেন, সংবেদনশীল হবেন

(২) কতকগুলি প্রাক প্রত্যয় বা বিশ্বাস । এসব প্রত্যয় বা বিশ্বাসের অর্ন্তগত এই বিশ্বাস যে, একজন ব্যক্তির আচরণের প্রতি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় অন্য ব্যক্তি সাড়া দেবেন, সংবেদনশীল হবেন এবং

(৩) বাস্তব আচরণ যা ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতা প্রদর্শন করে (নাগরিক কেবল কার্যক্ষমতাকে উপলব্ধিই করেনা বরং বাস্তবক্ষেত্রে কার্যদক্ষতা প্রদর্শনও করে)।[২] সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক সক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়ে জনগণ সমাজে ও রাষ্ট্রে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারেন। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের চিন্তা ও মনোভাব এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলেকজেন্ডার গ্রোথ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, বরং একটি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও প্রবণতাই বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে নারীর অবস্থান নির্ধারণের জন্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে লক্ষ্য করা গেছে। সমরবাদী শাসকগোষ্ঠীর শাসনাধীন জাপান ও নাজী শাসনাধীন জার্মানী এমন সমাজ ব্যবস্থার উদাহরণ যেখানে সমাজের অতি উন্নত স্তরের শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল নারীর নিকৃষ্ট অবস্থানগত মর্যদা। ঐ দুই দেশেই স্বৈরাচারী একনায়ক সরকার ১৯২১-এর দশকের পার্লামেন্টারী সরকারগুলির আমলের সাবেক প্রবণতাগুলিকে ধ্বংস করতে পেরেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল নিরবচ্ছিন্ন, এমনকি দ্রুততর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও নগরায়ন প্রক্রিয়া সত্ত্বেও।’’[৩] সুতরাং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষে নিজেদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা জরুরি।

রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যেহেতু নীতি নির্ধারণের কেন্দ্রস্থল, তাই রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নিতে চাইলে রাজনেতিক অংশগ্রহণ জরুরি। বিষয়টিকে এভাবে দেখানো যায়:

চিত্র: ৫.১ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নীতি নির্ধারণী ভূমিকা

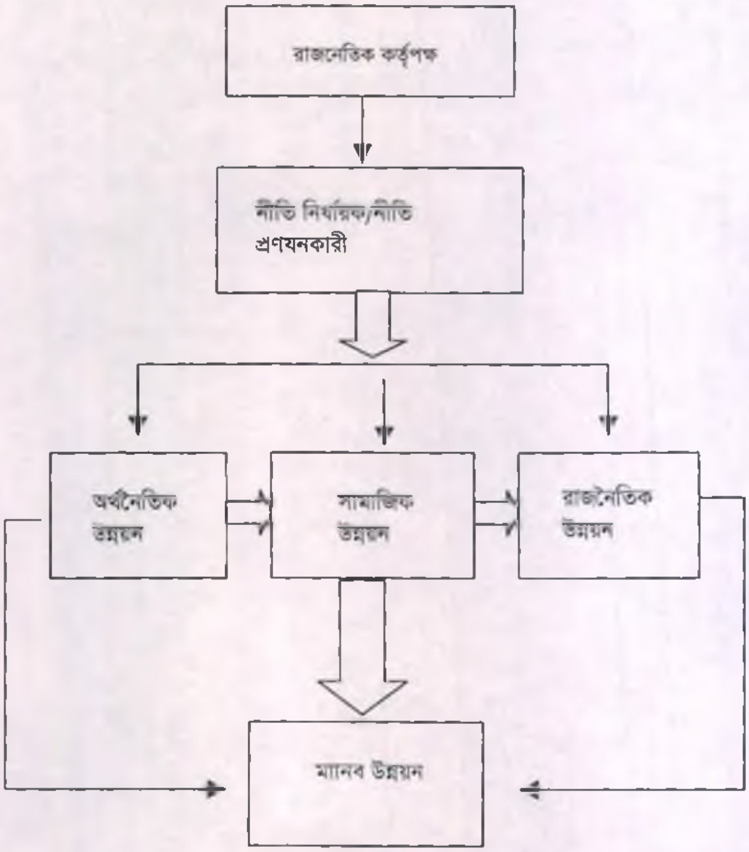
রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ
নীতি নির্ধারক/নীতি প্রণয়নকারী
অর্থনৈতিক উন্নয়ন
সামাজিক উন্নয়ন
রাজনৈতিক উন্নয়ন
ম্যানব উন্নয়ন

চিত্র থেকে বলা যায় যে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের দ্বারা যেহেতু নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে উন্নয়ন কৌশল নিরূপণে প্রধাণ ভূমিকা রাখা যায়, সুতরাং এতে নারীর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্বিক মানব উন্নয়ন অর্জনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রয়াজনীয়তা তাই সরকারী ক্ষমতার অংশীদারিত্ব অর্জনের অপরিহার্য শর্ত।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব হলো এর মাধ্যমে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা যায়। S.P Huntington and I. Nelson যখন রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সংজ্ঞা দেন তখন তারা নাগরিকের ঐসব কাজের উপর গুরুত্ব দেন যার দ্বারা সরকারের নীতি প্রণয়ন কাজকে প্রভাবিত করা যায়। তাঁরা সংজ্ঞা দেন এভাবে,''activity by private citizens designed to influence governmental decision-making."[৪]

সরকারী কাজে অংশগ্রহণের অন্যতম ক্ষেত্র হলো আইনসভায় উপস্থিতি। আইনসভায় উল্লেখযোগ্য হারে নারীর উপস্থিতি পার্লামেন্টে নারী ইস্যুতে কাজের জন্য গ্রহণযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। আইনসভায় নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দের নিরাপত্তা দিতে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এবং আইনসভার বাইরে লিঙ্গ প্রভাবিত সরকারী খরচের ব্যাপারে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। এটা নির্দেশ করে যে, এমন ক্ষমতা চর্চার জন্য আইনপরিষদে নারীর পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন যেন সিদ্ধান্তগ্রহণকালীন সময়ে পরিমাপযোগ্য বলে হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার জন্য বিবেচিত হতে পারে। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত দলের অর্পিত মর্যদার চেয়ে অবশ্যই কিছু স্বায়ত্বশাসিত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থাকতে হবে এবং নারী ইস্যু অর্ন্তভূক্তকরণে (registration) সম্মিলিত এবং একতাবদ্ধ কণ্ঠে কথা বলতে সক্ষম হতে হবে।[৫] নারীদের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এই দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জিত হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে Sydney Verba and Norman Nie-ও একই ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন এই বক্তব্যের মাধ্যমে "those activities by private citizens that are more or less directly aimed at influencing the election of governmental personnel and /or actions they take."[৬] রাজনৈতিক প্রভাবের অণ্বেষা তাই কাজ করে জনগণের মধ্যে। রাজনৈতিক পদ্ধতির কোন কোন সদস্য নীতি, বিধিবিধানএবং সরকার কর্তৃক বলবৎকৃত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাব তথা রাজনৈতিক প্রভাবের অধিকারী হতে চায়- অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রভাব। এই রাজনৈতিক প্রভাব জণগণের কেবল নিজেদের জন্যই যে আবশ্যক হয় তা নয়। বরং সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকলে এ লোকগুলির এক বা একাধিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয় বলেই রাজনৈতিক প্রভাবের দরকার হয়। সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ একজনের লক্ষ্য বা মূল্যমান বৃদ্ধির এত পরিচিত উপায় যে, এমন কোন রাজনৈতিক পদ্ধতি বা ব্যবস্থার কল্পনাই করা যায় না যে ব্যবস্থায় কেউ ক্ষমতা চায়না।[৭] সরকারের উপর প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে শুধু সরাসরি আইনসভায় নয়, বরং সরকারী ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল দিক থেকেই একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌছানো যায়। সুতরাং

রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন যথাযথ প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য।

৫.২ রাজনীতিতে নারী: অভ্যুদয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা

রাজনীতির নারী-বিরুদ্ধ পরিবেষ্টনীতে নারী বরাবরই অবহেলিত। তবু সময়ের পরিবর্তনে পুরুষতান্ত্রিক পরিমন্ডলের মধ্যে হাজারো প্রতিকূলতা স্বত্তেও নারীরা নিজ উদ্যোগে এগিয়ে এসেছে। আঠারো শতকের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণচাঞ্চল্য ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা নারী সমাজেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যার ফলে অংশীদারিত্বের প্রশ্নে তারাও সাড়া দেয়। ইংল্যান্ড ও ইউরোপীয় মূল ভূখন্ডে নারীরা কেবল সামাজিক ক্ষেত্রেই নয় বরং বিভিন্ন ধ্যান-ধারনার চর্চার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফ্রান্সের বৈঠকখানায় অনেক বুদ্ধিজীবী নারীই দেশে বিপ্লব শুরু হলে তাঁদের ধ্যান-ধারনা ও তত্ত্বগুলোকে রাজনৈতিক কার্যক্রমে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হন। তারা সকলের জন্য মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে দেশের বৃহত্তর সাধারণ নারী সমাজের সঙ্গে এক অস্বস্তিকর ধরনের জোট বাধেন। তাঁরা কেবল সুফলেই সমান অংশ চাইলেন না শ্রমেও সমান অংশগ্রহণে আগ্রহী হলেন। তারা চেয়েছিলেন কর্তব্য কাজের ও নেতৃত্বের দায়িত্ব বহন করতে, কিন্তু তাদের হতাশ হতে হয়। তারা লক্ষ্য করলেন ফরাসী পুরুষেরা চান, তারা সহায়তাধর্মী চিরাচরিত নারী ভূমিকায় বিপ্লবী আন্দোলনের সাহায্য সহায়তা করুন। পুরুষেরা চাইলেন না, নারীরা নেতৃত্ব বা যোদ্ধা সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হোক। ১৭৮৯ সনে জাতীয় পরিষদ গঠিত হলে এ বিষয়টি যখন অত্যন্ত পরিস্কার হয়ে উঠল যে, নারী অধিকার বাড়বেনা তখন বিপ্লবী নারী সক্রিয়তাবাদীরা পরিষদের সামনে সমবেত হয়ে তাদের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করেন।[৮] মার্কিন নারীদের অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। তারা দেখলেন বিপ্লবী নেতাদের রক্ষণশীল নারী ভূমিকার আদর্শগত কারণে মার্কিন নারী সমাজের রাজনৈতিক স্বাধীনতার আশা বির্চূণ হয়। ১৭৮৯ সনের সংবিধানে ভোটাধিকার সম্পদের অধিকারী শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের ক্ষেত্রে সীমিত ছিল। এই ব্যবস্থা সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে রহিত করে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। এই সংশোধনীগুলোতে (১৪শ) যদিও 'ব্যাক্তি' ও 'নাগরিকদের' (১৪ ও ১৫শ) এ

শব্দগুলোর উল্লেখ ছিল, মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়, ঐ শব্দগুলো নারীদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।[৯] এভাবে নারীরা প্রতি ক্ষেত্রে বাঁধার সম্মুখীন হয়।

কিন্তু নারীরা এই অবদমনের চেষ্টাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে কাজ করতে থাকে। ১৭৯২ সনে মেরী উলস্টোনক্রাফট নামে এক মহিলা এ ভিন্ডিকেশন অব দ্যা রাইটস অব উইম্যান শীর্ষক একটি গ্রন্থ লেখেন। ১৮৪৮ সালে এলিজাভেদ ক্যাডি স্টানটন ও লুক্রেটিয়া মট নারী অধিকার মহাসম্মেলন আহবান করেন এবং এর অল্পকাল পরেই নারী ভোটাধিকারবাদী নারী আন্দোলনের সদস্যরা, বিশেষ করে লুসিৎস স্টোন ও সুসান বি অ্যান্থনি তাদের সাথে যোগ দেন। ১৮৬৫ সালে এমেলিন প্যাঙ্কহার্ষ্ট প্রথম নারী ভোটাধিকার কমিটি গঠন করেন।[১০] এই শতকের প্রথম দিকেও পৃথিবীর দেশে দেশে নারী ছিল নিগৃহীত, উপেক্ষিত। তবে একথা সত্যি যে, তাদের প্রয়াসেই আইনগত (ও কোন কোন ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক) পরিবর্তনও সাধিত হয় নারী স্বার্থের অনুকূলে। এসব পরিবর্তনের ফলাফলে সকল গণতান্ত্রিক দেশে নারীর সমান ভোটাধিকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। নারীর ভোটাধিকারের জন্য ১৯২০ সন পর্যন্ত মার্কিন নারীদের আন্দোলন করতে হয়েছিল। ১৮৯৩ সালে নারীর প্রথম ভোটাধিকার হয় নিউজিল্যান্ডে। এরও ২৭ বছর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পায় ভোটের অধিকার। সংবিধানের ১৯তম সংশোধনীর মাধ্যমে এ অধিকার দেয়া হয়। ফিনল্যান্ড প্রথম রাষ্ট্র যেখানে ১৯০৬ সনে উভয় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করা হয়। ১৯৪৫ সনের আগে ফরাসী নারী সমাজ ভোটাধিকার পায়নি।[১১] বিশ শতকের শেষে এসে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৯৫ শতাংশ রাষ্ট্রে নারীর জন্য দুটি মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার অনুমোদন করেছে। এখন পর্যন্ত কিছু রাষ্ট্র নারীদের ভোটের অধিকার এবং নির্বাচনে দাঁড়ানোর অধিকার দিতে অস্বীকার করছে। এভাবে ক্রমেই নারীরা দীর্ঘদিন ধরে চলমান বৈষম্যসমূহের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করতে শুরু করে এবং তারই ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক অধিকার অর্জনেও প্রয়াসী হয়।

সুতরাং বলা যায়, রাজনীতিতে নারীর আগমন কোন স্বতন্ত্র বিষয় নয়, বরং নিজেদের সামগ্রিক পশ্চাৎপদ অবস্থান থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এবং তারই ফলশ্রুতিতে নারীর রাজনৈতিক অভ্যূদয় ঘটেছে বিশ্ব পর্যায়ে।

৫.৩ নারীর রাজনৈতিক অবস্থান: সীমাবদ্ধতার চিত্র

রাজনীতিতে নারীদের অভ্যূদয় ও ক্রমে এগিয়ে আসার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও রাজনীতির অঙ্গনে নারীর অবস্থান এখনো সীমাবদ্ধ। মূলত: অধিকাংশ সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা একাধিক সামাজিক উপাদানের সমণ্বয়ে একটি জটিল ম্যাট্রিক্স, যার মধ্যে জেন্ডার হলো একটি উপাদান। তা সত্বেও যে কোন গ্রুপের পুরুষ তাদের গ্রুপের নারীদের তুলনায় রাজনীতিতে বেশী সক্রিয় হতে পারে। নারীর এই দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজনেতিক মর্যদার সর্বব্যাপীতা দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যে, কিভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম এবং আইন সমঝোতার ভিত্তিতে অপরিহার্য বা স্থাপক, প্রত্যেকে নিজেকে তৈরী করে এবং একই সময়ে অন্যরা। প্রতিটি অঞ্চলে নারীর দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যদা পুরুষ সুবিধাপ্রাপ্তির সামগ্রিক প্যার্টার্ণের দ্বারা বলবৎ হয়। কিন্তু সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রও লিঙ্গ বৈষম্যের বিশেষ উপাদান তৈরী করে এবং নিজেদের সুবিধা তৈরী করে টিকে থাকা, নতুন কিছু প্রবর্তন ও রূপান্তরের জন্য।[১২] ফলে নারীদের ক্ষেত্রে এই সামগ্রিক পশ্চাৎপদতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের মধ্যে। নাগরিকত্বের মর্যদা অজর্ন করতেই নারীদের অনেক সময় লেগেছে। এমনকি, গণতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী সরকার ব্যবস্থার অত্যন্ত বিখ্যাত প্রবক্তারা পর্যন্ত নারীর পূর্ণ নাগরিকত্ব দাবি প্রত্যাখ্যান (কিংবা উপেক্ষা) করেন। বরং তারাঁ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরাজমান এই ধারনাটিকে গ্রহণ করেন যে, নারীর যর্থাথ ভূমিকা হচ্ছে- বিয়ে, সন্তানের জন্মদান ও পরিবারে - রাজনীতিতে নয়। এভাবেই জন লক যদিও বলেছিলেন যে, সকল মানুষই প্রকৃতগতভাবে সমান, তিনি কখনও এই মর্মে সুপারিশ করেননি যে, নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত । এছাড়া কমবেশী তিনি এই অভিমতও স্পষ্টত পোষণ করতেন যে, পারিবারিক বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে স্বামীর। জঁ জ্যাক রুশো যাকেঁ বিপ্লবী গণতন্ত্রী, সমতাবাদী গণ্য করা হয় তিনি নারীর প্রতি এই ঘোষণা দেন যে, (বলাবাহুল্য তিনি অত্যন্ত বিশদৃশভাবেই তারঁ এই বক্তব্য দেন মানুষের মাঝে অসমতার উৎস বা মূল সর্ম্পকিত তারঁ এক রচনার উৎস্বর্গ অংশে) নারী সমাজের সদস্যারা, আপনারা সবসময় আমাদেরকে শাসন করবেন- কিন্তু সেটি আপনারা করবেন শুধু স্ত্রী ও মাতা হিসেবে, নাগরিক হিসেবে নয়।[১৩]এভাবে রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের কাছেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর রাজনৈতিক অধিকারের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব পায়নি। বরং সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রিক পুরুষাধিপত্যমূলক ধরনের কারণে রাজনীতি শুরু থেকেই নারী বির্বজিত ও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত পেশা হিসেবে পরিচিত হয়ে এসেছে।

অর্থাৎ, চিরাচরিতভাবে রাজনীতি একটি একপেশে পেশা ও কর্মক্ষেত্র। ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমা গণতন্ত্র যা বিভিন্নভাবে উন্নয়নশীল অঞ্চলে রাজনৈতিক আদর্শ ও মডেল হিসেবে অণুসারিত হয়েছে, নারীর এক্সক্লুশন বা বর্জন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নারী-পুরুষের প্রকৃতিসিদ্ধ পৃথক বিচরণভূমি- প্রাইভেট ও পাবলিক স্পেস- এর ধারনা নারীকে গৃহস্থালীর পরিধির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে, আর পুরুষের এখতিয়ারে রেখেছে বিশাল, পরিব্যাপ্ত, ক্ষমতাপূর্ণ রাজনীতির চারণভূমি। রাজনীতিতে পুরুষের আধিপত্য রাজনীতিকে একটি পুরুষালী পেশায় পর্যবসিত করেছে। পুরুষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, পুরুষ রাজনৈতিক ক্রীড়ার নিয়ম তৈরী করে, এবং পুরুষ মূল্যায়নের মান সংজ্ঞায়িত করে। এই পুরুষ নিয়ন্ত্রিত মডেলের ফল হলো হয় নারী রাজনীতিকে পুরোপুরি পরিহার করছে অথবা পুরুষ ধরনের রাজনীতিকে পরিত্যাগ করছে। রাজনীতিতে পুরুষের আধিপত্য রাজনীতিকে একটি পুরুষালী পেশায় পর্যবসিত করেছে। এ ধরনের বিরুদ্ধ সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ও বিরূপ পরিস্থিতিতে রাজনীতিতে নারীর সীমিত অংশগ্রহণকে টিকিয়ে রাখে ও উৎসাহিত করে নিম্নোক্ত কারণগুলো:

রাজনীতির ডোমিন্যান্ট কালচার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আচরণ ও এপ্রোচকে ফলপ্রসূ বলে চিহ্নিত করে। কিন্তু সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ নারীদের ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে নারীরা তাদের সীমাবদ্ধ এলাকা থেকে বাইরে আসতে পারেনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দায়িত্ব পালনের জন্য। কিন্তু তার এই ভূমিকার কোন স্বীকৃতি নেই। বরং সমাজ নারীর চরিত্রে কিছু বিশেষ ভাবমূর্তি আরোপ করে তাকে নির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী, ত্যাগের প্রতিমূর্তি করে গড়ে তোলে। তারা ধৈর্য্যশীল, কম দূর্নীতিপরায়ণ কিন্তু আচরণে রাজনৈতিক পরিপূর্ণতা আনতে পারছেনা সনাতন মূল্যবোধের কারণে। রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে কর্মদিবসের কোন বাধাঁধরা ও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত নারী একটি কর্মদিবসের নির্দিষ্ট পরিসরে গৃহস্থালী ও কর্মক্ষেত্রের দ্বৈত দায়িত্ব সম্পাদন করতে যদিও বা সক্ষম হন, রাজনীতির ক্ষেত্রে এই সমণ্বয় ঘটানো অত্যন্ত দূরহ। নারীর অভাব রয়েছে শিক্ষা ও কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার যা তাদের রাজনীতিমুখী কর্মক্ষেত্রে স্থাপন করে রাজনীতিতে প্রবেশের পথ সুগম করতে পারতো। এখানকার সমাজে নারীর নিজস্ব ও আয় ও সম্পদের উৎস সীমিত। এছাড়া রয়েছে যে সমস্ত রাজনেতিক বা অর্থনেতিক স্বার্থগোষ্ঠীর সাহায্যে বা সমর্থনে অর্থের সমাগম ঘটানো যায় তাদের সঙ্গে নারীর জোরদার সর্ম্পকের অভাব।[১৪]

রাজনীতিতে নারীদের এই পশ্চাৎপদ ও সীমাবদ্ধ অবস্থানকে প্রেক্ষিত অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবেও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। মুলত দুইভাবে ভাগ করা যায়। যথা: রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা।

রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা

- রাজনৈতিক জীবনের "পুরুষ মডেল"(masculine model) এবং নির্বাচিত সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রাধান্য
- দলীয় সমর্থনের অভাব, যেমন নারী প্রার্থীদের জন্য সীমিত অর্থনৈতিক সমর্থন, রাজনৈতিক নেটওয়ার্কে সীমিত অংশগ্রহণ এবং
- অন্যান্য সরকারী (public) সংগঠন যেমন ট্রেড (শ্রম) ইউনিয়ন এবং নারী গ্রুপগুলোর সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতার অভাব
- সাধারণভাবে নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য যথাযথ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, এবং নির্দিষ্টভাবে রাজনৈতিক জীবনের দিকে অভিষিক্ত (orienting) করার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি
- নির্বাচনী পদ্ধতির প্রকৃতি, যেটা নারী প্রার্থীদের জন্য সম্ভবত অনুকূল নয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা

- দারিদ্র ও বেকারত্ব
- পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সম্পদের অভাব
- নিরক্ষরতা ও শিক্ষায় এবং পেশা বাছাইয়ের সীমিত প্রবেশাধিকার
- পেশাগত বাধ্যবাধকতা এবং গার্হস্থ্য কাজের দ্বৈত বোঝা [১৫]

অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ অতিক্রম করে নারীরা রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও রাজনীতিতে প্রবেশের এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের পথে শুরুতেই যে ধাপ অর্থাৎ রাজনৈতিক দলে যথাযথ সুযোগ, সেখানেই প্রচন্ডভাবে বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান ও মৌলিক অবদান মুলত নির্ভর করে দলের গঠণতন্ত্র, ঘোষণাপত্র, ও সমাজের সর্বস্তরের নারীর সম-অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবেশগম্যতা সৃষ্টির উপর। এশিয়ার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশসমূহে যেমন, শ্রীলঙ্কা, ভারত

পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ফিলিপাইন রাষ্ট্রপরিচালনায় নারী নেতৃত্বের জন্য বিশ্বে খ্যাতিলাভ করলেও এর প্রতিটি দেশেই আইনসভা ও দলীয় নির্বহী কাঠামোতে নারীর অবস্থান নগণ্য। যে কারণে ক্ষমতার বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে কোন নারী শীর্ষে ওঠার সুযোগ লাভ করেনি। ঘটনাচক্রে পারিবারিক ও উত্তরাধিকার তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তাই তারা ইতিহাস সৃষ্টি করলেও লিঙ্গবৈষম্য বিলোপ বা লিঙ্গ সংবেদনশীল রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে পারেননি।[১৬] যেসব নারীরা রাজনৈতিক দলে ব্যাপক পরিশ্রম করছেন তারাও তেমন অগ্রগতি অর্জন করতে পারেন না। দলীয় সর্মথন সংগঠিত ও দলের পক্ষে প্রচারে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যদিও বর্তমান প্রচলিত কাঠামোতে সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে তাদের পদ বা অবস্থান দূর্লভ। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী ১১% এর কম নারী নেতা রয়েছেন। যদিও রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী প্রচারের জন্য সম্পদের সরবরাহ করে, কিন্তু নারীরা সেই সম্পদের সুবিধা লাভে বঞ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, দল নারী প্রার্থীদের পর্যাপ্ত অর্থ সহযোগিতা প্রদান করে না। গবেষণায় দেখা গেছে যে, নির্বাচিত নারী এম.পি এবং মনোনয়নপ্রাপ্ত নারী এম.পি দের মধ্যে খুব উচ্চ মাত্রার সহ- সর্ম্পক (co relation) রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর বাছাই এবং মনোয়ন দান পদ্ধতির মধ্যেও নারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। নারীর মধ্যে 'পুরুষভাবাপন্ন চরিত্র' খোজা হয় প্রার্থী বাছাইয়ের সময় এবং সেটিকে অন্যতম নিরূপক হিসেবে দেখা হয়। রাজনীতির 'ওল্ড বয়েজ ক্লাব' ধরনের পরিবেশ ও পূর্বসংস্কার রাজনৈতিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন নারীদেরকে তাদের দলীয় কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে বাধাগ্রস্থ ও নিষিদ্ধ করে। এর ফলে নারীদেরকে রাজনীতিবিদ হিসেবে তাদের কাছে অব-মূল্যায়ন করা হয়, যারা নির্বাচনী প্রচারের জন্য অর্থ সরবরাহ করেন, যা পরবর্তীতে নারীদের মনোনয়নকে বাধাগ্রস্থ করে তোলে। নারীদের অংশগ্রহণের জন্য যখন কোটা ব্যবস্থা রাখা হয়, তখন নারীর অংশগ্রহণ অধিকতর ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সুইডেনে ৪০-৬০ শতাংশের হারের ফল হলো চলমান আইনসভায় ৪০.৪ শতাংশ আসনে নারীরা অধিষ্টান করছে।[১৭] কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর স্বল্পমাত্রার সক্রিয় উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। যার অনিবার্য ফল হলো রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর সীমিত হারে প্রতিনির্ধিত্ব।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর স্বল্প উপস্থিতি নির্বহী (executive) ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সীমিত করে। বর্তমানে নারীর যথার্থ প্রতিনিধিত্বের অভাবে নিবহী অংশের উচুঁ স্তরে আদর্শ ও অঙ্গীকারে খুব প্রান্তিকভাবে নারী ইস্যুকে দেখা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বহুমুখী প্রতিবন্ধকতার ফলে নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা ও তার প্রকাশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে এবং তার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে সবক্ষেত্রে। বর্তমানে পুরুষের তুলনায় নারীর রাজনৈতিক তৎপরতার স্তর সাধারণত অপেক্ষাকৃত কম। বৈষম্য, নারীর নিজ মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী, পারস্পরিক দায়দায়িত্ব বিংবা এসব সম্মিলিত কারণ যাই হোক, আধুনিক গতিময় বহুত্ববাদী সমাজভিত্তিক দেশগুলিতে পুরুষ কর্মী ও কর্মচারী শ্রমিকের সংখ্যা আগের মতোই অনেক বেশী রয়ে যায়। এছাড়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্যয়িত মোট মেয়াদ, ব্যবসায়, পেশাদারী জীবন, অধিকতর মযর্দাকর পদ/চাকরি, আয়, প্রভাব, ও সেই সাথে নির্বাচনভিত্তিক লোক পদেও পুরুষের আধিপত্য ও প্রাধান্য বহাল থাকে।

৫.৪ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব

বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর সীমাবদ্ধ অবস্থানের আলোকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় নারীর উপস্থিতির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রয়োগ বা চর্চার প্রসঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার আলোকে রাজনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ক্ষমতার পরিমন্ডলে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমেই দেখা প্রয়োজন সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায়ে নারীর অবস্থান। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অবস্থান বলতে বোঝায় মন্ত্রী, অথবা সমপর্যায়, ডেপুটি অথবা এসিসট্যান্ট মন্ত্রী অথবা সমপর্যায়, সেক্রেটারী অব স্টেট অথবা পার্মানেন্ট সেক্রেটারী অথবা সমপর্যায়, এবং ডেপুটি অব স্টেট অথবা ডিরেক্টর অব গর্ভনমেন্ট অথবা সমপর্যায়। প্রধান নির্বাহির অর্ন্তভূক্ত হলো প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী, অর্থনীতির অর্ন্তভূক্ত হলো ফিন্যান্স/অর্থ, বাণিজ্য, শিল্প, এবং কৃষি মন্ত্রনালয়। সামাজিকের অর্ন্তভূক্ত হলো স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহায়ণ ও কল্যাণ মন্ত্রনালয়। রাজনৈতিকের অর্ন্তভূক্ত হলো পররাষ্ট্র, স্ব-রাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়।[১৮] সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায়ে নারীর অবস্থান তুলে ধরার জন্য নারীর রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান এবার ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

৫.৪.১ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হিসেবে নারী

রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছানোর মাধ্যম। রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষ অবস্থান হচ্ছে রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের পদ। সুতরাং এই পদে আসীন হতে সক্ষম হওয়া এক বিরাট অর্জন। নেতৃত্বের এই শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থানরত বিশ্ব নারী নেতৃত্বের চিত্র প্রথমেই দেখা প্রয়োজন। এই পর্যায়ের আলোচনায় বিশ্বের নারী প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিদের পরিচিতি সংক্ষেপে আলোচনায় আনা হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী নারী রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানদের রাজনীতিতে প্রবেশের ধরনও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

নারী প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি (১৯৪৫-২০০০)

সারণী: ৫.২ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হিসেবে শীর্ষ পর্যায়ে নারী (প্রধানমন্ত্রী)

প্রধানমন্ত্রী দলীয়-● নির্দলীয়-° *উত্তরাধিকারসূত্রে দলীয় প্রধান-☐			
এশিয়া	ইউরোপ	আফ্রিকা	আমেরিকা
১.☐শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে ২.●ইন্দিরা গান্ধী ৩.☐বেনজির ভুট্টো ৪.☐খালেদা জিয়া ৫.☐চান্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ৬.☐শেখ হাসিনা ৭.°ন্যান ওসোরাইন টুয়া[১৯]	১.●মার্গারেট থ্যাচার ২.°মারিয়া ডি. লর্ডেস পিন্টাসিলগো ৩.●গ্রো হারলেম ৪.●মিলকা প্ল্যানিক ৫.●কাজিমিরা দান্তে প্রুনস্কি ৬.°রেনেটা ইন্দোভা ৭.●জেনি শিপলে ৮.●ইরিনা ভেজুটাইন ৯.●হেলেন এলিজাভেদ ক্লার্ক[২১]	১.●এলিজাবেথ ডোমিশয়ন ২.●সিলভিয়া কিনিজি ৩.●আগাথা উইলিঙ্গিমানা ৪.°ক্লডেটি ওয়ারর্লি ৫.●জেনেট জাগান[২৩]	১.●কিম ক্যাম্পবেল ২.●ন্যারী ইগনিয়া চার্লস[২৫]

সারণী: ৫.৩ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হিসেবে শীর্ষ পর্যায়ে নারী (*রাষ্ট্রপতি*)

রাষ্ট্রপতি দলীয়-● নির্দলীয়-° *উত্তরাধিকারসূত্রে দলীয় প্রধান-□ মনোনীত-ρ			
এশিয়া	ইউরোপ	আফ্রিকা	আমেরিকা
১.□সুভদ্রিণ ইয়ানজানা	১.●লিডিয়া গুয়েলার টাজেডা	১.মারিয়া লিয়া পেভিদি	১.□মারিয়া এস্টেলা মার্টিনেজ ডি পেরন
২.□সং কুইঙলিং/ সাং চিং-লিং	২.°ভিগডিস ফিনাবোগেটির	২.●আগাথা বারবারা	২.●ভায়োলিয়া আরগেলা সিরানো
৩.□কোরাজন একুইনো-	৩.●স্যাবাইন বার্গমেন-পোল	৩.ρগ্লোরিয়ানা রেনোচিনি	৩.□মারিয়া এলিসা মসকোসো ডি এরিয়াস[২৩]
৪.□চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা	৪.ρমেরি রবিনসন	৪. ρকারমেন পেরেইরা	
৫.●গ্লোরিয়া অ্যারাও ম্যাকাউ[২০]	৫.ρমেরি ম্যাকএলিস	৫. ρআর্থা পাসকেল ট্রুলট	
	৬.●রুথ ড্রেফাস	৬.□ভায়োলেটা ব্যারিয়স ডি ক্যামারো	
	৭.●টারজা কারিনা হেলোনিন[২২]	৭.ρএডা সিকোলি	
		৮.ρপেট্রিসিয়া বুসিংন্যানি	
		৯.●সিলভিয়া কিনিজি	
		১০.রুথ পেরি-	
		১১.●জেনেট জেগান	
		১২.●রোসা জাফেরানি	
		১৩.°ভেইরা ভি কে-ফ্রেবারগা	
		১৪.●মারিয়া ডোমিনিকা [২৪]	

* উল্লেখ্য যে উত্তরাধিকার সূত্রে দলীয়প্রধান হলেও পরবর্তীতে এরা সবাই জাতীয় রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় অবস্থানে আসীন হয়েছেন এবং দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্বপালনরত নারীদের সর্ম্পকে আলোচনার পর এবার বৈশ্বিক পর্যায়ে বর্তমানে অবস্থানরত নারীদের চিত্র ।

সারণী: ৫.৪ রাষ্ট্র ও সবকাব প্রধান হিসেবে শীর্ষ পর্যায়ে নারীদের বর্তমান অবস্থান

দেশের নাম	নেত্রীর নাম	অবস্থান (পদ)
বাংলাদেশ	খালেদা জিয়া	সরকার প্রধান
ফিনল্যান্ড	তারজা হেলোনা	রাষ্ট্র প্রধান
আয়ারল্যান্ড	মেরী মাকালিস	রাষ্ট্র প্রধান
লাটভিয়া	ভায়রা ভিকে ফ্রীবারগা	সরকার প্রধান
পানামা	মিরেয়া মসকেসো প্রৱিয়াস	রাষ্ট্র প্রধান
সানমারিনো	মারিয়া ডোমিনিকা	রাষ্ট্র প্রধান(৬ মাস পর পরিবর্তন হয়)
শ্রীলংকা	চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা	রাষ্ট্র প্রধান
নিউজিল্যান্ড	জেনিফার শিপলে	সরকার প্রধান
ইন্দোনেশিয়া	মেঘবতী সুকর্ণীপুত্রী	সরকার প্রধান

সূত্র: ইউনাইটেড ন্যাশনস ম্যাপ, ডিসেম্বর ১৯৯৯।

উপরোক্ত সারণী বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বিশ্ব নেতৃত্বের শীর্ষ পর্যায়ে নারীর বর্তমান অবস্থান রাজনীতির ক্ষেত্রে লিঙ্গ অসমতার চিত্রের প্রকটতাকেই তুলে ধরে। এই সারণী থেকে যে চিত্র বেরিয়ে আসে তা হলো,

- পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হওয়া স্বত্তেও রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী নেতৃত্বের হার অত্যন্ত কম।

- পৃথিবীতে একশত ছিয়ানব্বই টি রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র নয়টি রাষ্ট্রে নারীরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন।

- এখানে উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের মত উন্নত রাষ্ট্র অপেক্ষা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতেই নারী নেতৃত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী।

সুতরাং বলা যায়, রাজনীতির শীর্ষ পর্যায়ে প্রচন্ড লিঙ্গ বৈষম্য যেমন সত্য, তেমনই আবার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি অপেক্ষা সীমিত আকারে হলেও নেতৃত্বমূলক অবস্থানে আসীন হতে সক্ষম হওয়া অবশ্যই কিছুটা প্রাপ্তি বা অর্জন।

৫.৪.২ রাষ্ট্র ও সরকার উপ প্রধান হিসেবে নারী

নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানের পদের পরেই আসে উপ-প্রধানের পদ। নেতৃত্বমূলক অবস্থানে নারীরা কতটুকু এগুতে পেরেছে তা দেখার জন্য শীর্ষ পদের গন্তব্যে পৌছাঁনোর জন্য নারীদের অগ্রগতি দেখা যেতে পারে।

সারণী: ৫.৫ বিভিন্ন দেশে বর্তমানে উপপ্রধান হিসেবে নারী নেতৃত্ব

দেশের নাম	উপপ্রধান হিসেবে নারী নেতৃত্ব
আলবেনিয়া	সরকার উপপ্রধান
অষ্ট্রিয়া	সরকার উপপ্রধান
বেলজিয়াম	রাষ্ট্র উপপ্রধান
ডেনমার্ক	সরকার উপপ্রধান
ফিজি	সরকার উপপ্রধান
হন্ডুরাস	সরকার উপপ্রধান
আয়ারল্যান্ড	সরকার উপপ্রধান
নেদারল্যান্ড	সরকার উপপ্রধান
ফিলিপাইনস	রাষ্ট্র উপপ্রধান
রিপাবলিক অব মোলডভা	সরকার উপপ্রধান
রাশিয়ান ফেডারেশন	সরকার উপপ্রধান
সুইডেন	সরকার উপপ্রধান
দ্যা ফাইভ অব মেসিডোনিয়া	রাষ্ট্র উপপ্রধান
উকারানি	সরকার উপপ্রধান
উজবেকিস্তান	সরকার উপপ্রধান
যুগোশ্লাভিয়া	সরকার উপপ্রধান

সূত্র: ইউনাইটেড ন্যাশনস ম্যাপ, N 4136 (দ্যা ওয়ার্ল্ড টু ডে) ডিসেম্বর ১৯৯৯।

সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে সতেরটি রাষ্ট্রে নারীরা রাষ্ট্র বা সরকারের উপ-প্রধানের পদে আসীন রয়েছেন।

৫.৪.৩ মন্ত্রীসভায় নারী

রাজনীতিতে শীর্ষস্থান অর্জন করতে হলে মন্ত্রীসভায় উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। অতীতের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, উচ্চ পর্যায়ের সরকারী পদে নারীদের কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৮৭ সালে ৯৩টি রাষ্ট্রে মন্ত্রী পর্যায়ে কোন নারী ছিলো না। অথচ ১৯৯৪ এর মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে কোন নারীর মন্ত্রী পর্যায়ে না থাকার সংখ্য ৫৯ এ নেমে এসেছে যা একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। ১৯৯৪ সনে বিশ্বে মাত্র ৫.৭ % নারী ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে ছিলো, কিন্তু সেটা ১৯৯৭তে এসে ৩.৩ এর চেয়ে কিছুটা উন্নত হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী মন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করা যায় নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যে।

লেখচিত্র: ৫.৬ বিশ্বব্যাপী মন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অবস্থান

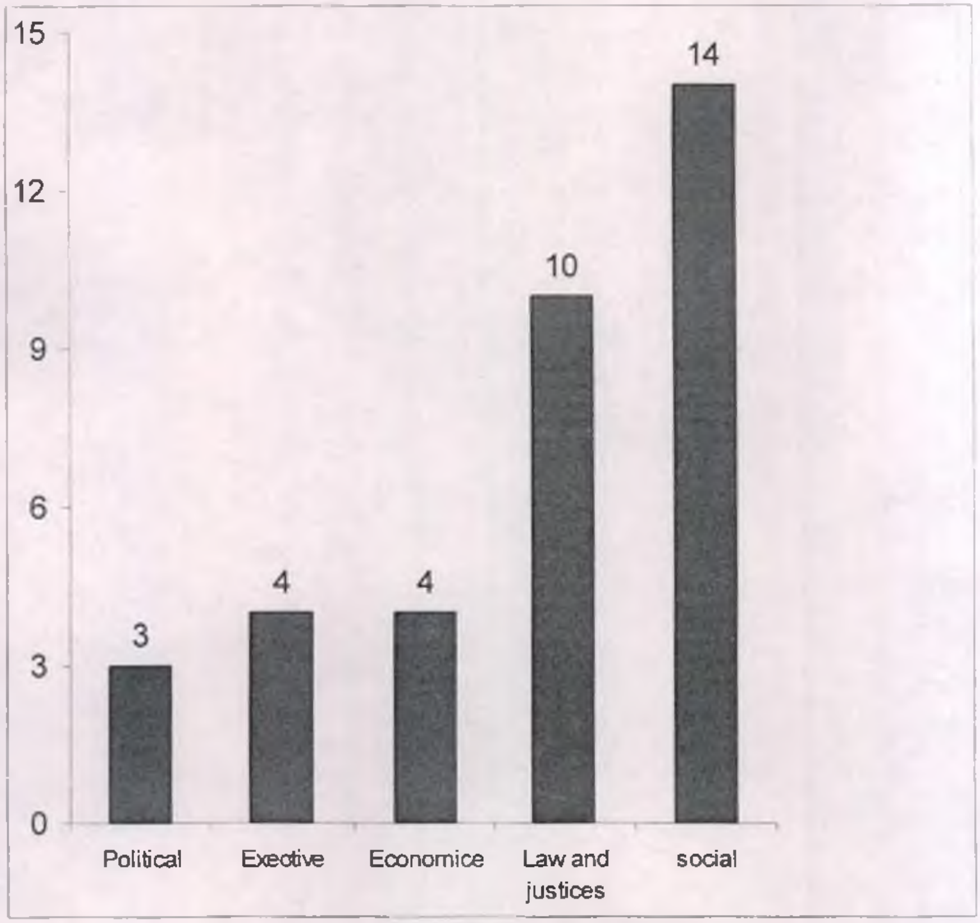

(Source: UN division for the Advancement of women, based on january 1996 information from World Wide Government Directory, Inc.)

বিশ্বব্যাপী নারীরা মাত্র ৭% মন্ত্রী পর্যায়ের পদ পূরণ করেছেন। এই অল্প হারের মধ্যে তারা আবার কেন্দ্রীভূত রয়েছেন সামাজিক বিভাগে (১৪%) যার অর্ন্তভূক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার। যেখানে রাজনৈতিক বিষয়ে মাত্র ৩% এবং এক্সিকিউটিভ ক্ষেত্রে মাত্র ৪%।অর্থনৈতিক ক্যাটাগরীতে নারীরা মাত্র ৪% মন্ত্রী পর্যায়ের পদ পূরণ করেছেন। আইন ও বিচার বিষয়ে তাদের অবস্থান কিছুটা ভালো যা ১০%।

নারীর অগ্রসরতা দেখার জন্য জাতিসংঘের ডিভিশন ফর দ্যা এডভান্সমেন্ট ফর উইম্যান তাদের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে জানুয়ারী ১৯৯৬ পর্যন্ত এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী সরকারে নারীর অবস্থান নিয়ে একটি ফ্যাক্ট শীট তৈরী করেছে। এতে দেখা যায়:

- বিশ্বে মন্ত্রী পর্যায়ে নারীর গড় - ৬.৮%
- বিশ্বে Sub-ministerial/ উপমন্ত্রী পর্যায়ে নারীর গড়- ৫.৭%
- বিশ্বে সর্বমোট- ৯.১%

বিশ্বব্যাপী মন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায় -

সারণী: ৫.৭ বিশ্বব্যাপী মন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অবস্থান

বিশ্বব্যাপী মন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অবস্থান

বিশ্বব্যাপী নারী মন্ত্রীর সংখ্যা ১৯৮৭ সালের ৩.৪ শতাংশ থেকে গত দশকে ১৯৯৬ সালে ৬.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

- ৪৮ টি রাষ্ট্রে কোন নারী মন্ত্রী নেই।
- মাত্র পাঁচটি রাষ্ট্রে ৩০শতাংশের 'ক্রিটিক্যাল মাস'/critical mass অর্জিত হয়েছে। রাষ্ট্রগুলো হল: বারবাডোস, ফিনল্যান্ড, লিচটেনষ্টাইন (Liechtenstein), সী-চিলিস (Sey-chelles) এবং সুইডেন।
- অতিরিক্ত দশটি দেশে মন্ত্রী পর্যায়ে ২০-২৯ শতাংশ নারী রয়েছেন। তারমধ্যে সাতটি ইউরোপ/অন্যান্য অঞ্চল -এন্ডোরা, অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, লুক্সেমবুর্গ, ন্যাদারল্যান্ডস এবং নরওয়ে- এবং ক্যারীবিয় থেকে তিনটি (গ্রেনেডা, হাইতি এবং সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনেডাইনস (Grenadines)।
- অন্য সকল রাষ্ট্রে ২০ শতাংশের কম নারী মন্ত্রী পর্যায়ে রয়েছে।
- নারী মন্ত্রীরা আইন/Legal (৯.৪%), অর্থনৈতিক/economic (৪.১%), রাজনৈতিক বিষয়ক (৩.৪%) এবং এক্সিকিউটিভ/executive (৩.৯%) প্রভৃতি বিষয়ের তুলনায় সামাজিক বিষয়াবলীতে/affairs (১৪%) বেশী কেন্দ্রীভূত হয়েছে।
- এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে এবং পূর্ব ইউরোপে ৫ শতাংশের কম নারীর মন্ত্রী পর্যায়ে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে খুব কম অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

সারণী: ৫.৮ বিশ্বব্যাপী উপ/প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অবস্থান

Sub- ministerial level-উপ-মন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অবস্থান

- ১৩৬ টি রাষ্ট্রে অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন ক্ষেত্রে নারীরা কোন মন্ত্রী পর্যায়ের অবস্থানে নেই।
- এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে সকল অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ে মাত্র ২ শতাংশ নারী মন্ত্রী রয়েছেন।
- বৈশ্বিক র্পায়ে সকল Sub- ministerial level-উপ-মন্ত্রী পর্যায়ে (ডেপুটি,পার্মানেন্ট সেক্রেটারী,এবং ডেপুটি,পার্মানেন্ট সেক্রেটারী) মাত্র ৯.৯% নারীদের অধিকারে রয়েছে।
- ক্ষেত্র অনুযায়ী ইউরোপ/ অন্যান্য এবং এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে নারীরা সামাজিক মন্ত্রণালয়গুলোতে নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশী প্রতিনিধিত্ব করছে, যখন আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারীবীয় অঞ্চলে নারীরা আইন মন্ত্রণালয়ে বেশী প্রতিনিধিত্ব করছে।
- ছয়টি রাষ্ট্রে Sub- ministerial level-উপ-মন্ত্রী পর্যায়ে ৩০ শতাংশের 'ক্রিটিক্যাল মাস'/critical mass অর্জিত হয়েছে। রাষ্ট্রগুলো হল: এন্ডোরা, এন্টিগুয়া ও বারবুডা, বাহামাস, কোস্টারিকা, সান মারিনো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- আট টি রাষ্ট্রে Sub- ministerial level-উপ-মন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অংশীদারিত্ব ২৫ শতাংশ বা তার চাইতে বেশীতে পৌছেঁছে। রাষ্ট্রগুলো হল: অস্ট্রেলিয়া, ডোমিনিকা, এল সালভেডর, মেসিডোনিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইনস, সুইডেন, এবং সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস।
- অতিরিক্ত সাতটি স্টেটে Sub- ministerial level-উপ-মন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অংশীদারিত্ব ২০ শতাংশ বা তার চাইতে বেশীতে পৌছেঁছে। রাষ্ট্রগুলো হল: বারবাডোস, কলম্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, গ্রেনেডা, গুয়াতেমালা, গায়ানা এবং নরওয়ে।

সূত্র: ওয়েবসাইট

৫.৪.৪ নারীর সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব

রাজনীতিতে সক্রিয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান যেমন জরুরী তেমনি, সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করার অন্যতম পথ হচ্ছে আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব। আইনসভায় অংশগ্রহণের সুযোগের মাধ্যমে শুধু যে শীর্ষ পর্যায়ে পৌছাঁনোর পথ সুগম হয় তাই নয়, বরং আইনসভায় যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়নে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ তৈরী হয় যার দ্বারা নারীরা আইনসভায় নিজেদের আশা-আকাঙ্খা তুলে ধরার মাধ্যমে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও লিঙ্গ সমতা স্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে। অতএব, আইনসভায় নারীর প্রতিনিধিত্বের গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বৈশ্বিক পর্যায়ে এ পর্যন্ত আইনসভায় নারীদের প্রতিনিধিত্বের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্বের চিত্রটি ছকের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে:

সারণী:৫.৯আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্ব (১৯৪৫-১৯৯৫)

বছর	১৯৪৫	১৯৫৫	১৯৬৫	১৯৭৫	১৯৮৫	১৯৯৫
আইনসভার সংখ্যা	২৬	৬১	৯৪	১১৫	১৩৬	১৭৬
নারী সদস্যদের %	৩.০	৭.৫	৮.১	১০.৯	১২.০	১১.৬
নারী সিনেটরের %	২.২	৭.৭	৯.৩	১০.৫	১২.৭	৯.৪

সূত্র:IPU

বৈশ্বিক পর্যায়ে আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্বের ধারাবাহিক চিত্রকে ইতিবাচকই বলা যায়, যদিও তা যথেষ্ট নয়। কারণ ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে আইনসভার সংখ্যা ২৬ থেকে ১৭৬-এ পৌচেঁছে, পাশাপাশি নারীর সদস্য সংখ্যার গড় ৩.০ থেকে ১১.৬ এ পৌছেঁছে। নারী সিনেটরের সংখ্যা দাড়িঁয়েছে ২.২ থেকে ৯.৪ এ। এই গতি অত্যন্ত মন্থর। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আইনসভাগুলোতে নারীদের অবস্থানের আলোকে এবার বর্তমান অবস্থানের চিত্রকে দেখা যেতে পারে।

সারণী: ৫.১০ আইনসভায় নারীর বর্তমান অবস্থান- বৈশ্বিক গড়

উভয় কক্ষ সমন্বয়ে	১৩.৮%			একক বা নিম্ন কক্ষ ১৩.৯%	উচ্চ কক্ষ বা সিনেট ১৩.৬%
মোট এমপি	৪০,১৯৬		মোট এমপি	৩৪,২৫৮	৫,৯৩৮
লিঙ্গভিত্তিক	৩৬,৫৩৬		লিঙ্গভিত্তিক	৩১,৩৭৩	৫,১৬৩
পুরুষ	৩১,৪৮২		পুরুষ	২৭,০১৯	৪,৪৬৩

নারী	৪,০৫৪			নারী	৪,৩৫৪	৭০০

সূত্র:ওয়েবসাইট: Women in Parliaments: World and Regional Averages, http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm

উপরোক্ত সারণী থেকে যে চিত্র বেরিয়ে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী আইনসভাগুলোতে নারীর গড় উপস্থিতি এখনো অত্যন্ত সীমিত। পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হওয়া স্বত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রস্থল আইনসভায় নারীর প্রতিনিধিত্ব উভয় কক্ষে ১১.৪%। একক বা নিম্নকক্ষে ১১.৭% এবং উচ্চকক্ষে ৯.৮% যা নারীর যথার্থ সম-প্রতিনিধিত্বের অবস্থান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে বলে স্পষ্ট হয়। বৈশ্বিক গড় দেখার পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলভেদে আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্বের হার লক্ষ্য করাও প্রয়োজন।

সারণী: ৫.১১ আইনসভায় নারীর বর্তমান অবস্থান (আঞ্চলিক গড়)

অঞ্চল	একক বা নিম্নকক্ষ	উচ্চ কক্ষ বা সিনেট	দুই কক্ষের সমন্বয়ে
নর্ডিক রাষ্ট্রসমূহ	৩৫.৯%		৩৫.৯%
ইউরোপ ওএসসিই নর্ডিক রাষ্ট্রসমূহ সহ	১৪.৩%	৯.০%	১৩.২%
আমেরিকা	১৩.৫%	১২.০%	১৩.২%
ইউরোপ ওএসসিই নর্ডিক রাষ্ট্রসমূহ বাদে	১২.৩%	৯.০%	১১.৫%
সাব-সাহারা আফ্রিকা	১১.১%	১৪.০%	১১.৩%
প্যাসিফিক/ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	১০.৮%	২১.৮%	১২.৭%
এশিয়া	৯.৭%	৯.৯%	৯.৭%

সূত্র: ওয়েবসাইট, IPU

উপরোক্ত সারণী থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের আইনসভায় নারীর প্রতিনিধিত্বের যে হার দেখা যাচ্ছে, তাতে অঞ্চলভেদে অবস্থার ভিন্নতাও স্পষ্ট হয়েছে। যদিও সাধারণভাবে

সামগ্রিক বিচারে নারীর প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থান যথেষ্ট ইতিবাচক নয়, তবে কোন কোন অঞ্চলে তুলনামূলক ভালো অবস্থান দেখা যাচ্ছে। নিম্নকক্ষে নারী প্রতিনিধিত্বের হার সবচেয়ে ইতিবাচক নর্ডিক অঞ্চলে (৩৫.৯)। প্যাসিফিক অঞ্চলে উচ্চকক্ষে নারী প্রতিনিধিত্বের হার উল্লেখযোগ্য (২১.৮)। অন্য সকল অঞ্চলে এই হার এখন পর্যন্ত বৃহত্তর মাত্রায় লিঙ্গ অসমতার চিত্রকেই তুলে ধরে।

৫.৪.৫আইনসভায় নারী স্পীকার

আইনসভায় স্পীকার পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক আসন। কিন্তু নারীরা কতটা সুযোগের অধিকারী হতে পেরেছেন এই পর্যায়ে পৌঁছাতে, তা জানা প্রয়োজন।

সারণী: ৫.১২ আইনসভায় নারী স্পিকার বা প্রেসিডেন্ট সংক্রান্ত তথ্য: (১৯৪৫ থেকে ১৯৯৮)

১৯৪৫ থেকে ১৯৯৮
বিশ্ব সংসদীয় ইতিহাসের ৫২বছরের মধ্যে ১৮৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র ৪১ টি রাষ্ট্রে যাদের আইনপরিষদ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে, মাত্র একবার বা একাধিকবার /তাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসে অন্য সময় আইনসভায় অথবা আইনসভার একটি কক্ষে প্রিসাইড করার জন্য একজন নারীকে নির্বাচিত করেছিল। সর্বমোট ৭৭ বার এটা ঘটেছিল।
এই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ১৭টি ইউরোপীয় রাষ্ট্র, আমেরিকার ১৯টি রাষ্ট্র, ৩টি আফ্রিকার রাষ্ট্র, একটি এশীয় রাষ্ট্র এবং প্রশান্তমহাসাগরীয়/প্যাসিফিকের একটি রাষ্ট্র। ২৪টি রাষ্ট্রে রয়েছে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নকক্ষের তুলনায় সিনেটে নারীদের বেশী প্রিসাইড করতে দেখা যায়।
২৪টি রাষ্ট্রে রয়েছে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নকক্ষের তুলনায় সিনেটে নারীদের বেশী প্রিসাইড করতে দেখা যায়।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে অষ্ট্রেলিয়া একমাত্র রাষ্ট্র যারা তাদের আইনসভার একটি কক্ষে প্রিসাইড করার জন্য একজন নারীকে নির্বাচিত করেছিল।

সূত্র: Website: International IDEA Women in Politics, http://www.idea.int/women/parl/ch2b.htm

সারণী: ৫.১৩ আইনসভায় নারী স্পিকার বা প্রেসিডেন্ট (১ জানুয়ারী ১৯৯৮)

১ জানুয়ারী ১৯৯৮
১৭৭টি বর্তমান আইনসভার মধ্যে ৬৩টি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট।
আইনসভার ২৪০টি বর্তমান কক্ষের মধ্যে মাত্র ১৮ জন নারী সভাপতিত্ব করছেন।
আইনসভাগুলোতে নারী স্পিকার রয়েছেন ৭.৫%

সূত্র: Website: International IDEA Women in Politics, http://www.idea.int/women/parl/ch2b.htm

সারণী: ৫.১৪ বর্তমানে কর্মরত নারী স্পিকারের তালিকা (১০ আগষ্ট ২০০০ পর্যন্ত)

রাষ্ট্র	আইনসভায় যে সব কক্ষে নারী স্পীকার
এন্টিগুয়া এ এন্ড বারমুডা	হাউস অব রিপ্রেসেনটেটিভ এবং সিনেট
অষ্ট্রেলিয়া	সিনেট
বাহামাস	হাউস অব এসেম্বলী
ক্রোয়েশিয়া	হাউস অব জুপানজী
ইথিওপিয়া	ফেডারেল কাউন্সিল
ফিনল্যান্ড	ইত্তুসকার্ন্ট রিকসড্যাগ
জার্মানী	বুন্ডেসটাগ
গুয়াটেমালা	কংগ্রেসো ডি লা রিপাবলিকা
জ্যামাইকা	হাউস অব রিপ্রেসেনটেটিভ এবং সিনেট
মাল্টা	হাউস অব রিপ্রেসেনটেটিভ
নরওয়ে	স্টরটিংগেট
পোল্যান্ড	সিনেট
দক্ষিণ আফ্রিকা	ন্যাশনাল এসেম্বলী
সুরিনামে	ন্যাশনাল এসেম্বলী
সুইডেন	রিকসড্যাগান
যুক্তরাজ্য	হাউস অব কমন্স
বেলিজ	হাউস অব রিপ্রেসেনটেটিভ এবং সিনেট
কোষ্টারিকা	এসেম্বলিয়া লেসিসলাটিভা
ডোমিনিকা	হাউস অব এসেম্বলী
ডোমিনিকান রিপাবলিক	কামারা ডি ডিপুটেডস
ইন্ডিয়া	কাউন্সিল অব দ্যা স্টেটস
লেসেথো	ন্যাশনাল এসেম্বলি
মেক্সিকো	কামারা ডি সিনাডোরস
নেদারল্যান্ডস	সেকেন্ড চেম্বার
সান মারিনো	কনসিগলিও গ্রান্ডি জেনারেল
স্পেন	কংগ্রেসো ডি লাস ডিপুটেডসএন্ড সনাডো
চেজ রিপাবলিক	সিনেট

সূত্র: website: Women Speakers of Parliaments, http://wmn-e/speakers.htm, 12.9.2000.

দেখা যাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনসভায় অতীত থেকে এ পর্যন্ত নারী স্পিকারের সংখ্যা নিতান্তই অ-প্রতুল। আইনসভায় যেখানে আইন প্রনয়ণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদিত হয়, সেখানে সভাপতিত্ব করার মাধ্যমে একজন নারী অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ইস্যুতে প্রয়োজনীয় আলোচনা ও বির্তক উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করে নারীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আইনসভার বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব এখনো পর্যন্ত খুবই সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। আইনসভায় নারীর এই স্বল্প উপস্থিতি নীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে নারীদের দূরে সরিয়ে রেখেছে যা তাদের যর্থাথ অংশীদারীত্ব প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন অর্জন থেকে বিশ্বকে পিছিয়ে রেখেছে। তবে, বহুমুখী প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েও নারীরা যতটুকু প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে পেরেছে তা আগামী দিনের সম্ভাবনাকে তুলে ধরে।

৫.৫ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অভ্যূদয় ও সীমাবদ্ধ অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে রাজনীতিতে নারীর মূল্যায়নযোগ্য অবস্থান তৈরী এবং নেতৃত্বমূলক পর্যায়ে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে তার প্রেক্ষাপট জানা প্রয়োজন। রাজনৈতিক পরিমন্ডলের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের উপস্থিতির আলোকে বলা যায় যে, বর্তমানে রাজনীতি একেবারে নারীশূণ্য অবস্থায় নেই। স্বল্প পরিসরে হলেও নারীরা রাজনীতিতে নিজেদের জন্য স্থান করে নিয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে বিভিন্ন অবস্থার আলোকে নারীরা এই অগ্রসরতা অর্জন করতে পেরেছে।

মূলত: বিশ্বব্যাপী নারী নেতৃত্ব ও নারী শক্তির প্রভাব আশির দশকের শুরুতে নতুন মাত্রা পেয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিশ্ব মানুষ নতুন নেতৃত্ব ও নয়া রাজনৈতিক দর্শনের সন্ধান করেছে। বিশ্ব মানবাধিকার দলের অন্যতম পর্যবেক্ষক জো বয়ানের অভিমত হচ্ছে এ দশকের রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীদের উত্থানের মূলে কয়েকটি কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ এবং অসন্তোষ। পুরুষের চেয়ে নারী আলাদা ভাবনার

ধারক। এ কারণেই তারা গতানুগতিক নয়, বরং সব দিকেই সুন্দর। বিশ্বব্যাপী মানুষের পরিবর্তনের কাঙ্খিত এই সূত্রই নারী কর্তৃত্ব ও নারী নেতৃত্বকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রতিকূলতার ভেতরেও তারা সফলতার দুয়ারে পৌছেঁ গেছে। রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়ে কোন নেত্রী ব্যর্থ হয়েছেন সারা বিশ্বে সে দৃষ্টান্ত নেই।[২৭] রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন বৈচিত্রে কর্মচঞ্চল প্রতিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই নারী কতৃর্ত্ব ও ভাবনার বিকাশ ঘটছে বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এখন অভিমত দিচ্ছেন। এঁদের মতে নারীরা মনোযোগী এবং পুরুষের চেয়ে সৎ ও ভালো।

মানবাধিকার পর্যবেক্ষক জো বয়ানের যুক্তি হচ্ছে: নারীরা স্পষ্ট করেই নিবার্চনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রে তারা পুরুষের থেকে আসলেই দায়িত্ববান এবং সততার পরিচয় দেয়। শরীরের যত্ন এবং শিশুর লালন পালনে মেয়েরা বেশী মনযোগী। এক্ষেত্রে পুরুষেরা একদমই পিছিয়ে।

দ্বিতীয় কারণ সর্ম্পকে তিনি বলেছেন, সম্ভবত: এটিও হতে পারে - সমাজ বদলের আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ায় মুক্তবাজার অর্থনীতি নির্ভর সমাজ গড়ে উঠেছে দেশে দেশে। সনাতনী বিপ্লবী রাজনীতিকরা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানে মোটা বেতনের চাকরি নিয়ে সরে পড়েছে। আর সেই শূণ্য জায়গায় ও রাজনৈতিক নারীর নেতৃত্বের বিকাশ ঘটছে।

তৃতীয়ত: ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ আয়োজিত নারী অধিকার সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে গৃহীত নীতিগুলো নারী জাগরণকে ধীরে ধীরে আরো সংহত করেছে। ১৯৭৫, ৮০, এবং ৮৫ সালের জাতিসংঘ আয়োজিত পর্যায়ক্রমিক সম্মেলনের প্রেক্ষিতই বিশ্বনারীকে রাজনৈতিক ভূমিকায় সরব করে তোলে।[২৮]

ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সোরেনসনের অভিমত হচ্ছে, বিশ্ব নারী নেতৃত্ব উত্থানে যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকাটাই বড়। একটি দেশের নারীদের রাজনীতিতে উত্থানের খবর দ্রুত পৌছেঁ যাবার সঙ্গেই হাজার বছরের অবহেলিত নারীর বর্তমান উত্তরাধিকার উদ্বেলিত হয়। নতুন রাজনৈতিক ধারায় তারাও তখন ক্ষমতার রাজনীতিতে হয়ে ওঠে সক্রিয়। এছাড়া উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারও পুরুষের পেশী শক্তির পরিবর্তে কর্মক্ষেত্রে নারীর অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করেছে। আধুনিক কম্পিউটার ও অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্যশীল ও কর্মে উদ্দীপ্ত সততায় নারী শ্রমশক্তিকে এখন অনিবার্য করে তুলছে।[২৯] দ্বিতীয় বিশ্বোযুদ্ধোত্তর ইউরোপে নারীবাদী আন্দোলন সারা বিশ্বে নারীদের ক্ষেত্রে

রাজনৈতিক অভ্যুদয় ঘটায়। ১৯৭০ সালে এই রাজনৈতিক নারী তার কর্মকান্ডের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করেছে। রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরে তাদের অবদান ও পরিচালনা দক্ষতা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আশির দশকের শেষ থেকে নব্বই দশকের শুরুতে বিশ্ব নারী নেতৃত্বের উত্থান এ শতকের সবচেয়ে বড় ঘটনা। সমাজ ও রাষ্ট্রসহ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি প্রবাহে নারীর রাজনৈতিক ভূমিকা এ সময় ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। পৃথিবীর দেশে দেশে আত্মনির্ভরশীল প্রতিভাবান রাজনৈতিক নারী নেতৃত্বের দক্ষতা রাষ্ট্র ও সমাজ প্রগতিকে আরো প্রবল করে তোলে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্ব নারীর অগ্রগতি ও রাজনেতিক নারীর নেতৃত্ব গত দশকগুলো থেকে এ দশকে আরো সংহত হয়েছে। বিশ্ব সনদের প্রতিটি দফাতেই এখন বিশ্ব নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রেক্ষাপট নতুন অগ্রগতির পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটেছে যৌক্তিক কারণসমূহের উপস্থিতিতে, যেগুলো কখনো এককভাবে আবার কখনো সম্মিলিতভাবে ভূমিকা রেখেছে নারীর অগ্রসরতায়। এবং এই এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা এখনো বর্তমান।

পরিশেষে বলা যায়, এই অধ্যায় ছিল মূলত রাজনীতির পরিমন্ডলে নারীর অবস্থান সংক্রান্ত বাস্তবতা তুলে ধরা। এই অধ্যায়ের আলোচনায় একদিকে যেমন রাজনীতিতে নারীর বর্তমান সীমাবদ্ধ অবস্থানের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা হয়েছে তেমনি ব্যাপক হারে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিকতাও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে রাজনীতির বিভিন্ন স্তরে নারীদের সীমিত প্রতিনিধিত্বের চিত্র তুলে ধরে লিঙ্গ বৈষম্যমূলক রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বাস্তবতা স্পষ্ট করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, যা পরবর্তীতে সপ্তম অধ্যায়ের আলোচনায়ও সাহায্য করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

তথ্য নির্দেশিকা:

১.নাজমা চৌধুরী সম্পাদিত, *রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ: প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা,* উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪ ।

২.রিটা মে কেলী ও মেরী বুটিলিয়ার রচিত ও নুরুল ইসলাম খান অনুবাদিত *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়-সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও ভূমিকা-দ্বন্দ্বের সমীক্ষা,* পৃ.৪৯ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১ ।

৩.পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২ ।

৪.Dilara Chowdhury "Women's Participation in the Formal Structure and Decision-Making Bodies in Bangladesh,'' p.5;, *Empowerment of Women-Nairoby to Beijing (1985-1995),* Edited by Roushan Jahan *et.al*, Women for Women, 1995, Bangladesh.

৫.Rehman Sobhan, *Planning and public action for Asian women*, University Press Ltd., 1992.

৬. Dilara Chowdhury, op.cit, P.5.

৭. রবার্ট এ. ডাল রচিত ও মঈনউদ্দীন আহমেদ অনুবাদিত,*আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা বিশ্লেষণ,* বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

৮.রিটা মে কেলী ও মেরী বুটিলিয়ার রচিত ও নুরুল ইসলাম খান অনুবাদিত *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়-সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও ভূমিকা-দ্বন্দ্বের সমীক্ষা,* বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

৯.রবার্ট এ. ভাল রচিত ও মঈনউদ্দীন আহমেদ অনুবাদিত, পূর্বোক্ত।

১০.পূর্বোক্ত

১১.সেলিনা ওমরাও খান, "বিশ্ব নেতৃত্বে নারী", *সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ৩১ জুলাই, ১৯৯৩।

১২.Barbara j. Nelson and Najma Chowdhury eds., *Women and Politics worldwide.* Yale University Press, New Haven & London, 1994.

১৩. নাজমা চৌধুরী সম্পাদিত, *রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ: প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা,* পূর্বোক্ত, পৃ.১৬০-১৬১

১৪. নাজমা চৌধুরী সম্পাদিত, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ: প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, পূর্বোক্ত।

১৫.Website:"women in Politics: Beyond Numbers- women in Parliaments: Beyond Numbers- Obstacles to Women's Participation in Parliament'', *International IDEA Women in Politics,* http://www.idea.int/women/parl/ch2a.htm, 12.9.2000.

১৬.সালমা খান, নিবন্ধ: রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী-সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা, *দৈনিক প্রথম আলো,* ৪ নভেম্বর, ২০০০।

১৭. Website:"women in Politics: Beyond Numbers-women in Parliaments, op.cit.

১৮.The World's Women 1995- Trends and statistics

১৯.Website:''Women prime Ministers: 1945-2000", *Women primeMinisters.*http://www.terra.es/personal12/monolith/00women3.htm, 14.1.2000.

২০. Website: "women Presidents, 1945-2001'', *Women Presidents*, http://www.terra.es/personal12/monolith/00women2.htm, 4.2.2001.

২১. Website:''Women prime Ministers: 1945-2000", op.cit.

২২. Website: "women Presidents, 1945-2001''op.cit.

২৩. Website:''Women prime Ministers: 1945-2000", op.cit.

২৪. Website: "women Presidents, 1945-2001'', op.cit.

২৫. Website:''Women prime Ministers: 1945-2000", op.cit.

২৬. Website: "women Presidents, 1945-2001'', op.cit.

২৭. সেলিম ওমরাও খান, ''বিশ্ব নেতৃত্বে নারী'', পূর্বোক্ত।

২৮.পূর্বোক্ত

২৯.পূর্বোক্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী: অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের সীমাবদ্ধতা

৬.১ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতার কারণ

৬.২ নারী রাজনীতিকদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি

৬.৩ রাজনৈতিক দলসমূহে নারীর অবস্থান

৬.৩.১ দলগুলোর মূলনীতি ও নির্বাচনী ইশতিহারে নারী

৬.৩.২ রাজনৈতিক দলগুলোর কাঠামোতে নারী

৬.৩.৩ রাজনৈতিক দলের মতাদর্শে নারী ও দলীয় ভূমিকা

৬.৪ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় নারী: তথ্য ও বিশ্লেষণ

৬.৪.১ সরকারপ্রধান হিসেবে নারী

৬.৪.২ মন্ত্রীসভায় নারী

৬.৪.৩ জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব: সরাসরি ও সংরক্ষিত আসন

৬.৪.৪ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী

৬.৫ নারী আন্দোলন ও রাজনীতিতে ভূমিকা

৬.৬ রাজনীতিতে নারীর অগ্রসরতায় সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা- প্রাসঙ্গিক ভাবনা

৬.৬.১ নারী সরকার প্রধানদের ভূমিকা বিশ্লেষণ

৬.৬.২ নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধির প্রবণত

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রাজনীতিতে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ এই গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে ম্যাক্রো লেভেলে রাজনীতিতে নারীর অবস্থানের প্রকৃতি বিশ্লেষণের পর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর ভূমিকা ও কার্যকারিতা আলোচনা করা হচ্ছে উন্নয়ন ও রাজনীতির সম্পৃক্ততা স্পষ্ট করার জন্য। এই অধ্যায়ের আলোচনা পরিব্যাপ্ত হয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে শুরু করে বর্তমানের রাজনৈতিক পরিবেশে নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। রাজনীতিতে নারীর সঠিক অবস্থান পর্যালোচনার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকল দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে নারীর রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার আলোকে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের নারীরা কোন পর্যায়ে আছে তার তুলনামূলক একটি চিত্র তুলে ধরাও এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষে সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৬.১ রাজনীতিতে নারীর সীমাবদ্ধ অবস্থানের কারণ

রাজনৈতিক শক্তি হলো সমাজের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রধান চাবিকাঠি। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হলো ক্ষমতা কাঠামোয় প্রবেশাধিকার অর্জনের উপায়, যেখানে জনগণের জন্য সম্পদের বরাদ্দ এবং সমাজের অন্যান্য ইস্যু সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নারীদের জন্য বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাড়াঁয় কারণ সমাজে নারীদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য এটি অন্যতম প্রধান কার্যকর হাতিয়ার। রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে বিবেচনা করা যায় জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে নারীর মর্যদার অন্যতম প্রধান নির্ধারক হিসেবে।[১] সুতরাং নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু রাজনীতির অঙ্গনে নারীর অসম প্রতিনিধিত্ব তাদের পশ্চাৎপদ অবস্থানের চিত্রকেই তুলে ধরে। তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণের হার নিতান্তই অপ্রতুল। ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় দেখা যায়, স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে যেমন, তেমনি জাতীয় রাজনীতির ক্ষমতার পরিমন্ডলে নারীর অবস্থান প্রান্তিক। এই পশ্চাৎপদ অবস্থানের পেছনে সমাজ কাঠামো গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক মুল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পিতৃতান্ত্রিক ধারা সমাজের সম্পদ, উৎপাদনের মাধ্যম, নারীর শ্রম ইত্যাদির উপর পুরুষের কর্তৃত্বের বৈধতা স্বীকার করে। এ ধরনের সমাজে নারী-পুরুষের

সম্পর্ক অধস্তনতা ও কর্তৃত্ব, নির্ভরশীলতা ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে নির্ধারিত। সনাতন সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা অধস্তন ভূমিকা পালন করে থাকে অর্থাৎ তাদেরকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ধরা হয়। সমাজ নির্মাণে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ যে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য দরকার এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে সহজভাবে গ্রহণ করা হয় না।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ মহিলাদের ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। ম্যাককরম্যাক বলেছেন যে, মহিলারা তিনটি কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে না- (১) সামাজিকীকরণে ভিন্নতা, (২) কম শিক্ষিত এবং (৩) হীনমন্যতা বা সনাতন মনোভাব যা সংস্কার থেকে সংক্রমিত হয়।[২]

প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনৈতিক অসচেতনতা ও সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাবে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাধাঁগ্রস্থ হয়। পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ও মূল্যবোধের কারণে নারীর অত্যন্ত কাছের মানুষ স্বামী, বাবা ও ভাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার রাজনৈতিক কর্মকান্ডে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে বাধাঁ দেন প্রচন্ডভাবে। ফলে পারিবারিক বাধাঁ উপেক্ষা করে সঙ্গত কারণেই সম্ভব হয়ে ওঠেনা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক অংশগ্রহণ। ব্যাপক নিরক্ষরতা ও শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা ফলে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, আত্মমুখীনতা তাদের পেয়ে বসে। ফলে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতার মতো উন্নততর চেতনাবোধ তাদের মাঝে সঞ্চারিত হতে পারে না। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকে অনেক শিক্ষিত নারীও পুরুষের কাজ বলে মনে করেন।

অর্থাৎ সামাজিকীকরণ তথা বিশেষভাবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক শক্তি হিসেবে কাজ করে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়,'interaction between social system and and individual whereby both predisposition for and skills relating to participation in the political sphere in internalised' (Flora and Lynn, 1974)। এই দৃষ্টিভঙ্গী নারীর রাজনৈতিক আচরণ ও অর্জিত ক্ষমতা (aptitude) গঠনে সামাজিকীকরণের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করে। অনুমান (assumption) হলো এই যে, রাজনৈতিক অভিষেক সুচিত হয় ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ ভূমিকার প্রেক্ষিতে এবং এইসব মৌলিক ভূমিকা নীতিগতভাবে মূলত: শৈশবেই গড়ে ওঠে।[৩] ফলে রাজনীতিব প্রতি নারীদের অ-প্রিয়

দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে যা বৃহত্তর পর্যায়ে সমস্যা তৈরী করে। এটি নারীদের রাজনৈতিক কার্যক্রমকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে।

এছাড়া অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বর্তমানে সকল নির্বাচনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় বলে নারীর প্রার্থিতা বিবেচনা করা হয় না। বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা একটি প্রধান বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণা (এন্ডারসন, ১৯৭৫, ওয়েলস, ১৯৭৭) দেখিয়েছে যে, নির্দিষ্টভাবে বাড়ীর বাইরের কর্মসংস্থান এর সঙ্গে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নাটকীয় যোগাযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে নারীর নিম্নপর্যায়ের অর্থনৈতিক মর্যদা তৈরী হয় পুরুষের তুলনায় শ্রমশক্তিতে তার নিম্নহারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। রাষ্ট্র ও সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ সুবিধায় তাদের অসম প্রবেশাধিকার যা আবার সর্ম্পকযুক্ত প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণে অসম সুযোগের ক্ষেত্রে যার ফলে নারীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই নির্ভরশীলতা নারীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রায় অংশগ্রহণের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান কারণ।[৪]

নারীর প্রতি বিরূপ সামাজিক পরিবেশে রাজনৈতিক দলগুলোতে সমাজে বিরাজমান পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গী ও মুল্যবোধ, নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া পড়ে। ফলে দেখা যায় রাজনৈতিক দলগুলোতে যে স্বল্প সংখ্যক নারী কর্মী ও সংগঠক সক্রিয়ভাবে কাজ করেন তাদেরকেও অধিকাংশ সময় বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়।এছাড়াও সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাবে কালো টাকা, মস্তান ও সন্ত্রাসী পোষার তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই পরিবেশে নারী রাজনৈতিক কর্মীদের অবস্থান নেয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এছাড়া রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক দল ও তাদের অনুসারীদের নারী বিরোধী প্রচারণা নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধাঁ। রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী থাকতে পারে না এ ধরনের অপপ্রচার নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অত্যন্ত প্রতিকূল।

৬.২ নারী রাজনীতিকদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি

খালেদা সালাহউদ্দীন তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, আমাদের দেশের নারী রাজনীতিকরা সাধারণত মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন। তারা এসেছেন সমাজের অগ্রসর অংশ থেকে। ১৯৭৪ সালের জরীপে দেখা গেছে তাদের অধিকাংশই এসেছেন বিত্তবান পরিবার থেকে যাদের রয়েছে বৃহত্তর রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং যাদের উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা রয়েছে। যখন তাদের পারিবারিক উৎসাহের কথা জানতে চাওয়া হয়, তখন তারা সবচেয়ে বেশী উল্লেখ করেন স্বামীর নাম।[৫]

পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে নারী রাজনীতিক শীর্বক একটি জরীপে (চৌধুরী ১৯৮১) দেখা যায়, ২৫ শতাংশ উত্তরদাতার নিজস্ব অর্থ উর্পাজনের উৎস হিসেবে নিজস্ব জমি/ কৃষি সংক্রান্ত সম্পত্তি (real estate) রয়েছে। ৪৬ শতাংশের নিজস্ব কোন পেশা নেই, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জমির মালিকানা রয়েছে/ অথবা শহর বা প্রায় শহর এলাকায় বসবাসের বাড়ী রয়েছে। এবং অবশিষ্ট ২৯ শতাংশ (একজন ব্যতীত) উত্তরদাতা শিক্ষকতা, আইন ব্যবসা বা ব্যবসাকে তাদের পেশা হিসেবে উল্লেখ করেছে। তাদের পিতা/স্বামীদের এই আর্থ-সামাজিক পটভূমি থেকে বলা যায় যে, আমাদের নারী সাংসদরা সাধারণভাবে এলিটভূক্ত প্রাচুর্য্যসম্পন্ন শ্রেণী থেকে এসেছেন। এই জরীপ পরবর্তীতে দেখায় যে, এইসব নারী রাজনীতিকদের একটি বৃহৎ অংশই দল/ সংসদে নতুন প্রবেশ করেছে কোনরকম পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া। জরীপ থেকে আরো দেখা যায় যে, ৬৬ শতাংশের বয়স ৪০ এর নীচে। এটা নির্দেশ করে যে, আমাদের নারী রাজনীতিকদের দীর্ঘ সময়ের রাজনীতি ও দলীয় কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা নেই। দলীয় কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা সামাজিক কর্মকান্ডের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতই নারীদের রাজনীতিতে প্রবেশের ভিত্তি। পরবর্তীতে এর আলোকেই নারীদের মন্ত্রীপরিষদে নারী বিষয়ক, সমাজকল্যাণ বিবয়ক, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত করা হয়, যেগুলো সাধারণত: কল্যাণমূলক বিষয় বলে পরিচিত। নারী রাজনীতিকদের মধ্যে আরেকটি ছোট গ্রুপ রয়েছে যারা জীবনের শুরুতেই রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। তারা কলেজ জীবনে ছাত্র রাজনীতিতে ছিলেন এবং সেই আগ্রহ ধরে রেখেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। এখান থেকে তারা তাদের আদর্শভূক্ত অভিভাবক রাজনৈতিক দলে অর্ন্তভূক্ত হন। এই

নারীরা অন্য গ্রুপের তুলনায় অধিক রাজনৈতিক সক্রিয়তা দেখাতে পারেন। দলীয় সংগঠনেও তারা বেশী প্রভাব স্থাপন করতে পারেন।[৬]

৬.৩ রাজনৈতিক দলসমূহে নারীর অবস্থান

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঐতিহাসিকভাবে সকল রাজনৈতিক দল ও আদর্শ পুরুষতান্ত্রিক। দলের ঘোষণাপত্র বা গঠণতন্ত্রের কোথাও নারীর প্রেক্ষিত বা সমতার ইস্যুটি যথাযথ স্থান পায়নি- প্রধান সবগুলো দলেই রাজনীতি ও প্রশাসনে নারীর ভুমিকা অনুল্লেখ্য- নারীকে শুধু প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসেবে, বেনিফিশিয়ারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সবচেয়ে হতাশার বিষয় হলো, মূল রাজনৈতিক দলগুলোর ইলেকশন মেনিফেষ্টো বা নির্বাচনী ঘোষণাপত্রেও নারী ইস্যুটি একটি প্রান্তিক ইস্যু হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।

৬.৩.১ দলগুলোর মূলনীতি ও নির্বাচনী ইশতিহারে নারী

❒ *আওয়ামী লীগ*

জাতীযতাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, নর-নারী ও ধর্ম- বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান আওয়ামী লীগের দলীয় আর্দশের কিছু দিক। শর্তসাপেক্ষে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স্ক ব্যাক্তি সদস্য পদ লাভ করতে পারবে। দলের কর্মকর্তাদের মধ্যে গঠনতন্ত্রের ২৩ (ঘ) ধারা মতে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ প্রধান পদাধিকার বলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা হবেন। তিনি সংগঠনের একটি মহিলা ফ্রন্ট গঠন করে সারা দেশের মহিলাদের সদস্যভূক্ত করবেন। মহিলা সম্পাদিকা নারী জাতির বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে এবং সেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নীতি ও উদ্দেশ্য প্রচার করবেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের মূলনীতিতে নারী সর্ম্পকে বলা হয়েছে-

১. সমাজের প্রতিটি নাগরিকের নুন্যতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২. জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সম্পদ বন্টনে সমান উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা ও নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম-অধিকার

নিশ্চিতকরণ ও নারী নির্যাতিনের পথ বন্ধকরণ। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সাধন, চাকুরী ক্ষেত্রে পুরুষের সমান বেতন প্রদান এবং মেধানুসারে ও যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকুরীতে তাদের সম অধিকার দান।[৭]

এই আর্দশ এবং মূলনীতি নিয়ে আওয়ামী লীগ '৯১ ও ৯৬ এর সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ২০০১ এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতিহারে নারী সর্ম্পকে যে বক্তব্য রেখেছে তা হলো:

ক. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নারী-পুরুষের সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারে বিশ্বাসী। সুতরাং নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় বাস্তবায়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপে আর্ন্তজাতিক উদ্যোগের বাস্তবায়নের ব্যাপারেও ইতিবাচক অঙ্গীকার করা হয়েছে।

খ. নারীদের শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এবং জাতীয় উন্নয়নের উপযুক্ত অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

গ. জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা দ্বিগুন অর্থাৎ ৬০টি করা হবে। জাতীয় সংসদের প্রতি ৫টি সাধারণ আসন নিয়ে একটি সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনী এলাকা গঠিত হবে এবং সরাসরি নির্বাচন হবে।[৮]

❐ *বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)*

এই দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে নারী সমাজ ও যুব সম্প্রদায়সহ সকল জনসম্পদের সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক সদ্ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। দলে একজন মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা এবং জাতীয় কাউন্সিলে প্রতি জেলা ও নগর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত হবে দুইজন মহিলা সদস্য। জাতীয় নির্বাহী কমিটির ১৪০ জন সদস্যের মধ্যে শতকরা ১০% মহিলা সদস্যের কথা বলা হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী দলের ঘোষণাপত্রে নারী সমাজের সার্বিক মুক্তি ও প্রগতির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে মহিলা বিভাগ, সমাজ কল্যাণ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, কুটির শিল্প, মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নারী সমাজকে উৎপাদনমুখী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করার প্রচেষ্টার কথা।[৯]

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২০০১ সালের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে উল্লেখ আছে-

ক. দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারী সমাজকে সম্পৃক্তকরণ এবং নারীদের ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য কর্ম সংস্থানমুখী প্রকল্প গড়ে তোলা।

খ. গ্রামীন নারী ও কর্মজীবি নারীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

গ. সংসদে নারীদের কার্যকর ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য তাদের আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।[১০]

❒ *জাতীয় পার্টি*

জাতীয় পার্টির নীতি ও আদর্শের মধ্যে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ইসলামী আদর্শ ও সকল ধর্মের স্বাধীনতা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সামাজিক প্রগতি তথা অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলা হয়েছে। এ দলের ১০ টি মুলনীতির মধ্যে নারী বিষয়ে কোন মূলনীতি নেই। তবে কর্মসূচীর ক্ষেত্রে যে সব পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে নারী শিক্ষার প্রসার, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান মর্যদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং পেশাজীবি মহিলাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।[১১]

জাতীয় পার্টির ২০০১ সালের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে পৃথকভাবে নারীর ক্ষেত্রে শুধু দুটো বিষয়ে বলা হয়েছে:

ক. সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩০ থেকে ৬৪টিতে উন্নীত করা হবে।

খ.নারী অধিকার সুরক্ষার জন্য পারিবারিক আদালতের কার্যকারিতা অধিকতর শক্তিশালী করা হবে।[১২]

❒ *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ*

আল্লাহ এবং নবীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনে বিশ্বাসী এই দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে আল্লাহ ও রসুল প্রদত্ত জীবন বিধান কায়েম করা। জামায়াতে ইসলামীর নারী সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের মতোই নির্ধারিত কর্তব্য হিসেবে আরও পালন করতে হবে-

১. নিজের স্বামী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, এবং পরিচিত ও অপরিচিত অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে জামায়াতের আকীদা ও উদ্দেশ্য পেশ করে তা কবুল করার জন্য আহবান জানাবে।

২.নিজের সন্তান সন্ততিকে ইসলামের অনুসারী বানাতে চেষ্টা করবে।

৩. তার স্বামী ও আত্মীয় স্বজন যদি জামায়াতে শামিল হয়ে থাকে তাহলে সে আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে তাদেরকে আশাবাদী ও সাহসী করে তুলবে।

৪.তার স্বামী বা মুরুব্বী যদি জাহেলিয়াত -এর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, হারাম পথে রোজগার করে, কিংবা গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, তবে ধৈর্য্য সহকারে তাদের সংশোধন করতে চেষ্টা করবে এবং আল্লাহ ও রসুলের না-ফরমানী হয় এমন কোন কাজের আদেশ দিলে তা মানতে অস্বীকার করবে।

গঠণতন্ত্রের ধারা ৪৮ মতে জামাতের মহিলা সদস্যদের সংগঠন পুরুষদের সংগঠন থেকে স্বতন্ত্র্য হবে।[১৩] জামাতের ২০০১ সালের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে পৃথকভাবে নারীর ক্ষেত্রে বিষয়ে বলা হয়েছে:

ইসলাস প্রদত্ত নারীর সর্বোচ্চ মর্যদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভা ও যোগ্যতানুযায়ী কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা, সর্বত্র নারী নির্যাতন দমন ও নারীর সাবিক অধিকার সংরক্ষণ, অসহায় বিধবা সহ দুস্থ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের পূর্নবাসনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একইসাথে পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদ ও তাদের সামাজিক পুর্নবাসন নিশ্চিত করা হবে। এসিড নিক্ষেপ, ঘৃণ্য যৌতুক প্রথাসহ সকল ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোর হস্তে দমন করা হবে। মহিলাদের উপযুক্ত সম্মান প্রদান ও অধিকার সংরক্ষণের বাস্তবমূখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।[১৪]

- *১১ দল*

এই দলের ঘোষণাপত্রে দেখা যায় নারী সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের অভিমত হচ্ছে

১. রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান মর্যদা ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২. সংসদে নারীর কার্যকর ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য তাদের আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

৩. কর্মজীবি মহিলাদের আবাসন ও কর্মস্থলে যাতায়াতের বিশেষ ব্যবস্থা করা। এবং নারীর পারিবারিক কাজের স্বীকৃতি নিশ্চিত করা।[১৫]

বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান রাজনৈতিক দলের আর্দশ এবং কর্মসূচীতে নারী সম্পর্কে যেসব পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে এবং নারী সর্ম্পকে দলীয় মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী উপরের আলোচনাতে পরিস্ফুট হয়েছে। বিভিন্ন দলের আর্দশ ও কর্মসূচীতে মৌলিক পার্থক্য কম। বিভিন্ন দলের মূলনীতি ও নির্বাচনী মেনিফেষ্টো বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বলা যায়,

আওয়ামী লীগের মূলনীতিতে প্রতিটি নাগরিকের নুন্যতম প্রয়োজন মেটানোর কথা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে নুন্যতম প্রয়োজন এর ব্যবধান রয়েছে। সম্পদ বন্টনে সমান উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন মুসলিম পারিবারিক আইনের বদল। সেক্ষেত্রে নির্বাচনী মেনিফেষ্টো যদি হয তাদের মতাদর্শের বহিঃপ্রকাশ সেখানে এ বিষয়ে অর্থাৎ আইনের বিষয়ে ব্যাপকভাবে কিছু বলা হয়নি। চাকুরী ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রসার সাধন, সমান বেতন প্রদান করাই সম অধিকার প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ঠ নয়। সমাজে, পরিবারের অভ্যন্তরে যে অসমতা সে সর্ম্পকে কোন মন্তব্য নেই। মুলনীতিতে যদি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নাও থাকে, নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতে সুনির্দিষ্টতা থাকা কাম্য। অথচ সেখানেও নারী বিষয়ে কোন বিশেষ ইস্যু নেই। নারীর পশ্চাৎপদতা দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার ও সম অংশীদারিত্বের প্রশ্ন যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি। যা বলা আছে তা খুব স্পষ্ট নয়। যেমন মেনিফেষ্টোতে উল্লেখ্য 'বৈষম্য' বিলোপে 'প্রয়োজনীয় উদ্যোগ' গ্রহণ এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলতে কি বোঝায়, 'উপযুক্ত অংশীদার' ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা নেই। তবে আর্ন্তজাতিক উদ্যোগের বাস্তবায়ন ও ইতোপূর্বে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নের ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে ইতিবাচক অঙ্গীকার করা হয়েছে, যা কিছুটা আশাপ্রদ।

জাতীয়তাবাদী দলের ঘোষণাপত্রে নারী সমাজের 'সার্বিক মুক্তি'র কথা বলা হয়েছে এবং সরকারী বিভিন্ন সেক্টরে নারীকে উৎপাদনমুখী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করার কথা বলা হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতিহারে নারী সমাজের সম্মানজনক ভূমিকা নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনী কর্মসূচীতে বাংলাদেশের নারী সমস্যার বিভিন্ন ইস্যু সর্ম্পকে স্পষ্ট করে কোন কথা বলা হয়নি। নির্বাচন যেহেতু রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি পর্যায় তাই বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আরো স্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদানকারী বক্তব্য কাম্য ছিল। বরং নির্বাচন উপলক্ষ্যে গঠিত চার দলীয় জোটের শরীক দলগুলোর নারীর প্রতি বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী এই দলটির আর্দশকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে।

জাতীয় পার্টির বক্তব্যে শিক্ষা এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে এবং সকল নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। অথচ জাতীয় পার্টির স্বৈরাচারী শাসনামলের অভিজ্ঞতা এর উল্টো কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সকল নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার হরণের যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল বিভিন্ন পর্যায়ে তা বিস্মৃত হওয়ার উপায় নেই। রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের অর্ন্তভূক্ত করা নারীকে উৎপাদনমূখী কর্মকান্ড হতে দূরে সরিয়ে দেবারই নামান্তর। জাতীয় পার্টি কর্মজীবি মহিলাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার কথা বলেছে কিন্তু তাদের শাসনামলে কর্মজীবী মহিলাদের হোষ্টেল - এ যে ধরনের উচ্ছেদমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল এবং কর্মজীবী নারীদের প্রতি প্রশাসনের বিরূপতা এই বক্তব্যের সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। নির্বাচনী ইশতিহারে তারা কোন স্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেনি। বরং দলীয়ভাবে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে নারী বিরোধী বক্তব্য এবং নবগঠিত রাজনৈতিক জোটের শর্তাবলী নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীকেই তুলে ধরছে।

ইসলাম ধর্মভিত্তিক দল জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে নারী-পুরুষের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র আলাদা করার কথা বলা হয়েছে যা বর্তমান যুগে শুধু অযৌক্তিকই নয় তা নারীর জন্য অবমাননাকরও বটে। নির্বাচনী ইশতিহারে জামাত-ই-ইসলামী ইসলামী আর্দশের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অধিকার রক্ষার ঘোষণা দিয়েছে। গঠনতন্ত্র ও ইশতিহারের বক্তব্য নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যথাযথ নয়।

বিভিন্ন দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দলগত কর্মসুচীতে জেন্ডার, সমতার প্রসংগটির উপর খুব কমই গুরুত্বারোপ করা হযেছে। যেমন, আওয়ামী লীগ মানবাধিকারের নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল উন্নয়ন ও উপার্জনমূখী কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

বামপন্থী দলসমূহ স্বীকার করে যে জেন্ডার সমদর্শিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলই নারীর সমস্যাকে কোনভাবে প্রাধিকারযুক্ত করে না। এ সর্ম্পকে কোন এজেন্ডা নেই, নেই কোন কর্মপরিকল্পনা বা আইনগত ও নির্বাচনী সংস্কারমূলক কোন সুপারিশ। জামাত-ই-ইসলামী জেন্ডার সমতায় বিশ্বাস করে না, উপরন্তু জীবনের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক পৃথক ব্যবস্থার পক্ষপাতী।[১৬] এবারের নির্বাচনী ইশতিহারে একটি বিষয় বিশেষভাবে এসেছে, তা হলো প্রায় সকল দল সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়ে বক্তব্য রেখেছে, কিন্তু সরাসরি নির্বাচন বিষয়ে সকলে স্পষ্ট অঙ্গীকার করেনি।

৬.৩.২ রাজনৈতিক দলগুলোর কাঠামোতে নারী

আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রে মহিলা শাখার উল্লেখ থাকলেও মূল দল পরিচালনায় নারী অংশীদারীত্বের কোন উল্লেখ নেই। বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ও জামাত-ই-ইসলামীর গঠনতন্ত্রে মহিলা অঙ্গ দল গঠনেরও উল্লেখ নেই। এখানে উল্লেখ্য বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে তিনটি পার্টি ক্ষমতায় এসেছে এবং বিশেষ করে যে দুটি পার্টি নারী নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশ শাসন করেছে অর্থাৎ বিএনপি ও আওয়ামী লীগ - তারা কখনোই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্ব দেয়নি। এবং এ ব্যাপারে কোন আইনী বা আদর্শগত পরিবর্তনের পদক্ষেপও গ্রহণ করেনি।

বাংলাদেশের দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের শীর্ষ স্থানে নারী নেতৃত্বের উপস্থিতি থাকলেও (রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ঘটনা বা প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে) দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিতেও নারীর সম্পৃক্ততা খুবই কম। বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটিতে ১৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন এবং জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ৭৫ জন সদস্যের মধ্যে নারী রয়েছেন মাত্র ১১ জন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামে ১৩ জন সদস্যের মধ্যে নারীর উপস্থিতি ৩ জন এবং জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ৬৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জন নারীর উপস্থিতি রয়েছে। জাতীয় পার্টির স্থায়ী কমিটির ৩০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন নারীকে রাখা হয়েছে এবং জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ১৫১ জন সদস্যের মধ্যে নারী রয়েছেন মাত্র ৪ জন। জামাতের মজলিশ-ই-শুরার ১৪১ জন সদস্যের মধ্যে কোন নারী নেতৃত্ব নেই এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির

মজলিশ-ই-আমেলাতেও কোন নারীর স্থান নেই। সকল রাজনৈতিক দলগুলোতেই নারীদের পশ্চাৎপদ অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।[১৭]

সারণী: ৬.১ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা

রাজনৈতিক দল	রাজনৈতিক দলের কমিটিসমূহ	মোট সদস্য	মহিলা সদস্য
বি,এন,পি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	১৫	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	৭৫	১১
আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	১৩	৩
	কার্যনির্বাহী কমিটি	৬৫	৬
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩০	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৫১	৪
জামায়াতে ইসলামী	মজলিশ-ই - সূরা	১৪১	-
	কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, মজলিশ-ই-আমেলা	২৪	-

সূত্র: নারী ও উন্নয়ন : প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইম্যান , ঢাকা ১৯৯৫ পৃ. ১৩৬

৬.৩.৩ রাজনৈতিক দলের মতাদর্শে নারী ও দলীয় ভূমিকা

প্রতিটি রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পর সচেতন বা অবচেতনভাবে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র ও জনগণকে নিজ নিজ উন্নয়ন দর্শন দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করার প্রয়াস পায়। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল একটি সরকারী উন্নয়ন স্ট্র্যাটেজীকে জাতির সামনে উপস্থিত করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, কর্মসূচী ও পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে। যে কোন দেশে একটি চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া সবসময়ই বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিটি

রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এই চলমান বাস্তব উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী উত্থাপন, যা প্রধানত দু'ধরনের, সর্মথনসূচক বা বিরোধিতামুলক। প্রথম ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী রাজনৈতিক দলগুলো মূলত চলে আসা সরকারী উন্নয়ন স্ট্র্যাটেজীর নানা গুনকীর্তনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন অথবা অনুগত বিরোধী দল হিসেবে গঠনমূলক সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারী রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা প্রতিযোগিতায় বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাদেরকে বিদ্যমান উন্নয়ন ধারার একটি সমালোচনা এবং সম্ভব হলে একটি বিকল্প উন্নয়ন দর্শনের রূপরেখাও জাতির সামনে উপস্থিত করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন হচ্ছে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলো বিশ্বাস, দর্শন বা আর্দশের প্রতি দৃঢ়তা ও অঙ্গীকারের প্রশ্ন। যদি সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের বিশ্বাস ও আস্থা দূবর্ল হয়, সেগুলো যদি নিছক ঘোষণা বা কথার ফানুস হয়, তাহলে রাজনৈতিক দলের দর্শন বিদ্যমান উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে পরিচালিত ও নির্ধারিত করেনা, বরং পূর্ব থেকে বিদ্যমান বা চলে আসা প্রচলিত উন্নয়ন ধারাই নিজস্ব ভরবেগের জোরে রাজনৈতিক দলের দর্শনকে পরিবর্তিত করে দেয়, খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য করে অথবা ঘোষণা ও বাস্তবের ব্যবধান ক্রমাগতই বাড়তে থাকে।[১৮]

বাংলাদেশে র‍্যাডিক্যেল, রক্ষণশীল, এবং সংস্কারপন্থী আদর্শের বাহক তিন রকম রাজনৈতিক দলই আছে। এসব বিভিন্নমূখী অবস্থানই প্রমাণ করে যে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতই সচেতন-অচেতন, প্রকাশিত বা অপ্রত্যাশিত রাজনৈতিক দর্শনের বিভিন্নতা রয়েছে। এদেশে আগামী দিনের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকার ক্ষেত্রেও তাই তারতম্য থাকবে।[১৯]

বিভিন্ন দলের ঘোষণা ও কর্মসুচী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, আওয়ামী লীগ, বি.এন.পি এবং জামাতের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বক্তব্যের ক্ষেত্রে এবং সেনাবাহিনী, জাতীয়বাদ, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক প্রশ্নে হিছু পার্থক্য রয়েছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জামাত এবং আওয়ামী লীগ পরস্পর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে এবং বি.এন.পি মধ্যপন্থা অবলম্বন করছে।

তবে দল নির্বিশেষে সকলের বক্তব্যেরই একটি সাধারণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রধান দলগুলোর পক্ষ থেকে মহৎ লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে সব লক্ষ্য বাস্তবায়নের

সুনির্দিষ্ট উপায়, পদক্ষেপ, সমস্যা ও সাফল্যের সম্ভাবনা সর্ম্পকে পূর্ণাঙ্গ মূর্ত বিশ্লেষণ সর্বত্রই অনুপস্থিত। একথা সংস্কারবাদী, বাম, রক্ষণশীল সকল দলের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য।

৬.৪ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় নারী: তথ্য ও বিশ্লেষণ

রাজনৈতিক অংশগ্রহণে প্রয়োজন হয় সচেতনভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ, রাজনীতি সর্ম্পকে জ্ঞান, রাজনীতি বিষয়ে উৎসাহ ও রাজনৈতিক কর্মদক্ষতা। রাজনৈতিক ধারনা আসে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে। রাজনৈতিক কার্যক্রমের দ্বারা সরকারী পর্যায়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবাণ্বিত করা যায়।[২০] সুতরাং ক্ষমতায়নের বিভিন্ন স্তরে নারীর অবস্থান দেখা প্রয়োজন।

৬.৪.১ শীর্ষ পর্যায়ে নারী

সারণী: ৬.২ শীর্ষ পর্যায়ে নারী

সরকারপ্রধান (প্রধানমন্ত্রী)	সময়কাল	মেয়াদ
খালেদা জিয়া	বি, এন, পি সরকার	১৯৯১-১৯৯৬
শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ সরকার	১৯৯৬-২০০১
খালেদা জিয়া	বি, এন, পি সরকার	২০০১-

দেখা যায় নব্বই এর দশকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘ সময় নারীরা সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ১৯৯১ সালে এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ এর সাধারণ নির্বাচনে খালেদা জিয়া প্রথমবারের মত দেশের নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসীন হন। ১৯৯৬ এর নির্বাচনে শেখ হাসিনা দেশের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন। ২০০১ এর নির্বাচনে খালেদা জিয়া দ্বিতীয়বারের মত দেশের নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসীন হন।

৬.৪.২ মন্ত্রীসভায় নারী

বাংলাদেশে মন্ত্রীসভায় নারীদের হার অত্যন্ত স্বল্প। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হলেও মন্ত্রীসভায় তাদের অবস্থান নিম্নপর্যায়ে।১৯৭২-২০০১ পর্যন্ত নারী মন্ত্রীর শতকরা হার নিম্নরূপ:

সারণী: ৬.৩ নারী মন্ত্রীদের অংশগ্রহণের হার

সময়কাল	মোট মন্ত্রী	নারী মন্ত্রী	%
আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২-৭৫	৫০	০২	০৪
বি, এন, পি সরকার ১৯৭৯-১৯৮২	১০১	০৬	০৬
জাতীয় পার্টি সরকার ১৯৮২-১৯৯০	১৩৩	০৪	০৩
বি, এন, পি সরকার ১৯৯১-১৯৯৬	৩৯	০৩	০৫
আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬-২০০১	২৪	০৪	১৬
বি, এন, পি সরকার ২০০১-	৬০	০৩	০৫

সূত্র: আবেদা সুলতানা- নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তিঃ একটি বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন পত্রিকা

ছক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এ পর্যন্ত নারী মন্ত্রীদের অংশগ্রহণের হার তাদের যথার্থ প্রতিনিধিত্বের চিত্র তুলে ধরে না। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীসহ মোট চারজন মহিলা মন্ত্রী রয়েছেন। কৃষি, খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ে একজন, বন ও পরিবেশ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী একজন মহিলা। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালে পূর্ণমন্ত্রী পর্যায়ে কোন মহিলা ছিলেন না। উপমন্ত্রী ছিলেন ২ জন। মন্ত্রীসভায় তাদের অবস্থান ছিল শতকরা ৪ ভাগ। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ তে পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন ২ জন, উপমন্ত্রী ছিলেন ৪ জন। মন্ত্রীসভায় তাদের অবস্থান ছিল শতকরা ৬ ভাগ। ১৯৮২-৯০ সালে পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন ৩ জন, উপমন্ত্রী ছিলেন ১ জন। মন্ত্রীসভায় তাদের অবস্থান ছিল শতকরা ৪ ভাগ। ১৯৯১-৯৬ সালে পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন ১ জন, উপমন্ত্রী ছিলেন ২ জন। মন্ত্রীসভায় তাদের অবস্থান ছিল শতকরা ৩ ভাগ। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত পূর্ণমন্ত্রী ৩ জন,

উপমন্ত্রী ১ জন। মন্ত্রীসভায় তাদের অবস্থান শতকরা ১৫ ভাগ।[২১] ২০০১ সালের নতুন মন্ত্রীসভায় পূর্ণমন্ত্রী ২জন এবং উপমন্ত্রী ১ জন।

মন্ত্রীসভায় নারীদের সীমিত হারে অংশগ্রহণের পাশাপাশি পুরুষের সাথে তুলনামূলক চিত্রটিও দেখা প্রয়োজন।

সারণী: ৬.৪ বিভিন্ন সময়ে নারী ও পুরুষ মন্ত্রীর তুলনামূলক চিত্র

সময়কাল	মন্ত্রী		উপমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী)		মোট	
	পুরুষ সংখ্যা ও %	নারী সংখ্যা ও %	পুরুষ সংখ্যা ও %	নারী সংখ্যা ও %	পুরুষ সংখ্যা ও %	নারী সংখ্যা ও %
১৯৭২-৭৫	৩৩-১০০	০-০	১৭-৮৯	২-১১	৫০-৯৬	২-৪
১৯৭৫-১৯৮২	৬৩-৯৭	২-৩	৩৮-৯০	৪-১০	১০১-৯৪	৬-৬
১৯৮২-৯০	৮৫-৯৭	৩-৩	৪৮-৯৮	১-২	১৩৩-৯৭	৪-৩
১৯৯১-৯৬	২০-৯৫	১-২	১৬-৮৯	২-১১	৩৬-৯২	৩-৮
১৯৯৬-৯৭	১৪-৮২	৩-১৮	৯-৯০	১-১০	২৩-৮৫	৪-১৫
২০০১-	২৬ - ৯৮	২- ৭	৩১ - ৯৭	১- ৩	৫৭ - ৯৫	৩- ৫%.

সূত্র: বিবিএস

দেখা যাচ্ছে পুরুষের তুলনায় নারীদের মন্ত্রীসভায় অংশগ্রহণের হার বরাবর কম। তবে লক্ষ্যণীয় যে, সময়ের পরিবর্তনে ক্রমে নারী মন্ত্রীদের সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে।

নারী এখনও মন্ত্রীসভার দায়িত্বের ক্ষেত্রে চিরাচরিত ছাচেঁ বাধাঁ। ব্যাতিক্রম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা যাঁদের দলের অভ্যন্তরে শীর্ষ অবস্থান মন্ত্রীপরিষদে তাদের অবস্থান নির্ণয়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন করে নি। বলাবাহুল্য রাজনীতির শীর্ষ চত্বরে ক্ষমতার বন্টনে অনেকাংশে নির্ভর করবে রাজনৈতিক শক্তির সমীকরণের উপর। জেন্ডার ভিত্তিতে নারী রাজনৈতিক শক্তিতে দূর্বল - দলে, সংসদে ও নির্বাচনী এলাকায়। এর সাথে মন্ত্রীপরিষদে তাদের দূর্বল অবস্থানের একটি যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়।

প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে প্রথম মহিলা মন্ত্রী (পূর্ণ) নিয়োগ করেন যিনি সদ্যসৃষ্ট মহিলা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। বাংলাদেশে নারীর মন্ত্রীসভায় অবস্থানের ক্ষেত্রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। প্রথমত: বাংলাদেশের ইতিহাসে মহিলামন্ত্রী নরম বা গুরুত্বপূর্ণ বলে সচরাচর বিবেচিত নয়, এমন মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। মেয়েলি বা ফেমিনিন বিষয় বলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও চিহ্নিত এমন

সব মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মহিলা মন্ত্রীদের যোগাযোগ ঘটছে বাংলাদেশে। যথা, সমাজকল্যাণ, মহিলা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কো-অপারেটিভ ও স্থানীয় সরকার ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত: বিগত দশকে, বিশেষভাবে মন্ত্রী পরিষদে দীর্ঘ সময়ে কোন মহিলা মন্ত্রী ছিলেন না। । তৃতীয়ত: মন্ত্রণালয়ের কাঠামোয় কখনও কোন নারী মন্ত্রী পুরুষ মন্ত্রীর উর্ধ্বতন পদে আসীন হন নি।[২২] কিন্তু সর্বশেষ সরকারের সময়ে শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপুর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বগ্রহণ ছাড়াও দলের অপর দুজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিক হিসেবে মতিয়া চৌধুরী কৃষি মন্ত্রণালয়ের এবং সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। নবনির্বাচিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়া ছাড়াও খুরশিদ জাহান হক পূর্নাঙ্গ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন।

কিন্তু যথার্থ প্রতিনিধিত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত যে বৈষম্য রয়েছে তা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ থাকা স্বত্তেও তা গ্রহণ করা হচ্ছেনা। এটা অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক যে, সংবিধানের নির্দিষ্ট ধারা থাকা স্বত্তেও উচ্চ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হচ্ছেনা। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনুযায়ী প্রথমবার মন্ত্রীসভায় টেকনোক্রাট কোটা প্রর্বতন করা হয়। এই সংশোধনীর ৫৮(৩) ধারা/আর্টিকেল অনুযায়ী মনোনীত মন্ত্রী (যারা এমপি নয় কিন্তু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্য) নিয়োগ দানের ব্যাপারে কোন বাধাঁ (ceiling) নেই। এই ধারনার মূল কথা ছিল মেধাবী লোকদের নিয়োগ অথবা সংখ্যালঘিষ্ট অথবা পশ্চাৎপদ গোষ্টী থেকে নিয়োগ যেন তারা তাদের প্রতিনিধিত্বকে আরো কার্যকর করতে পারে। ৫৮(৪) ধারা অনুযায়ী অর্ন্তভূক্ত করা হয় যে, মন্ত্রীসভায় নিয়োগদানের ক্ষেত্রে ‘এক পঞ্চমাংশের বেশী নয়’। অর্থাৎ সংবিধানে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৯১ সনে দ্বাদশ সংশোধনীর ৫৬ (২) ধারায় আবারো এই বাধাঁ কমিয়ে আনা হয় ‘এক দশমাংশের বেশী নয়।’ এখানে টেকনোক্রাট কোটায় নারীদের নিয়োগের এক বিরাট সুযোগ রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রেসিডেন্ট জিয়া থেকে শুরু করে খালেদা জিয়া পর্যন্ত একজন নারীও টেকনোক্রাট কোটায় নিয়োগপ্রাপ্ত হননি যদিও দেশে যথেষ্ট সংখ্যক নারী টেকনোক্রাট রয়েছেন, এবং পুরুষ সদস্যরা প্রায়শই সরকার ও বিরোধী দলে নারী নেতৃত্বের উপস্থিতি দেখিয়ে উচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ক্ষেত্রে সার্বিক নারীদের সংখ্যালঘু অবস্থানকে আড়াল করে রাখে। সর্বশেষ সরকারের সময় প্রথম একজন নারী টেকনোক্রাট মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন।[২৩]

৬.৪.৩ জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব: সরাসরি ও সংরক্ষিত আসন

- *আইনসভায় নারী*

বাংলাদেশের আইনসভা বা জাতীয় সংসদ একক ভৌগলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০০ আসন নিয়ে গঠিত। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনগ্রসর নারীসমাজের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত কবাব জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য শুরুতে নারীদের জন্য ১৫টি এবং পরে ৩০ সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়। ২০০১ সালে সপ্তম সংসদের মেয়াদ শেষে এই বিশেষ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটেছে।

সারণী: ৬.৫ আইনসভায় সরাসরি নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের চিত্র

বছর	নারী প্রার্থীর শতকরা হার	সরাসরি নির্বাচনে বিজয়ী নারীর সংখ্যা	উপনির্বাচনে বিজয়ী নারীর সংখ্যা
১৯৭৩	০.৩	০	০
১৯৭৯	০.৯	০	২
১৯৮৬	১.৩	৫	১
১৯৮৮	০.৭	৪	০
১৯৯১	১.৫	৮	১
১৯৯৬	১.৩৬	৫	২
২০০১		৬	০

সূত্র:উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৬ (১৬) ও গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত

লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত আইনসভার নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের হার ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনে গতবারের চেয়ে সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ এই অগ্রগতি এখনও প্রান্তিক সীমায় রয়েছে। ৩০০ সাধারণ আসনের মধ্যে মাত্র ৬ জন নারীর সরাসরি আসনে বিজয়ী হওয়ার হার এদেশে নারীদের সক্রিয় রাজনীতিতে মারাত্মক সীমাবদ্ধতার চিত্রকেই স্পষ্ট করে তোলে। একই বিষয়টিকে বিভিন্ন বছরে মোট প্রার্থী সংখ্যার সাথে তুলনামূলক বিচারে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

সারণী: ৬.৬ ১৯৭৯ থেকে ২০০১ পর্যন্ত নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের হার

নির্বাচনের বছর	মোট প্রার্থী	নারী প্রার্থী	অর্জিত আসন
১৯৭৯	২১১৫	১৭	০২
১৯৮৬	১৪২৯	২০	০৩
১৯৮৮	৯৭৮	০৭	০৪
১৯৯১	২৭৭৪	৪৭	০৮
১৯৯৬	২৫৬২	৪৮	১১
২০০১		[illegible]	১১

উৎস: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন অফিস

দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর নির্বাচনী রাজনীতিতে পুরুষের তুলনায় এই নুন্যতম হারে অংশগ্রহণের হার পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর সার্বিক পশ্চাৎপদ অবস্থানের চিত্র তুলে ধরে।

সর্বশেষ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৬ জন। একজনের একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুণ প্রার্থী সংখ্যা ৪৪টি নির্বাচনী এলাকায় দাড়ায় ৪৮ জন। তার মধ্যে বিজয়ী নারীর সংখ্যা ৭ জন এবং বিজয়ী আসন সংখ্যা ছিল ১১টি। অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বীত আসনের ২৩ ভাগ আসন তারা লাভ করেন। এছাড়াও ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নারীরা দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। উপ নির্বাচনে ২ জন মহিলা প্রার্থী জয়লাভ করেন। জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৩০টি আসনে। সপ্তম সংসদে মাত্র ৭ জন নারী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ছিলেন।[২৪] অষ্টম সংসদে মাত্র ৬ জন নারী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন।

আইনসভায় নারীর প্রতিনিধিত্বের চিত্রটিকে সার্বিকভাবে বুঝতে হলে সরাসরি আসন ও সংরক্ষিত আসন দুটো মিলিয়েই দেখা প্রয়োজন।

সারণী: ৬.৭ জাতীয় সংসদে সরাসরি ও সংরক্ষিত আসনে নারী

নির্বাচনের বছর	সাধারণ আসনে বিজয়ী মহিলাদের সংখ্যা	সাধারণ আসনে বিজয়ী মহিলাদের শতকরা হার	মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন	মহিলাদের শতকরা হার:মোট আসনের মধ্যে
১৯৭৩	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯(ক)	০	০	৩০	৯.০
১৯৭৯(খ)	২	০.৭	৩০	৯.৭
১৯৮৬(ক	৫	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৮৬(খ)	৩+২	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	৪	১.৩	-	-
১৯৯১(ক)	৮	২.৭	৩০	১১.৫
১৯৯১(খ)	৪+১	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৯৬	৭	২.৩	৩০	১১.২
২০০১	৬	২.০	-	-

সূত্র: ড: নাজমা চৌধুরী, উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট, এ গাইড বুক ফর প্ল্যানারস, (খসড়া রিপোর্ট, ১৯৯৪ ও গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত

- *জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন*

স্বাধীনতা উত্তর পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের জন্য সংবিধানের ৬৫ ধারায় জাতীয় সংসদের ১৫টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয় সাধারণ আইন অধ্যাদেশ -৪ এ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ১৫টির বদলে ৩০টি করা হয় এবং সময়সীমা ১০ বছরের পরিবর্তে করা হয় ১৫ বছর। বিধান অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে সংরক্ষিত

আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ফলে ১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন ছিলো না। ১৯৯০ সালে সংবিধানের দশম সংশোধনীতে ধারা ৩ অনুচ্ছেদ ৬৫ তে মহিলাদের জন্য আবার ১০ বছরের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়। এই সিদ্ধান্ত ২০০১ সালে সপ্তম সংসদের মেয়াদ শেষে সমাপ্ত হয়ে যায়।

- *সংরক্ষিত আসন নারীর জন্য সুযোগ না হয়ে নির্ভরশীলতা*

লক্ষ্যণীয় যে, নারীদের জন্য সংসদের এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা বস্তুত নারীর রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়নে সহায়ক হয়নি। ৩০টি সংরক্ষিত আসনে নারীরা থাকলেও তারা মনোনীত হওয়ার ফলে সংসদে তাদের কার্যকর ভূমিকা থাকেনা বা থাকতে পারে না। যদিও সংসদ নেতৃত্ব এবং বিরোধীদলীয় নেতৃত্বের দুটি পদেই নারী বয়েছেন, তথাপি বিভিন্ন নারী ইস্যুতে তাদের ভুমিকা খুব জোরালো বা কার্যকর নয়। ৩০টি সংবক্ষিত আসনের সদস্যরা নির্বাচিত সাংসদগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন যা সম্পূণভাবে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত আসনগুলো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় মহিলা আসনগুলো পূর্ণ হয়েছে। কারণ নির্বাচন পদ্ধতি সংখ্যাগরিষ্ট দলের অনুকূলে যায়। ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগের, ১৯৭৯ সালে বিএনপি'র, ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি, ১৯৯১ সালে বিএনপি'র এবং ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের মহিলা সদস্যরা সংরক্ষিত আসন লাভ করেন। বিভিন্ন সরকারের সময় মতৈক্যের ভিত্তিতে অন্যান্য দলের নারীবাও সীমিত হারে আসন লাভ করেন।

সংরক্ষিত আসনের এই পদ্ধতি যথাযথ নয়। এতে নারীদের শক্তি তৃণমুলে বিস্তৃত হচ্ছে না। শুধু দলের নেতৃত্বে আস্থাবান হলেই হয়। সাধারণ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার দরকার হয় না। ফলে নির্বাচিত নারীরা বাজনীতিতে ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রাজ্ঞ হওয়ার সুযোগ পান না। নির্দিষ্ট ভূমিকায় আটকে থাকেন বলে দলীয় নেতৃবৃন্দের উপর নির্ভরশীল থাকেন। নিজস্ব শক্তির বিকাশ না ঘটার ফলে মূল ক্ষমতা পুরুষদের হাতেই থেকে যায়।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মেয়াদ ২০০১ সালের নির্বাচনের আগেই শেষ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যরা সংসদ সদস্যদের (প্রকৃতপক্ষে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ট আসনপ্রাপ্ত দলের সদস্যদের) দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন এবং এই কারণে

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলা প্রতিনিধিত্ব বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে নীতি ও আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় 'নারী প্রেক্ষিত' এর প্রতিফলন - তা কখনোই হয়নি।[২৫]

সংবক্ষিত আসনের নির্বাচনী প্রক্রিয়া আসনগুলিকে সংখ্যাগরিষ্ট দলের নেতৃত্বের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল করে তোলে। তাছাড়া সংরক্ষিত আসনের জন্য গঠিত নির্বাচনী এলাকা সাধারণ আসনের তুলনায় ১০ গুণ বড় হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মহিলা সাংসদের জন্য তাঁর এলাকায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা আইনসভা ও জণগণের মধ্যে সংযোগের মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়, যতটুকু তত্ত্বগতভাবে সাধারণ আসনে নির্বাচিত সাংসদের জন্য সম্ভব।[২৬]

এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে নারী সমাজ কার্যকর প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টির প্রয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করে বর্তমান পদ্ধতির প্রেক্ষিতে ৩টি বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

❒ সংবক্ষিত আসন সংক্রান্ত বর্তমান পদ্ধতি বাতিল করা
❒ সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা
❒ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা করা।

৬.৪.৪ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী

১৮৭০ সালে চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন অনুসারে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩০ বছর পরেও (বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন সাধিত হওযা স্বত্তেও) স্থানীয় সরকারের উচ্চ পদগুলি প্রধানত: পুরুষদেরই কর্তৃত্বাধীন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভোট প্রদান শিক্ষাগত যোগ্যতা, সম্পত্তিতে অধিকার এবং করদাতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মহিলাদের এসব না থাকার কারণে তারাঁ ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। ১৯৫৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত মহিলাদের স্থানীয় সংস্থায় ভোটদানের অধিকার ছিলো না। ১৯৫৬ সালে প্রথম সার্বজনীন ভোটদান পদ্ধতি চালু হওয়ার পর মহিলারা ভোট দানে সমর্থ হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৩০ বছরে ৬টি স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯২ এবং ১৯৯৭ সালে।[২৭] গ্রাম বাংলার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ও স্থানীয় প্রশাসনে নারীদের প্রত্যক্ষ্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে প্রথম সরকারী অধ্যাদেশের আওতায় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের ২ জন নারী সদস্য মনোনয়নের বিধান

করা হয়। তার পূর্বে সাধারণ সদস্য হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ব্যতিক্রম ঘটনা। ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ এর পরিবর্তন ঘটে এবং পরিবর্তিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী আওতায় ইউনিয়ন পরিষদে মনোনীত নারী সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ৩ জন করা হয়। ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আবারো পরিবর্তন আসে। এবার ইউনিয়ন পরিষদের সংশোধিত আইন অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ওর্য়াড থেকে ১ জন সাধারন সদস্য এলাকাবাসীর সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করার নিয়ম করা হয়। নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৩টি আসন বহাল থাকে কিন্তু মনোনয়নের পরিবর্তে তা ইউনিয়ন পরিষদের চেযারম্যান এবং সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত করারর নিয়ম করা হয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদের ৩টি (এক তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। নতুন আইনে প্রতিটি ইউনিয়নে ৯টি ওর্য়াডে ৯ জন সাধারণ সদস্য প্রতক্ষ্য ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং এই ৯টি ওয়ার্ড ৩ ভাগে ভাগ করে ১টি করে সদস্যপদ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।[২৮]

সারণী: ৬.৮ ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসেবে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ

নির্বাচনের বছর	ইউনিয়নের সংখ্যা।	মহিলা প্রার্থী	নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান
১৯৭৩	৪৩২৫	-	১
১৯৭৭	৪৩৫২	-	৪
১৯৮৪	৪৪০০	-	৪
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	১(১% প্রায়)
১৯৯২	৪৪৫০	১১৬	১৯(২% প্রায়)

উৎস: নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন ঢাকা, ১৯৯৫ পৃ.১৩৪

ডিসেম্বর ১৯৯৭ এ সারা দেশে ৪২৭৬ টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন হয়েছে। এ মেয়াদে প্রথমবারের মত সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন হয়েছে। সংরক্ষিত আসনে ৪৪১৩৪ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ১২৮২৮ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এবারের নির্বাচনে ৪২৭১ জন চেয়ারম্যান প্রার্থীর মধ্যে নারী ছিলেন ১০২ জন, তার মধ্যে জয়ী হয়েছেন ২০ জন। সাধারণ সদস্য পদে ৩৮৪৮৪ জন নির্বাচিত হয়েছেন। নারী প্রার্থী ছিলেন ৪৫৬ জন। জয়ী হয়েছেন ১১০ জন। ইতোপূর্বে মনোনীত নারী সদস্যদের সিদ্ধান্তগ্রহণসহ উন্নয়নমূলক কোন কাজে অংশগ্রহণ করার কোন ব্যবস্থা ছিলো না। বর্তমান ব্যবস্থায় নারীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।[২৯]

পৌরসভা নির্বাচনগুলোতে ১৯৭৭, ৮৪ এবং ১৯৯৩ এর নির্বাচনে দেখা যায় একজন করে নারী প্রার্থী পৌরসভায় নির্বাচিত হয়েছেন, ১৯৯৪ এর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে কোন নারী মেয়র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন নি। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে ১৭ জন নারী কমিশনার হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছেন ১৯৯৫ এ এবং ঢাকার ৬৬ নং ওয়ার্ডে সর্বপ্রথম একজন নারী বিজয়ী হন।[৩৩] স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণের এই ছিল সার্বিক চিত্র।

অধ্যায়ের এই অংশের আলোচনা ছিল ক্ষমতার পরিমন্ডলে নারীর অভিগম্যতা ও অংশগ্রহণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ। রাষ্ট্র পরিচালনার শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ে নারীর অবস্থান আলোচনা করা হয়েছে।

৬.৫ নারী আন্দোলন ও রাজনীতিতে ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলার নারী আন্দোলনের সূচনা হয় অবরোধ প্রথা ভেঙ্গে মুক্তির পথে দৃপ্ত পদচারনায় উদ্দীপনা থেকে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থেকে নারী মানুষ হিসেবে নিজের মর্যদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করলেও বর্তমানে স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে পুরুষের সমান প্রতিনিধিত্ব ও অধিকার অর্জনের জন্য নারী আজ সংগ্রামে অবতীর্ণ।

বাঙ্গালী নারীর রাজনৈতিক লড়াইয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত রয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকেই উপমহাদেশের বিভিন্ন আন্দোলনে বাঙ্গালী নারীরা সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। তবে শুরুতেই সরাসরি ও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা স্থানীয় নারীদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হবার মাধ্যমে তারা রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরী ও চর্চা বৃদ্ধি করে। সূচনালগ্ন থেকে বাঙ্গালী নারীর এই অগ্রযাত্রার পর্যায়ভিত্তিক একটি ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরা যায়।

প্রথম পর্যায়

এই পর্যায়ে মূলত: ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় উপমহাদেশের নারীদের রাজনৈতিক অভ্যূদয় ও বিকাশের প্রেক্ষিত আলোচনা করা হচ্ছে।

- সমিতিভিত্তিক কার্যক্রম

সীমাহীন প্রতিবন্ধকতার মুখে অধ্যাপক রামতনু লাহিড়ীর নেতৃত্বে ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভাগলপুর মহিলা সমিতি'। এটিই ছিল বাংলার নারীদের প্রথম সমিতি। এরপর ১৮৬৬ সালে

নারীরা প্রথম প্রকাশ্য সভায় যোগদান করে। এভাবেই সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। পুরুষের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ্য সভায় যোগদান শুরু হলেও নারীর মেধা ও পরিশ্রম অল্প কয়েক বছরেই তাদের স্বীয় উদ্যোগে নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অবস্থা সৃষ্টি হয। ১৮৭৯ সালের ৮ আগষ্ট রাধা রাণী লাহিরী, কাদম্বিনী বসু, কৈলাস কামিনী দত্ত, কামিনী সেন প্রমুখ মহিলা 'বঙ্গীয় মহিলা সমাজ' বা 'বেঙ্গল লেডিস এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। সদস্যদের সচেতন করে তোলাই ছিল এই সংগঠনটির মূল কাজ। এই সমিতি নারীর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটাতে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল।

- স্বদেশী আন্দোলন

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৯ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে ছয় জন নারী যোগ দেন। তাদের মধ্যে দুজন ছিলেন বাঙ্গালী। প্রথম দিকে কংগ্রেসের আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সীমিত। এই পর্যায়ে যারা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন তাদের প্রায় সকলেই এসেছেন সরাসরি পারিবারিক সূত্র ধরে কিংবা পিতা বা স্বামীর সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে, তবে পরবর্তী সময়ে গান্ধীর অনুসৃত অহিংস আন্দোলনে নারীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কংগ্রেসে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়তে থাকে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে এ্যানি বেসান্ত নির্বাচিত হন (১৯১৭) এবং তার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলন নারী সমাজকে উদ্দীপিত করে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় নারীরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং ১৯২১ সালে গঠিত হয় কর্ম মন্দির।

- বিপ্লবী আন্দোলন /সশস্ত্র সংগ্রাম

স্বাধীনতা লাভের জন্য পরিচালিত দুই ধারার আন্দোলনের মধ্যে একটি ছিল স্বদেশী আন্দোলন এবং অপরটি ছিল বিপ্লবী আন্দোলন। বিপ্লবী আন্দোলন ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, মনোরমা বসু প্রমুখ। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম দিকে নারীর অংশগ্রহণ মূলত তহবিল সংগ্রহ, চরকা কাটা, বিপ্লবীদের আশ্রয়দানে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তী সময়ে তারা প্রকাশ্যে অংশ নিতে থাকেন। এই ক্ষেত্রে অন্যতম বিপ্লবী আন্দোলনকারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এর ভাষ্য উল্লেখযোগ্য:

"আমি আশ্চর্য হয়ে যাই এই ভেবে যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ কেন থাকবে?"

- বামপন্থী আন্দোলন

ব্রিটিশ যুগে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলার কৃষক আন্দোলনে গ্রামীণ নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। জোতদার, জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার টংক, নানকার, তেভাগা আন্দোলন হয়েছে। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে নেতৃত্ব প্রদানের পুরোভাগে ছিলেন নারীরা।[৩১]

দ্বিতীয় পর্যায়

ব্রিটিশ শাসনের পর স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর নারীদের রাজনৈতিক উদ্যোগ ও সক্রিয়তা নিয়ে এবারের আলোচনা।

- সবকারী মহিলা সমিতি

রাজনৈতিক কাজে সক্রিয় নারীদের কাছে এটা দুঃখজনক ছিল যে, স্বাধীনতা পূর্বকালে রাজনৈতিক দল থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে নারীদেব উৎসাহিত করা হলেও স্বাধীন পাকিস্তানের মুসলীম লীগ সরকার তাদের সুর পরিবর্তন করে নারীদেরকে পুরনো চলতি সামাজিক প্রথা, ও রীতিনীতিতে আবদ্ধ রেখে শুধুমাত্র পারিবারিক দায়িত্ব পালনের জন্যই উৎসাহিত করতে থাকে। ১৯৪৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী বেগম রানা লিয়াকত আলী খানের তত্ত্ববধানে ও সবকারী পৃষ্টপোষণে 'আপওয়া' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে সংগঠনটি যথাযথভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়।

- ভাষা আন্দোলন

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারন করার আগেই বাংলা ভাষা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী দমন নীতি চলছিল। ১৯৪৮ সাল থেকে যে আন্দোলন চলছিল, তাতে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যে সকল নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে রওশন আরা, সুফিয়া খান, হালিমা খাতুন, সুফিয়া আহমেদ, নাদেরা বেগম, সারা তৈফুর এর নাম উল্লেখযোগ্য। ভাষা আন্দোলনের পর পর্দা নিয়ে বাধ্যবাধকতা হ্রাস পায়।

- যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে নুরজাহান মোর্শেদ, দৌলতুন্নেসা খাতুন, বদরুন্নেসা খাতুন, আমেনা বেগম, সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, তফতুন্নেসা, মেহেরুন্নেসা খাতুন ও ৩ জন সংখ্যালঘু সদস্য আইন পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সময় নেলী সেন গুপ্তা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এঁদের বিজয় সাফল্যে নারী সমাজের মধ্যে আলোড়ন ও আত্মবিশ্বাস জাগে। দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত নারীদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে নারী সমাজ অধিকার সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য নুরজাহান মোর্শেদ, রাজিয়া বানু ও দৌলতুন্নেসাকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়।

- আইন সংস্কার আন্দোলন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পাকিস্তানের নারী সমাজের আন্দোলনের ফলে ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন প্রণীত হয়, যা নারী সমাজের অধিকার অর্জনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বহু বিবাহ প্রথাকে নিরুৎসাহিত করা, স্ত্রীকে যথেচ্ছ তালাক দেয়া নিয়ন্ত্রণ করা, বিয়ে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা, মেয়ের বিয়ের বয়স ১৬ ও ছেলের ২১ নির্ধারণ করা, মোহরানা দাবি মাত্র পরিশোধ বাধ্যতামূলক করা প্রভৃতি আইনের ধারা সংযুক্ত হয়েছে। আব্বাস আলী খান, আবুল আলা মওদুদী উল্লেখিত পারিবারিক আইনকে কোরআনের পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে এই আইনের কয়েকটি ধারা যেমন: চার বিয়ে নিয়ন্ত্রণ, তালাকের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ, বিয়ের বয়স নির্দিষ্টকরণ, দাদার বর্তমানে বাবার মৃত্যু হলে নাতী-নাতনীর সম্পত্তির অধিকার আদায় ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এরপর জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পারিবারিক আইন বাতিলের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে রোকাইয়া আনোয়ার পাল্টা প্রস্তাব করে বিষয়টি ১৫ সদস্য বিশিষ্ট সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর কথা বলেন। নারী সমাজের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় পরিষদে কোন প্রকার সংশোধনী ছাড়াই আইনটি গৃহীত হয়।

- ৬৯ এর গণ আন্দোলন

১৯৬৯ সালে সামরিক আইন বিরোধী গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। ২০ জানুয়ারী ১৯৬৯, আসাদ শহীদ হলে প্রতিটি প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশে নারীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে এই সংগ্রাম পরিষদই মহিলা পরিষদ- এ রূপান্তরিত হয়।[৩২]

তৃতীয় পর্যায়

এই পর্যায়ের আলোচনা বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক ভূমিকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বিবেচ্য পর্ব। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত এ দেশের নারীরা রাজনীতিতে যেভাবে অংশগ্রহণ করছে তার বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যাবে এই পর্যায়ের আলোচনায়

- মুক্তিযুদ্ধে নারী

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ছাত্রীদের নিয়ে সশস্ত্র ছাত্রী ব্রিগেড গড়ে তোলে। এই ব্রিগেডের ছাত্রীদের মার্চ পাস্ট, রাইফেল চালনা, শরীর চর্চা, ব্যারিকেড তৈরী এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ব্রিগেডের ছাত্রীরা পরবর্তী সময়ে ঢাকার বিভিন্ন পাড়ায় মহল্লায় নারীদের নিয়ে ব্রিগেড তৈরী করেন।

যুদ্ধের সময় ভারতব্যাপী রাজনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করেছেন মতিয়া চৌধুরী ও মালেকা বেগম। আগরতলায় প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নেতৃত্ব প্রদান, চিকিৎসা সহায়তা ও রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণের কাজ করেছেন নারীরা। এছাড়া যুদ্ধকালীন সময়ে কলকাতার পদ্মপুকুর এলাকায় নারী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে 'গোবরা ক্যাম্প' এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সদ্য প্রাক্তন সরকারের মন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী এই ক্যাম্প পরিচালনার নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছেন কৃষ্ণা রহমান ও মিসেস ফজিলাতুন নেসা। এই ক্যাম্পে সর্বমোট ৪০০ মুক্তিযোদ্ধা নারী ছিলেন।[৩৩]

যুদ্ধের সময় বাংলার নারীরা সশস্ত্র লড়াই ছাড়াও খবর আদান প্রদান, ঔষধ, খাবার ও টাকা পয়সা সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌছেঁ দেয়া, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গঠন করে সারা ভারতে মুক্তিযোদ্ধা ও শরনার্থী ক্যাম্পে গান গেয়ে ইৎসাহিত করা এ সকল দায়িত্ব নারীরাই বেশী পালন করেছে। কিন্তু তাদের এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণকে অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে 'মুক্তিযোদ্ধা' পুরুষের মা, স্ত্রী, বোন বা প্রেমিকা হিসেবে এবং ধর্ষিতা নারী হিসেবে ; এমনকি মুক্তিযুদ্ধে যে সকল সংগ্রামী নারী শহীদ হয়েছেন তাদেরকে 'শহীদ' না বলে 'নিহত' হয়েছেন বলে উল্লেখ করে নারীর ভূমিকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে এ যাবৎ কালে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আর্ন্তজাতিক নারী উন্নয়ন ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনও কার্যক্রম চালিয়ে যায়।

- ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ

নারী অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীকে উন্নয়নের মুল শ্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে জাতীয় পর্যায়ের কয়েকটি নারী সংগঠন নিয়ে 'ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ' গঠিত হয় ১৯৮৭ সালে। ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ তাদের ১৭ দফা কর্মসুচীতে উল্লেখ করে যে, নারী নির্যাতন, শোষণ ও বৈষম্য দূর করার উপযোগী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ও শাসন নীতি ছাড়া নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ৯০ এর দশকের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং এরশাদ কর্তৃক বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণার বিরুদ্ধে এই সংগঠন অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। নারী অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে জোরদার করার ক্ষেত্রে এই সংগঠনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

- স্বৈরাচার বিরোধী গণ আন্দোলন

জাতীয় রাজনীতিতে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন জোরদার হলে নারী আন্দোলনও গতিশীল হয়। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ এই সময়কালে অসংখ্য আন্দোলন সংগ্রামে সারা দেশের নারীরা অংশ নেন। ১৯৮৩ সালের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে দীপালী সাহা শহীদ হন। এছাড়া শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে 'ঘাতক দালাল নির্মুল জাতীয় সমণ্বয় কমিটি' গঠিত হলে ব্যাপক সংখ্যক নারী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯০ এর গণ অভ্যুথাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের ব্যাপক ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

- উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট ফোরাম

১৯৯০ এর গণ অভ্যুথানের পর নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্টতা পায় এবং মৌলবাদী জামায়াতের সহায়তায় সরকার গঠন করে। এই সময় মৌলবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ফতোয়ার মাধ্যমে নারী নির্যাতন, এনজিও পরিচালিত স্কুল পোড়ানো তুতঁ গাছ কাটা সহ নারী বিরোধী ও সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। এই প্রেক্ষিতে সামাজিক সংগঠন ও এনজিওসমূহের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট ফোরাম গঠিত হয়।

- সম্মিলিত নারী সমাজ

১৯৯৫ সালের ২৪ আগষ্ট দিনাজপুরে পুলিশ কর্তৃক কিশোরী ইয়াসমিন ধর্ষিতা ও নিহত হলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণের সাথে পুলিশের সংঘর্ষে ৭ জন নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে এটি একটি জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়। এই প্রেক্ষাপটে নারী সংগঠন ও উন্নয়ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমণ্বয়ে গড়ে ওঠে 'সম্মিলিত নারী সমাজ'। ইয়াসমিন হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে সম্মিলিত নারী সমাজের আন্দোলন সাধারণ মানুষ, সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ইতিবাচক নাড়া দিতে পেরেছে। ঢাকা সহ সারা দেশের ১৭টি জেলায় নারী নির্যাতন বিরোধী সমাবেশ করে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করেছে। দেশে সন্ত্রাস, মস্তানী প্রতিরোধে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবীতে আন্দোলন করে জাতীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন বেগবান করতে এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত নারী সমাজ এখনো সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে।[৩৪] সপ্তম সংসদের মেয়াদ চলাকালীন সময়ে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রভাবিত করতে দেশের বিভিন্ন নারী সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠনসমূহের তৃণমূল পর্যায়ে নারী সমাজকে সংগঠিত ও সচেতন করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। আর্ন্তজাতিক নারী আন্দোলনের সাথে তাল মিলিয়ে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী সংগঠনগুলো তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের সংগঠিত করে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্তরায় মৌলবাদ, ফতোয়াবাজ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করার পাশাপাশি নারীর সপক্ষে আইন সংস্কারের দাবীতে সমাবেশ অব্যাহত রাখছে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে যে বিষয়টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো, নারীরা সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনে বরাবর অংশগ্রহণ করে এসেছে। কিন্তু তারা যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের পরও তারা কাঙ্খিত স্তরে নিজেদের উন্নীত করতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রে তাদের আন্দোলন বৃহত্তর

আন্দোলনকে গতিশীল করেছে, কিন্তু তাদের স্বতন্ত্র ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে।

৬.৬ রাজনীতিতে নারীর অগ্রসরতায় সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

নারীর মেধা ও শ্রমশক্তিতে শুধুই পারিবারিক গন্ডিতে আবদ্ধ রেখে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে কিন্তু শত প্রতিকূলতার মাঝেও আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী সদা সম্পৃক্ত থেকেছে। বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বৈরাচার বিরোধী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল রাজনৈতিক আন্দোলন, সংগ্রামেই নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা থাকা স্বত্বেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আজও নারীর সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। এই সীমিত সংখ্যক নারী যারা রাজনীতিতে সক্রিয় তারাও রাজনৈতিক দলের পার্শ্বরেখায় অবস্থান করছে। রাজনৈতিক দল সমূহের অভ্যন্তরে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতির কারণে সামনের সারিতে অবস্থান করে নিতে পারছেনা। এই কারণে রাজনীতি সচেতন নারীরাও রাজনীতির প্রতি আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসছেনা। তারপরও বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নারীরা রাজনীতির অঙ্গনে ভূমিকা রেখে চলেছে।

সাধারণভাবে নারীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করা না হলেও বিভিন্ন সংকটকালীন মুহূর্তে নারীকেই রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে টেনে আনা হয়েছে। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই এ দেশেও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতার কারণে এখনও পারিবারিক উত্তরাধিকারকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর যে কোন সংকটে অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে বাদ দিয়ে সম্পূণ অনভিজ্ঞ পারিবারিক উত্তরাধিকারীকেই সামনে এগিয়ে দেয়া হয় মানুষের আবেগকে কাজে লাগানোর জন্য। সেক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীভূত হয়ে যায় স্বার্থ রক্ষার তাগিদে। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের যোগ্যতা ও দূরদর্শীতা দিয়েই দলের অভ্যন্তরে নিজস্ব অবস্থান তৈরী করে নিতে হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৩০ বছরের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় নারী নেতৃত্বের অধীনে শাসিত এবং সামরিক শাসনামল বাদ দিলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীরা নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি রাষ্ট্র হিসেবে ১৯৯১ সনে বিশ্বের

দ্বাদশ নারী সরকারপ্রধান হিসেবে খালেদা জিয়ার উত্থান এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এবং পরবর্তীতে ১৯৯৬ এর সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনার বিজয় এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে পূণরায় খালেদা জিয়ার বিজয়ের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে দুজন নারীর শীর্ষপর্যায়ে অবস্থান বিশ্বে উদাহরণ তৈরী করেছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ১৯৯১-১৯৯৬ এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত দেশের বিরোধী দলের নেতার ভূমিকায়ও এই দুজন নারী ছিলেন। ২০০১ সালেও একই ধারা বর্তমান।

৬.৬.১ সরকারপ্রধান হিসেবে নারীর ভূমিকা পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সাবেক দুজন নারী প্রধানমন্ত্রীই এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের মত পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে প্রবেশ ও দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। রাজনৈতিক দলের সংকটময় মুর্হূতে 'কমপ্রোমাইজ কেন্ডিডেট' বা 'আপোষ প্রার্থী' হিসেবে নির্বাচিত হন এবং দলকে ভাঙ্গনের মূখ থেকে রক্ষার জন্য পুরুষ প্রধান দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হন। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া উভয়ের জন্য দলের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হওয়া যতটা সহজ ছিল, ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছবার পথ ছিল তার চাইতে অনেক দুরূহ। খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী হতে দীর্ঘ ৯ বছর এবং শেখ হাসিনাকে দীর্ঘ ১৮ বছর সংগ্রাম করতে হযেছে। এই দীর্ঘ সময়ে সম্পুর্ণ পুরুষ প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলকে - যেখানে সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক ভিন্নমত ও আর্দশের সংমিশ্রণ রয়েছে তাদের সংঘবদ্ধ ও আন্দোলনমূখী করে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাঁনো অবশ্যই বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু নেতৃত্বের পরিচায়ক। এক্ষেত্রে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া দুজনকেই উত্তরাধিকার সূত্রে নেত্রী বলে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। একটি অনুন্নত, সমস্যাসঙ্কুল ও পুরুষপ্রাধান্যের দেশে যেখানে সাধারণ মানুষ ভাগ্যোন্নয়নের আশায় প্রতিনিয়ত বিকল্পের সন্ধান করছে সেখানে একনাগাড়ে নেতৃত্বে টিকে থাকা অসীম বিচক্ষণতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। মুসলিম প্রধান দেশে নারী সরকার প্রধান হয়েও তারা কেউ রক্ষণশীলতার শিকার হননি এবং সাধারণ জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা একটি বিরাট অর্জন।[৩৫]

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দুজন নারীর অবস্থানের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপ্রধাণ হিসেবে নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণের জন্য উভয় নারী নেতৃত্বের শাসনকাল পর্যালোচনার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

❐ *খালেদা জিয়ার শাসনকাল*

বেগম খালেদা জিয়া আশির দশকে শুরুতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অবস্থায় স্বামী জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে রাজনীতিতে আসেন বিএনপি-কে সংহত করতে। এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে একটি অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপিকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। পূর্বের কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকলেও তিনি দলের নেতৃত্বে আসীন হয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে দল ও সাত দলীয় জোটের নেতৃত্ব দিয়ে মধ্য আশি ও নব্বুই এর দশকের শুরুতে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ট নেতৃত্ব দেন এবং আপোষহীন পরিচয়ে আবির্ভূত হন। তার এই নেতৃত্ব গুণ তাকে অসাধারণ জনপ্রিয় হিসেব ১৯৯১ সনের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হতে সাহায্য করে এবং তিনি দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্টিত হন।

খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসেন মূলত: সামরিক শাসনের প্রতিকূলতা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব এবং মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে। সেজন্য খালেদা জিয়ার কাছে জাতির প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীত্বের আগে দীর্ঘ নয় বছরের সংগ্রামে তিনি মৌলিক গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে আপোষহীনতা দেখিয়েছেন, দেশ শাসনের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটেনি। তেমনি দারিদ্র হ্রাস, নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কিছু বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও কোন ক্ষেত্রেই এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। প্রথম একজন নারী ক্ষমতার শীর্ষস্থানে এলেও নারীর মূল সমস্যা বা কনসার্ণগুলো জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। - নীতি ও প্রশাসনের কোন ক্ষেত্রেই নারীর প্রেক্ষিত সম্পৃক্তায়ন করা হয়নি। এক্ষেত্রে নেতৃত্বের দূর্বলতাই প্রতিভাত হয়। কারণ দেশের অনুন্নয়নের মূল কারণগুলো ওতপ্রোতভাবে নারী উন্নয়নের স্বার্থে সম্পৃক্ততার কারণে সেগুলো বিচ্ছিন্নভাবে মোকাবেলার পরিবর্তে জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মোকাবেলা বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচায়ক হতো। খালেদা জিয়ার শাসনের আরেকটি শূণ্যতা ছিল, তার পূর্ববর্তী নয় বছরের স্বৈরশাসনে অগণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার বির্বজিত যে পরিস্থিতির শিকার তিনি নিজে হয়েছেন, ক্ষমতায় আসার পর তা সুরাহা করার কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। গণতন্ত্র চর্চা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর কোন গুরুত্ব দেযা হয়নি। ন্যায়পাল বা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা বা জণগণের মানবাধিকার রক্ষা ও পরিবীক্ষণের জন্য কোন স্বাধীন

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান করার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়নি। বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বিলোপ করারও উদ্যোগ নেয়া হয়নি।[৩৬]

খালেদা জিয়ার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য দিক হলো প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামুলক করা, মেয়ে শিক্ষা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা ও শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে আইন প্রণয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো চর্তুথ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্লাটফরম ফর এরশন বা কার্যক্রম দলিলে সংরক্ষণ ছাড়া স্বাক্ষর দান করে নারীর পূর্ণ ক্ষমতা স্থাপনের অঙ্গীকার করা। কিন্তু সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য তাঁর সরকার কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।[৩৭]

অষ্টম সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে তিনি আবারো ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছেন। নির্বাচন পূর্বে তিনি যেসব অঙ্গীকার করেছেন তার বাস্তবায়ন কাম্য। তবে জোটবদ্ধ সরকারে বিশেষ করে নারীদের প্রতি কতটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে সেটাই বিচার্য।

শেখ হাসিনার শাসনকাল

শেখ হাসিনা আশির দশকের শুরুতে আওয়ামী লীগের দলীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। রাজনীতিতে শেখ হাসিনার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। পারিবারিকভাবে রাজনৈতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার পাশাপাশি ছাত্রজীবনে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে আগমনের পর দলে ঐক্য স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা রাখার প্রেক্ষিতে অপ্রতিরোধ্য নেতৃত্ব গড়ে ওঠার মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালের সংসদে প্রধান বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৬ এর নির্বাচনে বিজযের মাধ্যমে তিনি দেশের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসীন হন। শেখ হাসিনার অর্জনের তালিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ইনডেমেনিটি আইন বাতিল, পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে যে সহিংসতা বিরাজ করছিলো এবং ব্যাপক আকার ধারন করেছিলো তার সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ। তাঁর শাসনামলেই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয় এবং অস্থিতিশীল অবস্থার সমাপ্তি ঘটে। শেখ হাসিনার শাসনামলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো গঙ্গার পানি চুক্তি। ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে ৩০ বছর মেয়াদের

জন্য ৩৫ হাজার কিউসেক নুন্যতম পানির গ্যারান্টি সহ ভারত ও বাংলাদেশের দুই প্রধানমন্ত্রী নিজ নিজ দেশের পক্ষে বহু প্রত্যাশিত গঙ্গার পানি বন্টনের ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এটি নিঃসন্দেহে বিশেষ অর্জন। তাঁর সরকারের মেয়াদ পূর্তিকালীন সময়ে আরেকাট গুরুত্বপুর্ণ গৃহীত পদক্ষেপ হলো অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল সংক্রান্ত বিল পাশ। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ১৩ হাজারের অধিক নারীকে তৃণমূল প্রশাসনে সম্পৃক্ত করা ও সিডো সনদকে (নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সাধন) অধিক কার্যকর করার লক্ষ্যে সনদ থেকে দুটি সংরক্ষণ প্রত্যাহার ও সনদের অক্যাশনাল প্রটোকল পূর্ণ অনুমোদন তাঁর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।[৩৮] সন্তানের অভিভাবক হিসেবে পিতার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম লেখার বাধ্যবাধকতা তৈরী হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রীম কোর্টে এই প্রথম একজন নারী বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। এই সরকারের সময় প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সর্বপ্রথম নারীরা সচিব পদে অধিষ্টিত হয়েছেন। বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসক হিসেবে এই প্রথম চার জন নারী নিয়োগ লাভ করেছেন। এবারই প্রথম বাংলাদেশ ব্যাংকে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে একজন নারী ও সোনালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে একজন নারী নিযুক্ত হয়েছেন। এছাড়াও সেনাবাহিনীতে এই প্রথম মেয়েদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে।[৩৯] এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ও এশিয়ায় শান্তি ষথাপনে ভূমিকা রাখার জন্য শেখ হাসিনা বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মাননা পেয়েছেন। সুতরাং বলা যায় জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জনে শেখ হাসিনার ব্যক্তিত্বশীল ভূমিকা প্রশংসার দাবীদার। শেখ হাসিনা সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি। বিদ্যুত সমস্যা সমাধানে তাঁর সরকারের উদ্যোগও ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের ব্যাপারে উদ্যোগ তো গৃহীত হয়নি বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জননিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও রয়েছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খালেদা জিয়ার মত হাসিনা সরকারও মানবাধিকার কমিশন, মানবাধিকার জাতীয় ইনষ্টিটিউট বা ন্যায়পাল নিয়োগ করেন নি।[৪০] জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবীও উপেক্ষিত হয়েছে বিরোধী দলের অনুপস্থিতির অজুহাত তুলে। বৃহত্তর নারী সমাজের জন্য এটি একটি বড় অ-প্রাপ্তি।

দুজন নারী নেতৃত্বের শাসনামল পর্যালোচনার আলোকে বলা যায়, তাদের শাসনকাল অর্জন ও অ-প্রাপ্তি দুদিকেই রয়েছে। দীর্ঘদিন তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় রয়েছেন। কিন্তু কাঙ্খিত

গতিশীলতা অর্জিত হয়নি। নারী সম্পৃক্ত বিশেষ ইস্যুসমূহ, যেমন নারীর প্রতি আইনী বৈষম্য, পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষার হার অর্ধেক হওয়া, দেশের মোট ৫.১ কোটি শ্রমশক্তির ২ কোটি নারী হওয়া স্বত্ত্বেও অর্ধেকের কম পারিশ্রমিক পাওয়া ও পরিসংখ্যানে নারীর অবদান কোনভাবে প্রতিফলিত না হওয়া, নারীর স্বাস্থ্যসূচক পুরুষের তুলনায় অনেক অনেক নিম্ন হওয়া ও গড় অয়ু কম হওয়া এবং বিশেষভাবে ক্রমবর্ধমান হারে যৌণ হয়রানী, নারীর প্রতি পরিবারে ও সমাজে সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়া, যা আজ নারীর প্রতি সহিংসতায় বাংলাদেশকে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছে (জাতিসংঘ জনসংযোগ তহবিল রিপোর্টি) এগুলো সবই গুরুত্বের দিক থেকে যে কোন শাসকের জন্য জাতীয় মানবাধিকার ইস্যু বলে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে। উপরন্তু এগুলো নারী কেন্দ্রীক ইস্যু হওয়ায় নারী নেতৃত্ব এগুলো গভীরভাবে উপলব্ধী করতে পারবে বলে সমাজ আশা করে। কিন্তু আমাদের নারী নেতৃত্ব এগুলোকে শুধু প্রান্তিক গোষ্ঠীর ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করায় ১০ বছরের নারী নেতৃত্ব এগুলোর ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশের নারী তার পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে বিকশিত হতে পারছেনা বিধায় আজও বাংলাদেশ সার্বিক উন্নয়ন সূচকে ১৫৪টি দেশের মধ্যে ৭৪তম অবস্থানে। থীর্ঘ সময়ের নারী নেতৃত্ব রাষ্ট্রে নারীর সম অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

নারী নেতৃত্বের এই দূর্বলতার কারণ হিসেবে একটি ধারনা রয়েছে যে, পারিবারিক সূত্র ধরে আগমন করায় এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় না আসার কারণে দেশের মৌলিক সমস্যার সঙ্গে তারা পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন না, যা তাদের সাফল্যকে সীমিত করেছে। এতে কিছুটা বাস্তবতা থাকলেও এটি মুল কারণ বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। কারণ, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় এলেও গ্রামে-গঞ্জে রাজপথে নিরলস রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমেই তাদেরকে জণগণের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে। বরং পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে তাদের শাসন কালেও। সপ্তম অধ্যায়ের আলোচনায় এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

৬.৬.২ নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধির প্রবণতা

ক্ষমতার পরিমন্ডলে অভিগম্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি সাপেক্ষে নারীরা সক্রিয় ও প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতিতে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে উৎসাহী হয়েছেন। ক্রমেই নারীরা ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় নিজেদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচনমূখী রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করছেন।

১৯৭০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের একটি ইতিবাচক ধারা লক্ষ্য করা যায়। বিগত বছরগুলির নির্বাচনী ফলাফল ও প্রাপ্ত ভোটের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মহিলা প্রার্থী ক্রমাণ্বয়ে ভোটারদের কাছে তাদের ক্রেডিবিলিটি বা গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তারা রাজনীতির অঙ্গনে জেন্ডার উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা করে ভায়েবেল প্রার্থী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছেন।[৪১]

১৯৮৬ এর নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমবারের মত প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নারীদের প্রার্থী করে এবং মোট ২০ জন নারী প্রার্থী সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ০.৯% থেকে ১.৩% এ উন্নীত করে। এটা লক্ষ্যণীয় যে, সকল নির্বাচিত নারী প্রার্থীরা এসেছিল ভালো যোগাযোগ সম্পন্ন পরিবার থেকে এবং ক্ষমতাধর রাজনৈতিক দলের সাথে ঘনিষ্ট আত্মীয়তা সূত্রে।

১৯৯০ এর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় রাজনীতিতে বিশেষ করে নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর প্রান্তিক অবস্থানের গুণগত পরিবর্তন ঘটে। সকল স্তরের নারীরা এমনকি গৃহবধুরা পর্যন্ত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো, আন্দোলন তিন জোটের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল যার মধ্যে দুইটির নেতৃত্বে ছিলেন দুজন নারী নেতা- বিএনপি'র খালেদা জিয়া এবং আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা। যদিও উভয় নারীই এসেছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। ১৯৯১ এর সাধারণ নির্বাচনে ১৯৮৬ এর দ্বিগুন মোট ৩৬ জন নারী বিভিন্ন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনে এই সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা যেমন, দলীয় মযর্দার অভাব, দলের অভ্যন্তরে নেটওর্য়াক, পারিবারিক সমর্থন, তথ্যে প্রবেশাধিকারের অভাব, মিডিয়া ও রির্সোসের অভাব স্বত্ত্বেও নারীরা নির্বাচনী রাজনীতিতে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। সাধারণ আসনে নির্বাচনে নারীদের আরেকটি প্রতিবন্ধক হলো গতিশীলতা। অসন্তোষজনক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান অবনতি বাংলাদেশের নারী রাজনীতিকদের জন্য

পরিস্থিতিকে কঠিন করে তোলে। ধর্মীয় অপব্যাখ্যাজনিত 'ফতোয়া' ও নারীর জন্য সমস্যা তৈরী করে। ১৯৯১ এর সংসদ নির্বাচনেএকজন নারী রাজনীতিকের নির্বাচনী প্রচার বাধাঁর সম্মুখীন হয়েছিল স্থানীয় পুরুষদের দ্বারা তার লিঙ্গের কারণে; তার বিরুদ্ধে একটি প্রোপাগান্ডা চালানো হয়েছিল যে, নারীদের জনসম্মুখে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। আরেকজন রাজনীতিক যিনি পরবর্তীতে সংরক্ষিত আসনে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনিও একই মত পোষণ করেন। ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বেও নারী নেতৃত্ব এবং নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিয়ে বিরূপ সমালোচনা অব্যাহত ছিল। এভাবে বাংলাদেশের নারী রাজনীতিকরা বাধাঁর সম্মুখীন হন। এই অবস্থাকে সহজ করার জন্য প্রধান উদ্যোগ প্রয়োজন রাজনৈতিক দল ও সরকারের দিক থেকে। আইনগত প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য গুণগত পরিবর্তন সাধিত না হলেও, তাদের ভূমিকা এবং সক্রিয়তা কিছুটা দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সাধারণভাবে নারীরা রাজনীতিতে এগিযে আসবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বমুলক কার্যক্রমে তাদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি এই অংশের আলোচনায় সরকারপ্রধান হিসেবে নারীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বলা যায় সর্ম্পূণ অনভিজ্ঞ অবস্থায় রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও ধীরে ধীরে তাঁরা রাজনীতিতে প্রাজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। নারী নেতৃত্ব হিসেবে তাদের কাছে প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি না হওয়ার কারণ বহুমূখী। শীর্ষ পর্যায়ে তাদের অবস্থান থাকলেও সম্পূর্ণ পুরুষ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তাদের পক্ষে নারীর প্রতি ইতিবাচক কার্যক্রম গ্রহণ মোটেই সহজসাধ্য নয়। তারপরও শীর্ষ পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের উদাহরণ সকল নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতাকে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করেছে এবং উৎসাহ বৃদ্ধি করেছে।

এই অধ্যায়ের আলোচনা ছিল মূলত: বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে নারীদের অবস্থানের প্রকৃত চিত্র উদঘাটন। রাজনীতিকে বৃহৎ একটি পরিধিতে বিস্তৃত করে চেষ্টা করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা, নারী রাজনীতিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরার পাশাপাশি প্রচলিত কাঠামোয় রাজনীতির পরিধিতে বিভিন্ন স্তরে তথা রাজনৈতিক দলগুলোতে, সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে, মন্ত্রীসভায়, জাতীয় সংসদে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীদের পদচারণা কতটা অগ্রসর হয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে

নারীরা কত ধাপ অতিক্রম করতে পেরেছে, এখন পর্যন্ত সামাজিক প্রেক্ষাপট কতটা অনুকূলে এসেছে, রাজনীতির শীর্ষ পর্যায়ে দুজন নারীর অবস্থানের প্রেক্ষিতে সার্বিকভাবে রাজনীতিতে নারীরা কতটা উৎসাহী হয়েছে এবং দেশের ব্যাপক নারী সমাজের জন্য তারা কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারছেন তার সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণই এই অধ্যায়ের প্রচেষ্টা ছিল। নারী আন্দোলন রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কি ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারছে এবং এ পর্যন্ত তাদের ভূমিকা কি রকম ছিল তাও আলোচনা হয়েছে।

অধ্যায়ের আলোচনা শেষে বলা যায়, বিশ্বব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের নারীরাও রাজনীতিতে পশ্চাৎপদ ধরনের অংশগ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে। তবে স্বাধীনতার ৩০ বছর পর বলা যায় সীমিত হারে হলেও নারীদের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যে দুজন নারী দীর্ঘ সময় ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতায় এলেও নিজ যোগ্যতায় নেতৃত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন এবং বাংলাদেশের মত সমস্যাসঙ্কুল ও পুরুষ প্রধান্যশীল একটি সমাজে সাফল্যের সাথে টিকে রয়েছেন। তাদের যে সকল ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা হয় তা মূলত: বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়। নারী নেতৃত্ব বলে নয়। বরং এটি বলা যায় যে, নারী নেতৃত্বের কাছ থেকে দেশের নারী সমাজের জন্য যে ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হবে বলে আশা করা হয়েছিল তা পুরো মাত্রায় না হওয়ার কারণ হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষ পরিবেষ্টিত পরিবেশে তারা তা করতে সক্ষম হননি। তারপরও সাম্প্রতিক সময়ে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে যা নারী নেতৃত্বের ফলে দ্রুত হয়েছে বলে বলা যায়। যেমন, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীদের নিয়োগ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ প্রদান, অভিভাবক হিসেবে মায়ের নাম অর্ন্তভূক্তকরণ প্রভৃতি।

বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক জীবনের চালচিত্র তুলে ধরাই ছিল এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু। তাই বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থার আলোকে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতির বিভিন্ন ধাপে নারীদের অভিগম্যতা ও অংশগ্রহণের পরিধি বিশ্লেষণ সাপেক্ষে আগামী দিনের সম্ভাবনার একটি চিত্র বের করার প্রচেষ্টা ছিল এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য।

তথ্যসূত্র

১.Khaleda Salahuddin,"Women's Political Participation: Bangladesh", *Women in Politics and Bureaucracy,* Edited by Jahanara Huq *et al*. P.1-2, Women For women, 1995

২. সৈয়দা রওশন কাদির,“স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া: সমস্যা ও সম্ভাবনা”, *নারী ও রাজনীতি,* নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, পৃ. ২, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪।

৩. Khaleda Salahuddin, op.cit P.20

৪.Ibid, P.21

৫.Ibid, P.16

৬.Ibid, P.17

৭.বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র, ১৯৮৭।

৮. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, নির্বাচনী ইশতিহার-২০০১ ।

৯. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও পার্টির আদশ, সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৮০।

১০. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, নির্বাচনী ইশতিহার-২০০১।

১১. হাসিনা আহমেদ ও সুরাইয়া বেগম, “বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও আন্দোলনে নারী”, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি,* সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৭ পৃ. ১০৮।

১২. জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ইশতিহার, ২০০১।

১৩. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, গঠনতন্ত্র ১৯৮০।

১৪. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, নির্বাচনী মেনিফেস্টো, ২০০১।

১৫. নির্বাচনী ঘোষণাপত্র ও অঙ্গীকার- ১১ দল, ২০০১।

১৬.“ রাজনীতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী” বেইজিং এনজিও ফোরাম, ’৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, বাংলাদেশ, পৃ. ৪৬, ১৯৯৫।

১৭.জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নারী সমাজের বক্তব্য, *বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।*

১৮.নাজমা চৌধুরী এবং অন্যান্য ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, টাস্কফোর্স প্রতিবেদন, পৃ. ৩৩, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২।

১৯.পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫

২০. সৈয়দা রওশন কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩

২১.পারভীন সুলতানা ও অদিতি রহমান, *দৈনিক ইত্তেফাক*

২২.নাজমা চৌধুরী,‘‘রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ: প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা’’, পৃ.২৮, *নারী ও রাজনীতি*, নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪।

২৩.Dilara Chowdhury, "Women’s Participation in the Formal Structure and Decision- Making Bodies in Bangladesh", p.13, *Empowerment of Women- Nairobi to Beijing (1985- 1995)*, Women for Women, 1995.

২৪.আবেদা সুলতানা, ‘‘নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি: একটি বিশ্লেষণ" *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা- ২, ১৯৯৮, উইমেন ফর উইমেন।

২৫.সালমা খান, ‘‘রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী:সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা’’ দৈনিক প্রথম আলো

২৬. নাজমা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২৭. সৈয়দা রওশন কাদির,নিবন্ধ: প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩

২৮.স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা: নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, *বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ*

২৯.পূর্বোক্ত ও দৈনিক ইত্তেফাক

৩০.আবেদা সুলতানা, প্রাগুক্ত

৩১.বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামে নারী: অতীত ও বর্তমান, মোজাম্মেল হক, সম্পাদনা রোকেয়া কবীর, *বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ*

৩২.পূর্বোক্ত

৩৩.পূর্বোক্ত

৩৪.পূর্বোক্ত

৩৫.সালমা খান, প্রাগুক্ত

৩৬.পূর্বোক্ত

৩৭.পূর্বোক্ত

৩৮.পূর্বোক্ত

৩৯.বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত

৪০.সালমা খান, প্রাগুক্ত ৪১.নাজমা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪

সপ্তম অধ্যায়

উন্নয়ন ও রাজনীতির সম্পৃক্ততা- তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৭.১ রাজনীতি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ এবং অংশীদারিত্ব অর্জন: চিন্তাবিদদের অভিমত

৭.২ নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন: মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের আলোকে

৭.৩ ক্ষমতার পরিমন্ডলে নারী ও উন্নয়নে ভূমিকা: পাশ্চাত্য ও এশীয় অঞ্চলের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ

৭.৩.১ পাশ্চাত্য বিশ্ব: বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও ইতিবাচক প্রাপ্তি

৭.৩.২ এশীয় অঞ্চল: শীর্ষ পর্যায়ে নারী, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে অপ্রতুল প্রতিনিধিত্ব

৭.৪ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

৭.৫ রাজনীতিতে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অংশীদারিত্ব অর্জন: নারীর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের কার্যকারিতা

এই অধ্যায়ের আলোচনা মূলত পর্যালোচনামূলক। ইতোপূর্বের অধ্যায়গুলোতে উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের প্রকৃতি, পরিধি ও আংশীদারিত্বের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বের অধ্যায়গুলোর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নারীদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে উন্নয়ন ও রাজনীতির পারস্পরিক ঘনিষ্ট সর্ম্পক তুলে ধরে বৈশ্বিক পর্যায়ে রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর তুলনামূলক অবস্থানগত ভিন্নতা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের রাজনীতি ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের বিষয়টি তুলে আনার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

এই গবেষণায় রাজনীতি, উন্নয়ন এবং নারী- এই তিনটি প্রত্যয়ের পারস্পরিক সর্ম্পকের বিষয়টিকে ফোকাস করার লক্ষ্যে ইতোপূর্বে গবেষণালব্ধ এবং প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণপূর্বক একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিছু প্রাথমিক তথ্যসুত্র ব্যবহার করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন এই গযেণা কর্মের ধারনা কাঠামোয় ছিলো না। তিনটি প্রত্যয়ের পারস্পরিক সর্ম্পকের বিষয়টিকে জোরালোভাবে তুলে ধরা এবং রাজনীতি ও উন্নয়নের পরিমন্ডলে নারীর উপস্থিতির প্রেক্ষিতকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করার জন্য এই গবেষণায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন তথ্যের সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত এই গবেষণার মূল পর্যালোচনার বিষয়, তবু পটভূমি হিসেবে এখানে বিশ্ব প্রেক্ষিতকে দেখা হয়েছে রাজনীতি ও উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে। কারণ বাংলাদেশের রাজনীতি, উন্নয়ন ও নারীর সর্ম্পকের বিষয়টি বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। এটি সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। এবং বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে যে কোন রাষ্ট্রের জাতীয় নীতি ও ধরন বিশ্ব প্রেক্ষিতকে ধারন করেই নির্ধারিত হয়। তাই বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সুবিধার্থে বিশ্ব প্রেক্ষিতও আলোচনায় এসেছে।

রাজনীতি ও উন্নয়নে নারীর অবস্থান নির্দিষ্ট করার জন্য বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে মানদন্ড নির্ধারণ করে পুরুষের সাথে তুলনামূলক চিত্র তুলে আনা হয়েছে। বিগত অধ্যায়গুলো আলোচনার পর এই পর্যায়ে এসে বলা যায়, রাজনীতি ও উন্নয়নের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের পাশাপাশি পারস্পরিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। কারণ এটি নিশ্চিত করে বলা যায় যে, উন্নয়ন ও রাজনীতি পরস্পর ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। রাজনীতি ও উন্নয়ন উভয়েই বিভিন্ন সময় একটি নিয়ামক ও অন্যটি প্রভাবিত ফল হিসেবে নির্ধারিত হয়। চূড়ান্ত নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ হিসেবে রাজনৈতিক শক্তি যেমন নারীদের উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও

অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, তেমনি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধারায় নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি না হলে একদিকে যেমন রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিধি বিস্তৃত হতে পারে না তেমনি আবার রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিই উন্নয়নের ফল ভোগের জন্য যথেষ্ট নয়। সামগ্রিক সষ্ঠু পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে যে সামগ্রিক উন্নয়ন কথাটির ওপর জোর দেয়া হচ্ছে, সেই সার্বিক মানব কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য নারীকে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে বিশেষ সুবিধা প্রদান কিংবা অনগ্রসর অংশ হিসেবে বিবেচনা না করে উন্নয়নের মূলধারায় অর্ন্তভূক্ত করার বিষয়টিতে জোর দেয়ার বিষয়টিতে ঐকমত্যে পৌছাঁনো জরুরি।

৭.১ রাজনীতি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ এবং অংশীদারিত্ব অর্জন: চিন্তাবিদদের অভিমত

নারী কোন বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী নয়। মূল জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নারীরও অধিকার রয়েছে রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের। মনীষী প্লেটো যথার্থ নারী ভুমিকার আদর্শ সর্ম্পকে বলে গেছেন। 'রিপাবলিক'-এ বর্ণিত স্বাভাবিক সার্মথ্যের নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে সমাজে নারী-পুরুষের কার কি কর্মদায়িত্ব হওয়া উচিত। প্লেটো রায় দেন, নারীদেরও অবশ্য চুলচেরা যাচাই করে দেখে তাদের এমন কাজে নিয়োগ করতে হবে যেখানে তারা প্রত্যেকে নিজ ভূমিকা সর্বাধিক দক্ষতা সহকাবে পালন করতে পারবে। নারী-পুরুষ সম প্রকৃতির ও সম সার্মথ্য সম্পন্ন হলে তাদের একই কাজ করতে দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় কাজে যোগ্যতাসম্পন্ন নারীকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য তিনি পরিবারের সকল সনাতন সম্পর্ক উচ্ছেদের ও রাষ্ট্র প্রশাসকদের জন্য যৌথ জীবন-যাপন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর মতে এই প্রশাসকগণ হবেন অভিভাবক শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত। তাঁর মতে, সমাজ পরিচালনায় এমন কোন পেশা নেই যা নারী বা পুরুষের জন্য পৃথকভাবে নির্ধারিত।[1] অর্থাৎ, প্লেটো নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টিকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নাগরিকের যোগ্যতা সাপেক্ষে যথাযথ অধিকার হিসেবে দেখেছেন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রে বা রাজনীতিতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে কোনভাবেই লিঙ্গ বৈষম্যের কথা চিন্তা করেন নি। পরবর্তীকালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে এই চিন্তার ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় জন স্টুয়ার্ট মিলের চিন্তাধারায়। মিল তাঁর 'রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্টের' মধ্যে নারীদের ভোটাধিকার প্রশ্নকে সক্রিয়ভাবে সর্মথন করেছেন। ভিক্টোরিয়

যুগের মধ্যভাগে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নারী-পুরুষ ভেদে যেসব বৈষম্য প্রচলিত ছিল সেগুলি মিল এর ন্যায়বোধকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। তিনি এসব বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করেন এবং পার্লামেন্টে সর্বপ্রথম তাদের মুক্তির প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, নারীদের যদি পুরুষদের ন্যায় সমান অধিকার প্রদান করা যায়, তাহলে শুধু যে, নারী জাতির উপকার হবে তাই নয়, এর দ্বারা সার্বিকভাবে সমাজও উপকৃত হবে। ন্যায়বোধের এই অনুভূতিই নারীদের প্রতি ভোটাধিকার সম্প্রসারণের প্রশ্নে তাকেঁ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি পুরুষদের সাথে নারীদের তুলনা করে বলেছেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে। তিনি তারঁ Subjugation of Women গ্রন্থে নারীদের ভোটাধিকার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমান অধিকারের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে তারঁ উক্তি, “No power or privilage on the one side nor disability on the other.” অর্থাৎ একদিকে বিশেষ ক্ষমতা ও বিশেষ সুবিধা এবং অন্যদিকে অক্ষমতা থাকা উচিত নয় প্রণিধানযোগ্য। এভাবেই মনীষীরা নারীর অংশীদারিত্বের বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

৭.২ নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন: মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের আলোকে

বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের মানদন্ড নির্ধারণের জন্য মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন উল্লেখযোগ্য। উৎপাদন ও আয় নির্ভর সূচক সম্বলিত এইচ,ডি,আই ইনডেক্সের মাধ্যমে উন্নয়নের র‍্যাঙ্কিং করা হলেও সম্প্রতি উন্নয়নের পূর্ণাঙ্গ মাত্রা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সূচক সম্বলিত আরো কয়েকটি ইনডেক্স করা হয়েছে। বিশেষ করে নারীকে উন্নয়নের পরিধিতে দেখার জন্য বিভিন্ন সূচক সংবলিত আরো কয়েকটি ইনডেক্স নির্ধারণ করা হয়েছে- যেমন, লিঙ্গ উন্নয়ন সূচক বা জি,ডি,আই এবং লিঙ্গ ক্ষমতায়ন পরিমাপক বা জি,ডি,এম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও পুরুষের সাথে তুলনা সাপেক্ষে অর্থনৈতিক কর্মের হিসাব, কর্মের অর্ন্তভূক্ত এবং কর্মের অর্ন্তভূক্ত নয় এমন কাজের হিসাব গ্রহণ করে একাধিক ইনডেক্স নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ বৈষম্যের চিত্রকে তুলে ধরার জন্য মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী এবার বিভিন্ন ছকের সাহায্যে তুলনামূলক অবস্থান বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে:

Table: 7.1Gender Gaps in Political participation.

HDI Rank	Year women received right		Year first women elected(E) or nominated(N) to parliament	Women in government		
	To vote	to stand for election		at all level s	At ministerial level	At sub minis. level
High human development						
1. Canada	1950	1960	1921^{E}	17.7	18.5	17.6
2.Norway	1913	1913	1911^{N}	24.1	28.6	22.7
3. United States	1920	1788	1917^{E}	33.1	14.3	34.5
4.Japan	1947	1947	1946^{E}	9.3	5.9	10.1
5.Belgium	1948	1948	1921^{N}	6.6	11.1	4.6
6.Sweden	1921	1921	1921^{E}	30.8	38.1	27.3
7.Australia	1962	1962	1943^{E}	22.6	14.7	25.9
8. Netherlands	1919	1917	1918^{E}	16.7	23.5	14.3
9.Iceland	1915	1915	1922^{E}	8.2	15.4	6.7
10.United Kingdom	1928	1928	1918^{E}	6.9	8.3	6.6
11.France	1944	1944	1945^{E}	10.8	14.7	9.7
12Swizefland	1971	1971	1971^{E}	7.1	15.4	5.9
13.Finland	1906	1906	1907^{E}	20.4	36.4	15.5
14.Jermany	1918	1918	1919^{E}	6.1	10.7	5.3
15.Denmark	1915	1915	1918^{E}	13.9	29.2	10.3
Low human development						
165.Cen. African republic	1986	1986	1987^{E}	4.9	8.0	2.4
166. Mali	1956	1956	1964^{E}	6.2	10.0	0.0
167.Eritria	1955	1955	1994^{E}	7.8	18.8	4.2
168.Guini Bisau	1977	1977	1972^{N}	11.9	8.0	13.2
0169.Mozambiq	1975	1975	1977^{E}	12.8	4.0	14.7
170.Burundi	1961	1961	1982^{E}	5.4	10.3	0.0
171.Burkinfaso	1958	1958	1978^{E}	11.5	9.1	11.9
172.Ethiopia	1955	1955	1957^{E}	8.9	9.1	11.9
173.Nizer	1948	1948	1989^{E}	10.9	14.3	10.0
174Siaralione	1961	1961	-^{c}	5.9	3.8	6.5
150.Bangladesh	**1972**	**1972**	**1973^{E}**	**1.9**	**7.7**	**0.0**

Source: Human Development Report-1999

7.2 Gender gap in economic activity.

HDI rank	Female economic activity rate		Unemployment rate %	Female unpaid family workers(as % of total)1990 1997^b
	Rate(%) 1997	as % of M.rate 1997	Total^a (age15-64)	
High human development	41.2	71.5	8.3-7.1	..
1. Canada	47.9	81.4	9.2-9.4	74
2.Norway	47.1	83.8	4.3^c - 4.0^c	63
3. United States	45.7	81.1	5.1^c -4.9^c	62
4.Japan	43.3	67.3	3.6 -3.5	83
5.Belgium	32.9	65.3	11.6-7.1	86
6.Sweden	51.2	90.0	7.5-8.5	60
7.Australia	43.6	75.4	8.2-8.8	58
8. Netherlands	36.9	65.5	7.2- 4.4	82
9.Iceland	50.9	83.2	4.4^c - 3.3^c	..
10.United Kingdom	42.6	74.3	5.8^c - 8.2^c	72
11.France	39.1	76.5	10.9-14.2	..
12Swizefland	42.5	65.7	3.9-4.4	71
13.Finland	47.3	87.3	15.1-13.9	33
14.Jermany	41.7	69.5	11.0-9.0	82
15.Denmark	51.2	84.7	6.5-4.6	95
Low human development				
170.Burundi	51.3	91.5	- -	60
171.Burkinfaso	46.4	86.8	- -	66
172.Ethiopia	35.6	69.7	- -	-
173.Nizer	41.4	77.6	- -	24
174Siaralione	26.6	55.2	- -	74
150.Bangladesh	44.4	77.2	2.3-2.7	71
World	40.2	69.8		

◆ c=data refer to the age group 16-64

Bangladesh-unemployment rate: F=2.3, M=2.7(extended)
F=6.3, M=2.7 (usual)

Under employment rate: F=70.7, M=12.4(extended) (usual)
Source: Labout Force Survey Bangladesh & Human Development Report-1999

7.3 Gender empowerment measure:(GEM)

HDI rank	Gender empowerment measure(GEM) Rank- Value	Seats in parliament held by women(as % of total)[a]	Female administratorsand managers (as % of total)[b]	Female professional and technical workers (as % of total)[b]	Women's real GDP per capita (ppp$)[b]
High human development	-	17.31	-	-	15827
1. Canada	4	23.3	42.2	51.1	17254[c]
2.Norway	1	36.4	30.6	58.5	20872[d]
3. United States	8	12.5	44.3	53.1	23540
4.Japan	38	8.9	9.3	44.1	14625
5.Belgium	17	15.8	18.8	50.5	15249
6.Sweden	2	42.7	27.9	63.7	17829
7.Australia	9	25.9	43.3	35.5	16526
8. Netherlands	10	31.6	16.8	44.8	14483
9.Iceland	7	25.4	33.1	53.2	19183[e]
10.United Kingdom	16	12.3	33.0	43.7	15736
11.France					
12Swizefland					
13.Finland	6	33.5	26.6	62.5	15045
14.Jermany	5	29.8	26.6	49.0	16780
15.Denmark	3	37.4	20.0	62.8	19733
Low human development	- -	8.9	-	-	691
165Central african republic	94	6.4	9.0[f]	18.9[f]	1032
166Mali	74	12.2	19.7	19.0[f]	583[c]
167Eritria	50	21.0	16.8	29.5	568
168Guini Bisau	-	10.0	-	-	580[c,e]
169Mozambiq	59	25.2	11.3[f]	20.4[f]	612[c]
170.Burundi	-	6.0	-	-	527[c]

171.Burkinf aso	77	10.5	13.5[f]	25.8[f]	807[c]
172.Ethiopia	-	2.0	-	-	349[c]
173.Nizer	102	1.2	8.3	8.0	636[c]
174Siaralione	-	-	-	-	246[c]
150.**Bangladesh**	83	9.1	[redacted]	34.7	767[c]

c-No wage data available. An estimate of 75%, the mean for all countries with wage data available was used for the ratio of the female non agricultural wage to the male non agricultural wage

d-The manufacturing wase was used for the Czech Republic, Greece, Ireland and Norway.

e- Real GDP per capita (ppp$)----

Source: Human Development Report-1999

Table: 7.4 Gender gaps in work burden and time allocation.

	Burden of work				Time allocation %	
	Work time(mint. per day)		Total work time		market activities	non mar. activities
	F - M	F. as % of M.	market activities	non mar. activities	F- M	F- M
Selected developing countries						
Urban						
Average	481-453	106	54	46	31-79	69-21
Rural						
Average	617-515	120	59	41	38-76	62-24
Bangladesh	**545-496**	**100**	**52**	**48**	**35-70**	**65-30**

Source: Human Development Report-1999

7.5 Comparative chart of different country-depends on gender inequality

Name of the country	HDI rank	GDI rank	GEM rank	G.gaps in political participation			G.gaps in ecomic activity				G.gaps in education			
				Women in Government			Fe eco.act.rate		Unemploy.rate%	Fem.unpaid Fam.workers	Fem.pri.net.enrt		Fem.sec.net enrt	
High human development				Seats in parliament	At ministerial level	At sub-ministerial level	Rate% 1997	as% of M1997	Total. Age(15-64) F.	(as% of total) 1990-97	Ratioas % ofrelv.ag	as of % M ratio1997	Ratioas % ofrelv.age	s of ale atio197
Canada	1	1	4	17.31	18.5	17.6	3	6	8	8	1	1	7	6
Norway	2	2	1	23.3	28.6	22.7	4	4	2	5	1	1	3	3
United States	3	3	8	36.4	14.3	34.5	5	6	3	4	1	1	4	4
Japan	4	8	38	12.5	5.9	10.1	7		1	10	1	1	1	4
Belgium	5	6	17	8.9	11.1	4.6			10		1	1	1	4
Sweden	6	5	2	15.8	38.1	27.3	1	1	6	3	1	1	1	4
Australia	7	4	9	42.7	14.7	25.9	6	8	7	2	1	1	4	4
Netherland	8	9	10	25.9	23.5	14.3	10		6	9	1	1	1	4
Iceland	9	7	7	31.6	15.4	6.7	2	5	2	-	1	1	9	3
United Kingdom	10	11	16	25.4	8.3	6.6	8	9	4	7	1	1	8	1
France	11	10	6	12.3	14.7	9.7	9	7	9	-	1	1	2	4
Swizerland	12	12	5		15.4	5.9	8		1	6	1	1	10	7
Finland	13	13	3		36.4	15.5	4	2		1	1	1	4	2
Germany	14	14		33.5	10.7	5.3	8	10	9	9	1	1	6	5
Denmark	15	15		29.8	29.2	10.3	1	3	5		1	1	5	3
L.Dev. countries														
Burundi	170	140	----	6.0	10.3	0.0	1	1	-	2	2	1	2	1
Burkinfaso	171	141	77	10.5	9.1	11.9	2	2	-	3	4	3	3	2
Ethiopia	172	142	-----	2.0	9.1	11.9	4	4	-	-	3	4	1	3
Nizer	173	143	102	1.2	14.3	10.0	3	3	-	1	5	5	4	4
Searalione	174	—	-------	-	3.8	6.5	5		-	4	1	2	-	-
Bangladesh	150	123	83	9.1	7.7	0.0	44.4	77.2	2.3-2.7	71	69.6	87	15.6	58

Source: Human Development Report-1999

সাধারণভাবে দেখা গেছে এইচ,ডি,আই এর প্রথম ১০টি দেশ অন্যান্য সবদিক থেকেই অগ্রসর অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে, যে সব রাষ্ট্রে নারীরা রাজনীতিতে নীতি নির্ধারণের জায়গায় অধিক হারে পৌঁছাতে পেরেছে, সেসব রাষ্ট্রে নারীরা লিঙ্গভিত্তিক সূচকে তুলনামূলকভাবে বেশী অগ্রগামী। জাপান এইচ,ডি,আই ইনডেক্সে প্রথম দিকে থাকলেও আইনসভায় নারীর স্বল্প প্রতিনিধিত্বের (১২.৫) প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে

লিঙ্গ ক্ষমতায়ন পরিমাপকে ৩৮তম অবস্থানের মাধ্যমে। যদিও জাপানের নারীরা ব্যাপক হারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে, কিন্তু এখনো তাদের অ-মজুরীভুক্ত গার্হস্থ্য কাজের হার ৮৩ শতাংশ। এবং সেখানকার নারীদের আয়ও তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে যে সব রাষ্ট্রে নারীরা আইনসভায় উল্লেখযোগ্য হারে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পেরেছে সেসব রাষ্ট্রে নারীরা কর্মক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও পেশাভিত্তিক উভয় ধরনের কাজে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে। ব্যতিক্রম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে নারীদের আইনসভার প্রতিনিধিত্ব মাত্র ১২ শতাংশ কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে এবং তাদের মাথাপিছু জাতীয় আয়ও তুলনামূলকভাবে বেশী। কিন্তু নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব পর্যাপ্ত নয়।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব অর্জন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, ধীরে ধীরে চর্চার মাধ্যমে রাজনৈতিক অগ্রসরতা অর্জন সম্ভব। দেখা গেছে, যে সকল রাষ্ট্রে যত আগে নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সব রাষ্ট্রে নারীরা ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনে দাড়াঁনোর অধিকার অর্জন, আইনসভায় অধিক হারে প্রতিনিধিত্ব অর্জন, মন্ত্রীসভায় বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিতে লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পেরেছে। পাশাপাশি এও লক্ষ্যণীয় যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নারীর গতিশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৭.৩ ক্ষমতার পরিমন্ডলে নারী ও উন্নয়নে ভূমিকা: পাশ্চাত্য ও এশীয় অঞ্চলের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ

ক্ষমতার পরিমন্ডলে প্রবেশ করাই যথেষ্ট নয়, ক্ষমতা চর্চার প্রক্রিয়া সম্পর্কেও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখা গেছে যে, পশ্চিমা বিশ্বে এবং এশীয় অঞ্চলে ক্ষমতা কাঠামোয় নারীর অবস্থানের কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। ইতোপূর্বে উল্লেখিত ছকের মাধ্যমে যে চিত্র পাওয়া গেছে এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর আলোচনার প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক কাঠামো ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অঞ্চলভেদে নারী নেতৃত্বের ক্ষমতা চর্চার প্রক্রিয়া ও ধরন এবং সার্বিকভাবে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবারের আলোচনায়।

৭.৩.১ পাশ্চাত্য বিশ্ব: বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও ইতিবাচক প্রাপ্তি

পশ্চিমা বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে সাধারণভাবে নারীরা অধিকহারে রাজনীতিতে অগ্রসরতা অর্জন করেছে। উল্লেখযোগ্য হারে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা আর্থ-সামাজিক জীবনে যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

- লিঙ্গসমতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রশাসনে সম্পৃক্তকরণ
- অনগ্রসর গোষ্টীর প্রতি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ
- সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরার প্রবণতা বৃদ্ধি
- ‘পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট’ বাস্তবায়নের সুযোগ

প্রথমত: পশ্চিমা দেশে বিশেষত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে যেখানে ষাট দশকের পর থেকে নারীরা ব্যাপক হারে রাজনীতিতে যোগ দিতে ও ক্ষমতার শীর্ষে পৌছাঁবার লড়াইয়ে তৎপর হয়েছে, সেখানে সমতার ইস্যুর সঙ্গে সঙ্গে নারীর দৃষ্টিভঙ্গী প্রশাসনে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মৌলিক গুণগত পার্থক্য আনার দিকে অধিক জোর দেয়া হয়েছে। নারীর উপস্থিতি বিরাজমান রাজনৈতিক পরিবেশের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে, যা ইতিবাচক ও লিঙ্গ সংবেদনশীল।

দ্বিতীয়ত: নারী রাষ্ট্রপরিচালনায় একটি ভিন্ন ষ্টাইলের জন্ম দেয়। নারীর সহজাত সর্তকতা তাকে ঘটনার সুক্ষ বিশ্লেষণে আকর্ষণ করে এবং সেইসঙ্গে সাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সহজাত সংবেদনশীলতার মিশ্রণের কারণে তারা পরিচালনার ক্ষেত্রে একইসঙ্গে পুরুষ আধিপত্যপূর্ণ পারিপার্শ্বিকতা ও অন্যান্য বাঞ্চিত গোষ্টী যথা নারী, শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্টীর চাহিদা সর্ম্পকে অধিক সচেতন, যা পরিচালনা পদ্ধতিতে এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী কিম ক্যাম্পবেল ও আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট মেরি রবিনসন উপরোক্ত মত পোষণ করেন।

তৃতীয়ত: বিভিন্ন সামাজিক গোষ্টীর সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরার একটা প্রবণতা থাকে নারী নেত্রীদের মধ্যে। এতে প্রশাসনে অধিক ইনফরমালিটি বা অনানুষ্ঠানিকতা প্রচলিত হয়, যা পূর্বে উপেক্ষিত অনেক সমস্যাকে পুরোভাগে আনতে পারে। পরিবার ও সমাজে নারীর বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা ভিন্ন হওয়ায় উন্নয়নের অগ্রাধিকার চয়নেও তাদের ভিন্নরূপ মনোভাব হয়, যা প্রতিফলিত হয়েছে পশ্চিমের অধিকাংশ নারী রাষ্ট্রপরিচালকের উন্নয়ন এজেন্ডাতে - শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু পরিচর্যা ও সোশ্যাল সিকিউরিটি ইত্যাদি যেগুলোকে তারা মনে করেন সমাজ উন্নয়নেব পূর্বশর্ত। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এডিথ ক্রিসন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী কিম ক্যাম্পবেল, নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেম, আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট মেরি রবিনসন এবং আইসল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ভিগদিস ফিনবোগাডতির -এরা সবাই নেতৃত্বে এসে রাষ্ট্রীয় নীতি ও শাসন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছেন। যেমন ন্যায়পাল নিয়োগ, ইক্যুয়েল অর্পচুনিটি অ্যাক্ট প্রণয়ন (বিশেষত কর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার), উন্নত শিশু পরিচর্যা, বৃদ্ধভাতা, ও স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন এবং শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশ উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান। নরওয়ের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেম বলেন, নারীরা এই ধরনের ইস্যুর ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় তাদের 'সফট ইস্যু' বা নারীর ইস্যু বলে উল্লেখ করার প্রবণতা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী জর্জ বুশ ও আল গোর দুজনেই তাদের নির্বাচনের অঙ্গীকারে এসব 'সফট ইস্যু'র ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে প্রমাণিত হয় নারী নেত্রীদের দূরদর্শীতা।

চতুর্থত: শুধু রাজনৈতিক দূরদর্শীতাই যথেষ্ট নয়, তার প্রয়োগের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে সক্ষম হওয়াও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে যে কোন রাষ্ট্র পরিচালকের জন্য 'পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট' বা রাজনৈতিক অঙ্গীকার বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যার মাধ্যমে একজন রাষ্ট্রপরিচালকের আন্তরিকতার ও সাফল্যের মূল্যায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে নারীর একটি বিশেষ সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে মনে করেন কিম ক্যাম্পবেল। কারণ 'পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট' শুধু রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত অঙ্গীকারের বিষয় নয়, তাঁর সমগ্র মন্ত্রীসভা, আইনসভা ও রাজনৈতিক দলের সমর্থন এজন্য একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু রাজনৈতিক দলে ও সংসদে নারী সদস্যের সংখ্যা অন্তত ৩০ শতাংশ না হলে তাদের পক্ষে ব্যক্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না। কারণ সংসদ ও দল হলো রাষ্ট্রপরিচালকের

'ইলেকটোরাল সাপেটি বেস' সেখানে তার দৃষ্টিভঙ্গী ও অগ্রাধিকার চয়নের সর্মথন অত্যাবশ্যকীয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অঙ্গীকার পূরণে নরওয়ে, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ইত্যাদি রাষ্ট্রপ্রধানরা এ ধরনের সর্মথন পেয়েছেন। সংসদে ৩০ শতাংশের অধিক নারী সদস্য থাকার, সংসদে উচ্চহারে নারী সদস্যের উপস্থিতি থাকায় নারী রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়াও সামাজিক উন্নয়নের ইস্যু অগ্রাধিকার পেয়েছে সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানী, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে। এ প্রসঙ্গে তারা সবাই মত প্রকাশ করেন যে, নারী নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সংসদে তার ইলেকটোরাল সার্পোটি বেস তৈরী করা। যার অভাবে আমেরিকার নারী আন্দোলন অতন্ত্য শক্তিশালী হওয়া স্বত্তেও রাজনীতিতে তাদের অনুপ্রবেশ ও অবস্থান নগণ্য। কারণ সেখানে কংগ্রেসে নারী সদস্যের সংখ্যা মাত্র ৩ শতাংশ ও স্টেট লেজিসলেচারে ২৩ শতাংশ।[২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সকল রাষ্ট্রে নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়েছে, সেখানকার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় লিঙ্গসমতাভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে।

৭.৩.২ এশীয় অঞ্চল: শীর্ষ পর্যায়ে নারী কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে অ-প্রতুল প্রতিনিধিত্ব

এশীয় অঞ্চলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, এখানে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসেবে শীর্ষপদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর উপস্থিতি থাকলেও সার্বিকভাবে নারীর অগ্রসরতার চিত্র আশাপ্রদ নয়। এশীয় অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে নারীর রাজনৈতিক ভূমিকা প্রধানত নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত:

- রাজনৈতিক জটিলতার সন্ধিক্ষণে রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা
- উচ্চমানের সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জন
- পুরুষপ্রধান পরিবেশে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জয়
- জাতীয়- আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে দক্ষতা সম পর্যায়ের নয়
- নারী নেতৃত্ব হিসেবে নারীদের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা
- লিঙ্গ সংবেদনশীল রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে ব্যর্থতা

লক্ষ্যণীয় যে, এশিয়ার যে সাতজন নারী প্রধান নির্বাহীর দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন তারা মূলত: পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন এবং অধিকাংশই জাতীয় সংকট ও রাজনৈতিক জটিলতার সন্ধিক্ষণে সমঝোতার প্রার্থী হিসেবে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

তবে পিতা বা স্বামীর ঐতিহ্য তাদের জন্য রাজনীতির দুয়ার খুলে দিলেও সেই সঙ্গে তাদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষেরও মুখোমুখি করেছে। অধিকাংশ নারী নেত্রীর মধ্যে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। বেনজির ভুট্টো, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা দীর্ঘদিন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন। আন সান সুচি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নিরলস সংগ্রামে এক দশকের অধিক গৃহবন্দী অবস্থায় আছেন। ইন্দোনেশিয়ায় মেঘবতী সুর্কণপুত্রী দীর্ঘকাল সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে অবশেষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বর্তমানে প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছেন। এরা সবাই রাজনীতিতে প্রবেশের পর শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে উচ্চমানের সাংগঠনিক দক্ষতা ও অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, পুরুষপ্রধাণ ক্ষমতার পরিমন্ডলে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য পরবর্তীকালে কঠিণ সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং পুরুষের চেয়ে অধিক রাজনৈতিক সুক্ষতার পরিচয় দিতে হয়েছে। শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে স্বামীর মৃত্যুর পর ১৯৬০ সালে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর বহু টানাপোড়নের সম্মুখীন হন এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে শুধু নিজেকে পূণঃপ্রতিষ্ঠিতই করেননি- বিভিন্ন সময় ক্ষমতায় থাকাকালে দেশে গভীর অর্থনৈতিক সংস্কার প্রচলন করেন এবং কঠোর হস্তে মাকর্সবাদী বিদ্রোহীদের দমন করেন। শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের কন্যা শ্রীলঙ্কার বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা যদিও ক্ষমতায় আসার পর থেকেই গৃহযুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় পর্যুদস্ত, তা স্বত্ত্বেও দেশের সংকটকালে বৃহত্তর জনগণ তাকেই পুর্ণবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার ধারাবাহিক সাফল্যও লক্ষ্যণীয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, সংকটকালে পুরুষের তুলনায় নারীর নেতৃত্ব দক্ষতা কোন অংশেই কম নয়।[৩]

কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করলেও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সবাই সমান দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারেননি। দক্ষিণ এশিয়ার নারী নেত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সময় ক্ষমতায় থেকেছেন, শ্রীলঙ্কার শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে ও ভারতের ইন্দিরা গান্ধী। তবে আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে একমাত্র ইন্দিরা গান্ধীই রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। তার দক্ষ রাষ্ট্রপরিচালনা ও কুশলী পররাষ্ট্রনীতি তাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। অবশ্য যদিও তিনি রাজনৈতিক পরিবার থেকেই এসেছেন, কিন্তু কোন দূর্ঘটনাজনিত পরিস্থিতিতে নেতৃত্বে আসীন হননি। বরং পিতা জওহরলাল নেহেরুর জীবদ্দশাতেই রাজনীতিতে পরিপক্ব হয়ে ওঠেন। আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ইন্দিরা গান্ধীর সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে পাকিস্তানকে পরাজিত করে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করা। ইন্দিরা গান্ধী জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সফল নেতৃত্বে উন্নয়নশীল দেশের অবস্থান জোরদার ও বিশ্ব শান্তি প্রচেষ্টায় অবদান রেখেছেন।[৪]

কিন্তু নারী নেতৃত্ব বিশেষ করে নারীদের জন্য কতটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পেরেছে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। দেখা গেছে প্রধান নির্বাহী হিসেবে নারীর উপস্থিতি এই নিশ্চয়তা দেয় না যে, সরকারের মধ্যে নারীর পক্ষে বরাদ্দ কৌশলের রূপান্তরে কিংবা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মুলধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করতে তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ/সিগনিফিক্যান্ট ক্ষমতাকে ব্যবহার করবে। যে কোন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অন্যতম ক্ষমতাশালী ও কর্তৃত্বপরায়ণ হিসেবে বিবেচিত নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়েও ভারতের নারীদের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। কোন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রথম হিসেবে পাকিস্তানে একজন নারী প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় অধিষ্টিত হওয়ার মাধ্যমে সেখানকার নারীরা কোন লক্ষ্যণীয় উন্নতির দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হতে পারেনি। বির্তকিত হুদুদ অধ্যাদেশ তার পূর্ববতীদের দ্বারা আরোপিত হয় বৈবাহিক আইনের ভেতরে, যেটি পাকিস্তানের নারীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়েছিল, এখনো সেটি বর্তমান আছে যদিও তার কার্যকারিতা কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। শুধুমাত্র ফিলিপাইনে একজন নারী প্রেসিডেন্টের শাসনামলে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া এবং এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর পক্ষে যুক্তি দাড়ঁ করানো যায় যে, এই কাজ অধিক দৃশ্যমান হয়েছে ফিলিপাইনের একাধিক নারী সংগঠন, তাদের রাজনীতিতে উচ্চহারে অংশগ্রহণ, নারীদের উচ্চপর্যায়ের শিক্ষা এবং প্রশাসন ও পেশাগত উভয় ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের উচ্চপর্যায়ে নারীদের উপস্থিতি এশিয়ার অন্য যে কোন দেশের চেয়ে বেশী এমন অবস্থানে ছিল বলে। যখন সংগঠিত নারী ইস্যুর পেছনে

একজন শক্তিশালী প্রধান নির্বাহীর কর্তৃত্ব থাকে যেখান থেকে নারীদের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের জন্য জননীতিতে সরাসরি প্রভাব তৈরী করা যায় তখন সফলতা আসে এবং ফিলিপাইনে তাই হয়েছে।[৫]

সবশেষে, এশীয় অঞ্চলে বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নারী শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছানোর পরও লক্ষ্যণীয় হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নারীদের জন্য বিশেষ কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ রাষ্ট্রপরিচালনায় নারী নেতৃত্ব থাকলেও প্রায় প্রতিটি দেশেই আইনসভা ও দলীয় নির্বাহী কাঠামোতে নারীর অবস্থান নগণ্য। যে কারণে ক্ষমতার বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে কোন নারী শীর্ষে ওঠার সুযোগ লাভ করেন নি। ঘটনাচক্রে পারিবারিক উত্তরাধিকার তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তাই তারা লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ বা লিঙ্গ সংবেদনশীল রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে পারেন নি। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোতে নারীরা যে সফলতা পেয়েছেন, তা এশিয়ার নারীরা অর্জন করতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন রাজনীতির বিভিন্ন স্তরে নারীদের অনুপস্থিতির কারণে। অর্থাৎ পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া গণতান্ত্রিক শক্তিতে নারী নেতৃত্ব দিলেও সনাতন প্রথা যা নারীকে প্রান্তিক করে রেখেছে সেক্ষেত্রে সামাজিক শক্তি স্থাপন এখনো অ-নিরাপদ।[৬]

৭.৪ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

এশীয় অঞ্চলের একটি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সমাজ রক্ষণশীল ও গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া সুদৃঢ় না হওয়ায় রাষ্ট্রপরিচালনা অধিক চ্যালেঞ্জপূর্ণ। রাজনীতি ও উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত সীমিত। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর আলোচনায় দেখা গেছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের হার অ-প্রতুল ও অধিকাংশ গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক কাজ কর্ম হিসেবে অ-স্বীকৃত। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অ-পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নারীর পশ্চাৎপদতারই বহিঃপ্রকাশ। বস্তুত: শিক্ষা, কর্মসংস্থানে অনুপ্রবেশ, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এগুলো সবই পারস্পরিক সম্পৃক্ত। এবং এক্ষেত্রে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ ও ইতিবাচক রাষ্ট্রীয় নীতিমালার ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই ক্ষেত্রেই রয়েছে নারীর প্রতি বিরুদ্ধ পরিবেশ। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর অবস্থানকে দেখা যেতে পারে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে:

- রাজনীতি ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নারীদের অ-প্রতুল উপস্থিতিতে লিঙ্গ সংবেদনশীল নীতি প্রণয়নে ব্যর্থতা
- বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক এবং জাতীয় ইস্যুতে বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব
- শীর্ষ নারী নেতৃত্বের যথাযথ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা ও নারীদের জন্য ইতিবাচক দ্বার উন্মোচনের সম্ভাবনা

লক্ষ্যণীয় যে, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর যথাযথ হারে উপস্থিতির অভাব একদিকে যেমন নারীর প্রতি সংবেদনশীল নীতি প্রণয়নে উৎসাহিত করছেনা, তেমনি আবার দীর্ঘদিনের বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির কারণে নারী নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পৌঁছাতে পারছেনা। এর কারণ হিসেবে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা গেছে যে, রাজনীতির বিভিন্ন স্তরে নারীদের অংশগ্রহণের হার এখনো নিতান্তই অ-প্রতুল। যদিও রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ে দুজন নারী অবস্থান করছেন, কিন্তু তা সমগ্র রাষ্টের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের চিত্র নয়। অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক বলেন, রাজনীতিতে নারীর সাফল্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পুরুষপ্রধান সংসদে ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান সুদৃঢ় করা।[৭] পাশাপাশি প্রশাসনের সকল স্তরে নারীর উল্লেখযোগ্য হারে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। অর্থাৎ নারী ইস্যুতে রাষ্ট্রের মনযোগের মাত্রা ও মানকে প্রভাবিত করার জন্য আইন পরিষদের বাইরে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নারীদের উপস্থিতি প্রয়োজন। সরকারী ক্ষমতার কম প্রভাবক স্থানে বিভাজিত অবস্থান শুধু নারী ইস্যুতে প্রমোট করার সরকারী ক্ষমতাকে হ্রাস করেনা বরং সিদ্ধান্তমূলক নীতির রূপরেখা প্রণয়নে (design) নারীর স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তার বাস্তবায়ন ঘটানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।[৮]

এই সীমিত প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি আরেকটি সমস্যা হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুযায়ী এখানে বিভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পর সমঝোতামূলক সম্পর্কের বিপরীতে বরং বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক বিরাজ করে, যার প্রভাব উভয় নারী নেতার মধ্যেও বিদ্যমান। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার পরস্পরের দলের প্রতি যে অসহিষ্ণুতা একদিকে যেমন তাদের শাসনামলকে সংঘর্ষপূর্ণ করেছে, তেমনি দেশের গণতন্ত্রের ভিত্তিকে করেছে দুর্বল। এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে সরকার ও বিরোধী দলের সমঝোতায় পৌঁছুবার প্রয়াসকে অহরহ ব্যাহত করেছে যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। যদিও এটা রাষ্ট্রের প্রচলিত ব্যবস্থায়

প্রতিচ্ছবি, তবু রক্ষণশীল সমাজ এজন্য নারী নেতৃত্বের অ-যোগ্যতা ও অদূরদর্শীতাকে দায়ী করছেন। নারী নেতৃত্বের এই ধরনের আচরণ দেশের সকল নারীদের জন্যও ইতিবাচক প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে সঙ্কুচিত করছে।[৯] এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিল উথাপন ও পাস করার ব্যাপারটি। সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ও সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিবর্তনের যে দাবী নারীসমাজ জানিয়েছিল, তা সরকার ও বিরোধী দল উভয়েই সর্মথন করে বলে দাবী করলেও বিরোধী দল সংসদ বর্জন করায় এবং সরকারী দল সংসদে যোগদানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্ব না দেয়ায় শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াই সপ্তম সংসদের কার্যকাল শেষে সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও সমঝোতার অভাব শুধু নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে সীমিত করছে তাই নয়, ভবিষ্যৎ নারী নেতৃত্বকেও অনিশ্চিত কবতে পারে।

এক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘমেয়াদী অবস্থান তৈরীর জন্য উত্তরাধিকার সূত্র নয়, নারীর প্রয়োজন একটি শক্ত 'ইলেকটোরাল সাপেটি বেস' যা একমাত্র সম্ভব আইন পরিষদে বা সংসদে অন্ততপক্ষে এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্যের উপস্থিতিতে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনে ব্যাপক হারে নারীর প্রতিনিধিত্ব অর্জন এখনো সময়সাপেক্ষ। সর্বশেষ সংসদে মাত্র ৭ জন সরাসরি নির্বাচিত নারী সাংসদের উপস্থিতি এবং নবনির্বাচিত অষ্টম সংসদে মাত্র ৬ জন নারী সাংসদের বিজয় থেকে বলা যায় প্রতিনিধিত্বমূলক পর্যায়ে নারীর পর্যাপ্ত ক্ষমতায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আইনসভায় সরাসরি প্রতিনিধিত্ব অর্জনে নারীদের এখনো অনেক প্রতিকূলতাকে জয় করতে হবে। অপরদিকে এতদিনের প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদেরা একেবারেই সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন নি। সুতরাং তাদের সংখ্যাগরিষ্ট দলের উপর নির্ভরশীলতা পরিহার এবং জণগণের নিকট দায়বদ্ধতা তৈরীর লক্ষ্যে সরাসরি নির্বাচনের দাবী যুক্তিযুক্ত। এতে পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে অ-সম প্রতিযোগিতার বদলে নির্দিষ্ট আসনে নারীদের নিজেদের মধ্যে নির্বাচন হলে একদিকে তাদের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, রাজনৈতিক দক্ষতা অর্জিত হবে এবং অন্যদিকে সংসদে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে দৃঢ় ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু সংরক্ষিত আসনে নারীদের সরাসরি আসনে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টিতে এ পর্যন্ত খালেদা জিয়া বা শেখ

হাসিনার মধ্যে এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ও আন্তরিক প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়নি। যদিও উভয় দল তাদের নির্বাচনী ইশতিহারে অষ্টম সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যাক্ত করেছে কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কতটা আন্তরিক থাকতে পারবেন এ ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। যথাযথ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে নারী জনগোষ্টীর জন্য বিশেষ গুরুত্ববহ এই আইন প্রণয়নের উদ্যোগ বাস্তবায়নে উভয় নারী নেতৃত্বের ইতিবাচক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাফল্য অর্জন সম্ভব বলে আশা করা যায়।

ইতোমধ্যে নারী নেতৃত্ব বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে বেশকিছু ইতিবাচক পরিবর্তনও ঘটিয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সিডো সনদের অধিকাংশ ধারায় সংরক্ষণ প্রত্যাহার। বাংলাদেশে এখন সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মায়ের নামের অর্ন্তভূক্তকরণ একটি বড় অর্জন। রাষ্ট্রের দুই শীর্ষ পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি অনেক প্রচলিত ভ্রান্ত সংস্কারকে দূর করার বিষয়ে ভূমিকা রাখছে। বিগত সরকারের সময়ে এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও অন্য দুটো মন্ত্রণালয়ে দুজন নারীকে সম্পূর্ণ মন্ত্রীত্বের দায়িত্বে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং তারা উভয়েই অত্যন্ত সফলতার সাথে এবং কোনরকম বড় ধরনের সমালোচনা ছাড়াই তাদের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন। নব নির্বাচিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও অন্য একটি মন্ত্রণালয়ে নারী পূর্ণ মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন। এই ইতিবাচক সম্ভাবনা ভবিষ্যতের নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা তৈরীতে সহায়ক হবে। কিন্তু এখনো নারীদের ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ ও পূর্ণ অংশীদারিত্ব অর্জন সময়সাপেক্ষ। কিন্তু বাংলাদেশে ভবিষ্যতে নারী নেতৃত্ব উত্তরাধিকারসূত্রতা থেকে বেরিয়ে সম অংশীদারিত্বের দাবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে এই প্রত্যাশাকে সামনে রেখে কাজ করার মাধ্যমে লিঙ্গসমতাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা জোরদার হবে বলে মনে করা যায়।

৭.৫ রাজনীতিতে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অংশীদারিত্ব অর্জন: নারীর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ এর কার্যকারিতা

বিগত অধ্যায়সমূহে প্রাপ্ত তথ্য এবং এই অধ্যায়ের পূর্ব্ববর্তী আলোচনা বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায় যে, রাজনীতি ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য উভয় ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশগম্যতা সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দু ধরনের প্রধান পদক্ষেপ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে যা ব্যাপক আকারে গ্রহণ করা যেতে পারে:

- নারীদের জন্য রাজনীতিতে বাধ্যতামূলক কোটা পদ্ধতি অনুসরণ
- প্রশাসনিক ধাপগুলোতে (apparatus) নারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা
- নারীর গার্হস্থ্য কাজের স্বীকৃতির জন্য সামাজিক একাউন্টিং ম্যাট্রিক্স গঠন

যদিও পৃথিবীর অনেক দেশেই দীর্ঘদিন ধরে নারীর ভোটের অধিকার ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার অর্জিত হয়েছে, কিন্তু ইন্টার পার্লামেন্টারী ইউনিয়নের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বিশ্বে গড়ে মাত্র ১০.৫ শতাংশ নারী আইন পরিষদের সদস্য এবং ৬.১ শতাংশ নারী মন্ত্রীত্বের পদে অধিষ্ঠিত। যেহেতু রাজনীতি হচ্ছে নীতি নির্ধারণের মূল ক্ষেত্র তাই নারী শিক্ষার হার, মানবাধিকার সমন্ধে সচেতনতা ও স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণীতে নারীর প্রবেশগম্যতার সুযোগ এবং সর্বোপরি নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাস ও সমতা স্থাপনের প্রক্রিয়া গতিশীল করার লক্ষ্যে সাময়িক অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন বা বিশেষ কোটা পদ্ধতি রাজনীতিতে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত। কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী এডিথ ক্রিসন উক্তি করেন যে, ক্ষমতার শীর্ষে নারী-পুরুষের সমতা স্থাপনের একমাত্র উপায় হলো, বাধ্যতামূলক কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে যথেষ্ট সংখ্যক নারীর জন্য রাজনীতিতে প্রবেশগম্যতা সৃষ্টি করা। রাজনীতির উচ্চ পর্যায়ে নুন্যপক্ষে ৩০ শতাংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব থাকা অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করা হয়, যা নারীর বিশেষ অবস্থান, সমস্যা ও মূল ইস্যুসমূহকে পুরোভাগে আনতে ও তা মোকাবেলা করার জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্থাসমূহকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়। অন্যথায় প্রশাসন ও রাজনীতি শুধু পুরুষকেন্দ্রিক হয় তাই নয়, দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা নারীপ্রেক্ষিত বিবর্জিত হয় এবং সেক্ষেত্রে নারী জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়া স্বত্ত্বেও প্রান্তিক গোষ্ঠীতে পরিণত হতে বাধ্য। এই বিশেষ কোটা ব্যবস্থার জন্য দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। প্রথমত, রাজনৈতিক দলগুলোকে আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ায় বাধ্য করা যা নেপাল, তানজানিয়া, আর্জেন্টিনা, সুদান ইত্যাদি দেশ প্রচলন করেছে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল সংসদের মোট আসনের নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন মহিলাদের বরাদ্দ করা, যাতে মহিলা সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। নর্ডিক দেশগুলোতে অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশনের কারণে মহিলা সাংসদের হার ৩৪ শতাংশ এবং মহিলামন্ত্রীর হার ৩২ শতাংশ। বর্তমানে সুইডেনের মন্ত্রীসভায় ৫০ শতাংশই মহিলা। এসব দেশে স্থানীয়

সরকার ও পৌরসভায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার ৩০-৫০ শতাংশের মধ্যে।[১০] রাজনীতিতে এই অবস্থান তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করেছে নারীদের অনুকূলে।

একটি অঞ্চলে এই ইতিবাচক চিত্রের পাশাপাশি বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে কোটা পদ্ধতি না থাকায় এর বিপরীত চিত্রই সহজলভ্য। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় জটিলতার প্রেক্ষিতে কিছু নারী ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছেন এবং পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারা প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হন বলে তাতে বৃহত্তর নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়না। এ ধরনের প্রেক্ষিত নারীকে মূলত পুরুষতান্ত্রিকতার মুখপাত্র হিসেবেই উপস্থাপিত করে। প্রশাসনকে নারীপ্রেক্ষিত থেকে প্রভাবান্বিত করা অনেক ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, কখনো খুব সীমিত মাত্রায় তারা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর প্রভাব স্পষ্ট। অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষকেন্দ্রিক আবহে নিয়ন্ত্রিত থাকার কারণে এবং পুরুষ ভোটারদের আস্থা না হারানোর জন্য নারী নেতৃত্ব নারীর পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত থাকেন।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে কোটা পদ্ধতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে দুটি পদ্ধতির সংমিশ্রণ অর্থাৎ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন প্রচলন ও প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আনুপাতিক হারে নারীর জন্য মনোনয়ন নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমেই রাজনীতিতে নারীর নুন্যতম কাম্য পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব যাকে ক্রিটিক্যাল মাস বলা হয়ে থাকে (৩০ শতাংশ), তা সম্ভব।[১১] বাংলাদেশের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংরক্ষিত আসন এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনে মনোনয়ন দানে বাধ্যতা এই উভয় প্রক্রিয়ার সমন্বয় বিশেষভাবে কার্যকর হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই গবেষণার প্রতিপাদ্য অনুযায়ী ইতোপূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নয়, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক পদেও অধিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। এশিয়ার দেশগুলোতে প্রশাসনিক ধাপগুলোতে (apparatus) নারীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য নয়।[১২] এই সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক পদসমূহে তথা কর্মসংস্থানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও কোটা পদ্ধতি গ্রহণ এবং তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা যায় শিক্ষা ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতির যথাযথ ব্যবহার নারীদের শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। পাশাপাশি শ্রম আইনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগের বিষয়টি সবসময় পুরোপুরি অনুসরণ না করার ফলে

নারীদের অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়। সুতরাং ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন উভয়ই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়াও পাশ্চাত্য অঞ্চলের মত অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে এশিয়ার দেশগুলোতে একটি সামাজিক অ্যাকাউন্টিং ম্যাট্রিক্স গঠন করা প্রয়োজন যাতে নারীদের নির্দিষ্ট আয়কারী গ্রুপের অর্ন্তভূক্ত বলে বিবেচনা করা যাবে। লিঙ্গভিত্তিক ডাটা কালেকশন সিষ্টেম তৈরী করা প্রয়োজন। এতে শুধু নারীর গার্হস্থ্য কাজের মূল্যায়ন হবে না, বরং গার্হস্থ্য সংক্রান্ত সেইসব কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে যা বর্তমানে ইতোমধ্যেই কৃষিকাজ ও গার্হস্থ্য উৎপাদনে অবদান রাখে। এশীয় অঞ্চলের বিভিন্ন সংস্থা যেমন, ESCAP এবং / অথবা SAARC বা ASIAN এর উচিত গার্হস্থ্য কাজকে সম্পৃক্ত করে তাদের ন্যাশনাল একাউন্ট এর ডিজাইন তৈরীতে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া।[১৩] তবেই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সম্প্রসারিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, এই অধ্যায়ের প্রচেষ্টা ছিল পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের আলোচনার প্রেক্ষিতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তুলনামুলক চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা। এশীয় অঞ্চলের একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও উন্নয়নে অংশীদারিত্বের চিত্র খুব ইতিবাচক নয়। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি (economic growth) এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে নারীর পরোক্ষ সুবিধাভোগী হিসেবে থাকা উচিত নয়, বরং নিজেদের অধিকারের জন্য তাদের প্রধান ভূমিকাকারী ও অংশগ্রহণকারী হিসেবে থাকা উচিত। রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নারীদের সংগঠিত করা এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে, পরিবারে, সম্প্রদায়ে (community) এবং জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাদের মর্যদা বৃদ্ধির জন্য যেমন, তেমনি সামগ্রিকভাবে সমাজের ধঁশতলভড়ল বৃদ্ধির জন্য।[১৪] প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বব্যাপী অল্প সংখ্যক সরকার আছে, যেখানে যথানুপাতে বা কৌশলে আনুষ্ঠানিকভাবে নারীর জন্য পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং ঐসব পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটে বন্টন সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা যায়, ধারনাগত এবং প্রোগ্রাম উভয় পর্যায়ে জাতীয় নীতি প্রণেতাগণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন। এর অর্থ হলো অন্যান্য টার্গেট

গ্রুপের সঙ্গে প্রতিযোগী হিসেবে নারীদের নিজেদের জায়গা করে নিতে হবে সরকারী সম্পত্তিতে দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য।[১৫] বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ইতিবাচক দৃষ্টান্ত থেকে বাংলাদেশ নারীর অগ্রসরতার ক্ষেত্রে বর্তমান সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে উদ্যোগী হবে এই প্রত্যাশা করা যায়। রাজনীতি ও উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে হলেও নারীদের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে যা আশাপ্রদ।

তথ্যসূত্র:

১. রিটা মে কেলী ও মেরী বুটিলিয়ার রচিত ও নুরুল ইসলাম খান অনুবাদিত *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়-সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও ভূমিকা-দ্বন্দ্বের সমীক্ষা*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

২. সালমা খান, 'রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী: সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা' , *দৈনিক প্রথম আলো*, ৪ নভেম্বর ২০০০।

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

৫. Rehman Sobhan, *Public Policy for Asian Women*, University Press Ltd.

৬.Ibid

৭. সালমা খান, প্রাগুক্ত

৮. Rehman Sobhan, op.cit

৯. সালমা খান, প্রাগুক্ত

১০. পূর্বোক্ত

১১. পূর্বোক্ত

১২. Rehman Sobhan, op.cit

১৩. Ibid

১৪. Ibid

১৫. Ibid

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

৮.১ উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর সম অংশীদারিত্ব: টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত

৮.২ উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী: অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ

এই অধ্যায় মূলত: গবেষণার পরিসমাপ্তিমূলক অংশ। ইতোপুর্বে আলোচিত সাতটি অধ্যায়ে গবেষণার বিষয়বস্তু যথাযথভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারীর সম্পৃক্ততা ব্যাখ্যা করা। নির্দিষ্ট অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার দ্বারা উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যৌক্তিকভাবে তুলে ধরার প্রেক্ষিতে আশা করা যায় যে, উন্নয়ন ও রাজনীতির চত্বরে যথানুপাতে প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টির ফলে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে এবং জেন্ডার সমতাভিত্তিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠিত হবে।

উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক পরিমন্ডল উভয় ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিশ্বব্যাপী যে পুরুষতান্ত্রিক আবহ বিরাজ করছে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীক পরিমন্ডলেও সেই অনুসারেই নারীরা সীমিত হারে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু নারীর অংশীদারিত্ব অর্জনের জন্য সম হারে অংশগ্রহণ জরুরি। এই পর্যায়ে এসে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনাকে সংগ্রথিত করা যায় দুই পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে:

- উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর সম অংশীদারিত্ব যে টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত তার যৌক্তিকতা উপস্থাপন
- উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ উপস্থাপন

৮.১ উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর সম অংশীদারিত্ব: টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত

গবেষণায় আলোচ্য 'উন্নয়ন' ও 'রাজনীতি' উভয় পরিমন্ডলে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, সমাজে শ্রেণী ও অবস্থান নির্বিশেষে নারীর অবস্থান পুরুষের অসম ও অধস্তন। এই যে জেন্ডার-উদ্ভূত পার্থক্য (যা নারী-পুরুষ সম্পর্কের একটি অন্যতম মৌলিক নির্ণায়ক হিসেবে ক্রিয়াশীল রয়েছে) গোটা নারী সমাজকে একটি গোষ্ঠীগতসূত্রে বেঁধে রেখেছে। অধস্তনতার বহি:প্রকাশ ঘটে নানাভাবে। মালিকানা, কর্তৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে থাকে ব্যবধান, যার অভিব্যাক্তি ঘটে থাকে নারীর প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন ও উৎপীড়নের মাধ্যমে। সুতরাং নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে নারীদের অসম অবস্থানের উপলব্ধি ও চেতনার

সংযোগ একান্ত অপরিহার্য। রাজনীতিতে নারীর সীমাবদ্ধ অবস্থান তার সার্বিক লিঙ্গ অসমতার একটি সূচক, যা আরও বৃহত্তর অসমতার প্রতি আলোকপাত করে।[১] এই গবেষণার লক্ষ্যই হল উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী এই ত্রয়ী প্রত্যয়ের সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে দেখানো। স্বতন্ত্রভাবে এই তিনটি প্রত্যয়ই নিজস্ব অবস্থানে আরো বহু বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু এই গবেষণার প্রচেষ্টা হল এই প্রত্যয়সমূহের পারস্পরিক সর্ম্পক কিভাবে লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচন করে তা যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে উন্নয়ন ও রাজনীতির সম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজনীতির মাধ্যমে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকা পালনের সুযোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা রাখে। তাই নির্বাচিত অঙ্গ এবং ক্ষমতাগত অবস্থান থেকে নারীর বর্জিত অবস্থান জন জীবনের গণতান্ত্রিক নীতির উন্নয়নকে সংকুচিত করে এবং একটি সমাজের সার্বিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যারা তাদের নিজেদের স্বার্থকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়। ফলে উন্নয়ন পূর্ণাঙ্গিতা পায় না, একমুখী উন্নয়ন ঘটে থাকে।

অ-পুর্ণাঙ্গ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী বহুমুখী বৈষম্যের শিকার, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সমাজ কাঠামোর প্রতিটি স্তরে নারী-পুরুষের সর্ম্পক অধস্তনতা ও কর্তৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে নারী অধিকতর দূর্ভোগ ও দুর্যোগের শিকার হয়। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে এসব বৈষম্যের ও পরনির্ভরশীলতার অবসান ঘটিয়ে নারীর সক্রিয় ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি ও অবদানের স্বীকৃতি এবং পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়নের অর্থনৈতিক, আইনগত ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যমান। সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হতে হলে এইসব পরিপ্রেক্ষিত বা মাত্রা ধারন করতে হবে।

বস্তুতপক্ষে নারীর ক্ষমতায়ন সুষম ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটানোর একটি মাধ্যম। উন্নয়নের ধারাকে প্রবাহমান ও কার্যকর রাখতে হলে উন্নয়ন মডেল ও প্রক্রিয়ায় সমাজের নারীসহ সকল জনগোষ্টীর অর্ন্তভূক্তি ও অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নারীকেও পুরুষের সাথে উন্নয়নের বাহক ভোগসত্ত্বাধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়ন

প্রক্রিয়ার প্রান্তিকতা থেকে পুরুষের সাথে এবং কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা প্রয়োজন।[২] সুতরাং বলা যায়, সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ করতে হলে এই প্রক্রিয়ায় নারীর অর্ন্তভূক্তির প্রয়োজনীয়তার যুক্তিগ্রাহ্যতা স্বীকার করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নির্ধারক শক্তি রাজনীতিতে নারীদের অর্ন্তভূক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে পৃথিবীর অর্ধেক জনগোষ্ঠী হওয়া স্বত্ত্বেও রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব অ-পর্যাপ্ত, যা তাদের অ-সম অবস্থানের চিত্রকে ব্যাপক করে তোলে। রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ন্যায্যতা স্থাপনের জন্যই জরুরি হলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে সার্বিকভাবে নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থানের ধারাবাহিকতায় রাজনীতিতেও নারীর স্বল্প উপস্থিতি লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের সম্ভাবনাকে দূরবর্তী করে তোলে। নারী রাজনীতির পরিমন্ডলে সম অংশীদারিত্ব ভোগ করতে পারছে না। পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলেই রাজনীতিতে নারীর প্রবেশগম্যতা, মর্যদা বা প্রভাব পুরুষের সমকক্ষ নয় এবং ক্ষমতার প্লাটফর্মে এই অসমতাই নারী-পুরুষের বৈষম্যের অন্যতম মূল কারণ বলে মনে করা যেতে পারে।

উন্নয়নকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে রাজনীতির জোরালো ভূমিকার কথা বিবেচনা করে জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৯২ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় রাজনীতি, ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্বের যৌক্তিকতার বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যার মুল সুর পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষণায় একইভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মূলত: নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ-

প্রথমত: গণতন্ত্র ও সমতার প্রশ্ন, নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন। জনসংখ্যা অনুপাতে রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়ত: নারীর দূর্বল উপস্থিতি রাজনীতির অঙ্গনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও গণতান্ত্রিক বৈধতা সর্ম্পকে প্রশ্ন তোলে। কেননা, রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় অপ্রতুল উপস্থিতি ও সীমিত অংশগ্রহণের কারণে নারীসমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে রয়ে যায় এক বিরাট ব্যবধান।

তৃতীয়ত : যুক্তি নারী-পুরুষের স্বার্থের ভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীরা তাদের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন সর্ম্পকে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল। কিন্তু যদি রাজনীতিতে যর্থাথ প্রতিনিধিত্ব না থাকে তাহলে তারা তাদের স্বার্থ উপস্থাপন ও সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

চতুর্থত: দেশের মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনেও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সবল উপস্থিতি আবশ্যক।

পঞ্চমত: নারীর সবল সংখ্যায় রাজনীতিতে প্রবেশ রাজনীতির মূল ফোকাসে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটাবে। কেননা নারীর জীবনও সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যে সমস্ত সমস্যা নেহায়েত ব্যক্তিগত বলে চিহ্নিত এবং যর্থাথ রাজনীতির আওতাবর্হিভূত বলে বিবেচিত, সেগুলিও রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে।[৩]

সুতরাং বলা যায় যে, রাজনীতিতে নারীর যথাযথ অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যৌক্তিক ও অবশ্য প্রয়োজনীয়। নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সরকারের চূড়ান্ত ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে উন্নয়ন ও রাজনীতির পরস্পর সম্পৃক্ততাকে সংযুক্ত করার বিষয়ে এই গবেষণায় জোর দেয়া হয়েছে। নারীর সার্বিক আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য, যথাযথ নীতি প্রণয়ন ও কার্যকরভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রশাসন যন্ত্রকে প্রয়োজনীয় সর্মথন প্রদান আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে সমাজের পুরো সমর্থন যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন প্রশাসন ও সরকারের। জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীদের অর্ন্তভূক্তি, শাসক দলের অনুসৃত নীতি ও সর্মথনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রভাব তৈরীতে সক্ষম হিসেবে চিহ্নিত করে নারীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্তকরণকে আবশ্যকীয় করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সর্মথনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন, যা নারীদের জাতীয় কার্যক্রমের মূল ধারায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য যোগ্য করে তুলবে। ব্রাজিলে সম্প্রতি আইন পাশ করা হয়েছে যে, সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নূন্যতম ৩০ শতাংশ মহিলাকে মনোনয়ন প্রদান করবে। তিউনিশিয়ায় বহুবিবাহ বন্ধের আইন পাশ হয়েছে। ইসরাইলের সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে সকল পাবলিক সেক্টার কর্পোরেশনের বোর্ডে অন্তত ২৫ শতাংশ মহিলা নিয়োগের বিধি চালু হয়েছে। ছয়টি আরব দেশে আইন বিদ্যার পাঠ্যক্রমে সিডও, নারীর মানবাধিকার বিষয় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।[৪]

এভাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের বৈষম্য কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ, সেনাবাহিনীতে নারীদের নিয়োগের বিধান, প্রশাসনে কোটা পদ্ধতি, ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ প্রভৃতি সুযোগের মাধ্যমে খুব সীমিত হারে হলেও কিছু উদ্যোগ অবশ্য ইতোমধ্যে নেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন ধারায় অংশগ্রহণের বিষয়টি একদিকে যেমন ন্যায় ও ক্ষমতা বন্টনের ইস্যু তেমনি অন্যদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর নারী নেতৃত্বের মৌলিক প্রভাব অনেক দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানের পথে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। সুতরাং উন্নয়নকে পূর্ণাঙ্গ মাত্রা দিতে চাইলে নারীর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং তা নিশ্চিত করতে চাইলে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের স্থানগুলোতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি।

এবং এই সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চাইলে বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধনে নারীদের নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণও বিশেষভাবে প্রয়োজন। অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য নারীদের নিজেদের নেটওয়ার্ককে সংগঠিত এবং উদ্যোগী করা প্রয়োজন, বিভিন্ন সংগঠনের সাথে তাদের স্বার্থ বিষয়ে যোগাযোগ করা এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করার জন্য পদ্ধতিকে প্রভাবিত করা প্রয়োজন। অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের পূর্ণাঙ্গতা আনয়নের জন্য নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন একান্ত প্রয়োজন।

৮.২ উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী: অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ

এই গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্যই ছিল ‘উন্নয়ন’, ‘রাজনীতি’ ও ‘নারী’ এই ত্রয়ী প্রত্যয়ের সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে দেখানো। সর্বশেষ অধ্যায়ে এসে সামগ্রিক বিচারে নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থান, সীমিত অগ্রসরতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীক অবস্থান, বাস্তবতা অনুসারে প্রাসঙ্গিক কিছু সুপারিশ প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাষ্ট্রের অর্ধেক মানব সম্পদ নারী। এই বিপুল শ্রমশক্তির যথার্থ মুল্যায়নের

মাধ্যমে সত্যিকার উন্নয়ন সম্ভব। বিশ্বব্যাপী নারীর যে পশ্চাৎপদ অবস্থান বাংলাদেশ সেই একই ধারায় চলছে। সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে তাই নিজস্ব আর্থ- সামাজিক অবস্থার আলোকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এবং তা রূপায়িত করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি বিবেচনা করে নারীকে রাজনৈতিক কর্মপরিধিতে ও উন্নয়ন পরিক্রমার মূলধারায় যথানুপাতে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুযায়ী পর্যায়ভিত্তিক কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো। এই সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে অধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত দিকসমূহ থেকে এই গবেষণার পূর্ববর্তী আলোচনার সঙ্গে যৌক্তিকতার প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণী: ৮.১ দুই পর্যায়ের সুপারিশ

রাষ্ট্রীয় মতাদর্শিক পর্যায়		রাজনৈতিক প্রবেশাধিকার ও প্রতিনিধিত্ব পর্যায়	
আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত	সরকারী সিদ্ধান্তগ্রহণমুলক সংক্রান্ত	রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত	নির্বাচন সংক্রান্ত

১. রাষ্ট্রীয় মতাদর্শিক উদ্যোগ

কোন রাষ্ট্রের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন মূলত: নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের উপর। তাই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয় এমন সব বিষয়ে সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণী: ৮.২ রাষ্ট্রীয় মতাদর্শিক পর্যায়ভিত্তিক সুপারিশ- আইন বিষয়ক

আইন বিষয়ক: আইন হলো ক্ষমতার বৈধতা নির্ধারিক শক্তি। লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নারীর প্রতি অনুকূল আইন প্রণয়ন তাই একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান প্রচলিত আইনের সীমাবদ্ধতা পরিহার করে সম মর্যদাভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তাই আইন গত ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি:

১.সিভিল আইন ও ধর্মীয় আইনের দ্বৈততা কাটিয়ে বৈষম্য রোধ ও সার্বজনীন আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল ধর্মের নারীদের স্বার্থে লিঙ্গভিত্তিক সমতা সৃষ্টি করা।

২.নারী নির্যাতন, যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে আইন প্রণয়ন সহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩.নিরাপদ হেফাজত, ধর্ষণ মামলার আইন পরিবর্তন।

৪.ফতোয়া দানকে কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা।

৫.প্রচলিক সকল বৈষম্যমূলক আইনের দ্রুত সংস্কান সাধন।

৬.পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ পারিবারিক আদালত গঠন করা।

সারণী:৮.৩ রাষ্ট্রীয় মতাদর্শিক পর্যায়ভিত্তিক সুপারিশ- সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ক

সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ক: সরকার হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ শক্তি। নীতি নির্ধারণের ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখতে পারে বলে এবার সরকারের দিক থেকে প্রধান তিনটি দিক থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু সুপারিশ সন্নিবেশিত করা হলো। যথা:

ক. নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে ক্ষমতায়ন

খ.আর্ন্তজাতিক উদ্যোগ বিষয়ে ভূমিকা

গ.উন্নয়নের প্রক্রিয়ার মূলধারায় অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ

ক. নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে ক্ষমতায়ন

১. প্রয়োজনীয় সম্পদ ও ক্ষমতাসহ নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।

২. সাংবিধানিকভাবে কিংবা মন্ত্রীসভায় বিধিগতভাবে সিদ্ধান্তসাপেক্ষে একটি নির্ধারিত আনুপাতিক হারে মন্ত্রীসভায় নারীর অর্ন্তভূক্তি নিশ্চিত করা।

৩. প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে অধিক হারে ক্যাবিনেট পদসহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহে নারীর নিয়োগ প্রদান। সরকারের পক্ষ থেকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নীতি প্রণয়ন করে সকল পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনের বোর্ডে অন্ত:ত ২৫ শতাংশ মহিলা নিয়োগের বিধি প্রচলন করা।

৪. জাতীয় বাজেটে নারী বিষয়ক বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার জন্য ব্যয় আনুপাতিক হারে

বরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৫. পুলিশ ও অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসহ সকল নির্বাচিত সংস্থা, নীতি নির্ধারণী ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পর্যায়সমূহে সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নারী প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা নেওয়া তথা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

খ.আর্ন্তজাতিক উদ্যোগ বিষয়ক

১. জাতিসংঘ প্রণীত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদের (সিডও) পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা।
২. বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
৩. আর্ন্তজাতিক দলিলগুলোতে স্বাক্ষর দান এবং দলিলে উল্লেখিত নারীর অধিকার বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা।

গ.উন্নয়নের প্রক্রিয়ার মূলধারায় অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ

উন্নয়ন পরিক্রমার মুলধারায় নারীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। যে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন পরিকল্পনা প্রণয়ন। তারপর প্রয়োজন তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

এই দুই পর্যায়েই কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হচ্ছে:

সারণী: ৮.৪ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় দুই পর্যায়ের সুপারিশ

পরিকল্পনা বিষয়ক	বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্ন্তভূক্তকরণ
লিঙ্গ সমতাভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম নির্ধারণে পরিকল্পনা পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।	উন্নয়ন পরিক্রমায় নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

সারণী: ৮.৫ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় পরিকল্পনা বিষয়ক সুপারিশ

পরিকল্পনা বিষয়ক- লিঙ্গ সমতাভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম নির্ধারণে পরিকল্পনা পর্যায়ে নিম্মোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

১.উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের অর্ন্তভূক্তি আনুপাতিক হারে নিশ্চিত করা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সকল পরিকল্পনায় নারীর উপস্থিতি এবং বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২.বাস্তবভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদনের আলোকে প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করে নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী পলিসিসমূহ বিশ্লেষণের আলোকে সাফল্য-ব্যর্থতার নীরিখে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। গবেষণা এ্যাকশন ওরিয়েন্টেড হওয়া উচিত। ৩.দেশীয় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত আছে। এই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কোন স্বীকৃতি নেই জাতীয় পরিসংখ্যানে, কোন নীতি নির্ধারণী প্রতিবেদনে। নারীর শ্রমশক্তিকে জাতীয় পরিসংখ্যান, GNP এবং নীতি প্রনয়ণকারীদের পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত করা প্রয়োজন।

৪.ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে সরাসরি নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের উন্নয়ন কৌশল, সমাজ কাঠামো, স্থানীয় সরকার, আইন-কানুন, জনসংখ্যা পলিসি, হিসাব, আইনগত অধিকার এবং আধুনিক প্রযুক্তির বিষয় সম্বন্ধে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে পরবর্তীতে স্থানীয় পর্যায় অর্থাৎ তৃণমূল পর্যায় থেকে ক্রমে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে। তাহলে এই দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে নারীর সমস্যা বা জেন্ডার কনসার্ন রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে প্রাধান্য পাবে।

সারণী: ৮.৬ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্ন্তভূক্তকরণ বিষয়ক সুপারিশ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্ন্তভূক্তকরণ: উন্নয়ন পরিক্রমায় নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। যেমন:

প্রথমত: শিক্ষা

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থানের উত্তরণ ঘটাতে প্রয়োজন ব্যাপক সংস্কার। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে গৃহীত উদ্যোগসমূহের কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। নারী শিক্ষার

হার পুরুষ শিক্ষার হারের তুলনায় অর্ধেক এবং প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ মেয়ে শিশু ভর্তি হচ্ছে। শিক্ষাক্রম থেকে মেয়ে শিশুর ঝরে পড়ার হার ছেলে শিশুর তুলনায় দ্বিগুণ। দক্ষতা বৃদ্ধি ও কারিগরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ নারীদের ক্ষেত্রে খুবই সীমিত। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

ক. ১৯৭২ এর সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

খ. ২০০০ সাল নাগাদ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্তত শতকরা ৬৫ ভাগ মেয়ে শিশুকে শিক্ষাক্রমে ধরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ. মেয়েদের জন্য যথাক্রমে শতকরা ১০ ও ১৫ ভাগ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল নির্দিষ্ট রাখা।

ঘ. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের নতুন শিক্ষকদের শতকরা ১০০ ভাগই মহিলা নিয়োগ প্রদান।

ঙ. নারী শিক্ষা পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে শিক্ষা পরিদপ্তরে একটি বিশেষ "নারী শিক্ষা সেল" স্থাপন করা।

চ. এনজিওদের নারী অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্যাপক হারে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা।

কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষা পদ্ধতিতে লিঙ্গসমতাভিত্তিক আদর্শ তৈরী করা। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের অনুসৃত শিক্ষা পদ্ধতি নারীর প্রতি অনুকূল নয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে নেতিবাচকভাবে। এর পরিবর্তন ও নারীর ইতিবাচক চরিত্রায়নের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সংস্কার। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত: শ্রমশক্তি

শ্রমশক্তির পরিধি অত্যন্ত বৃহৎ। তাই কয়েকটি ক্ষেত্রে পৃথক করে প্রাসঙ্গিক সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হচ্ছে:

কৃষি ক্ষেত্র

ক. শষ্য, খাদ্য, সেচ, পশুপালন, মৎস, ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি সুষম কৃষি নীতি প্রণয়ন যার মূল উদ্দেশ্য হবে কৃষিখাতে নারীর অংশগ্রহণকে অধিকতর দৃশ্যমান করা যাতে করে কৃষির যাবতীয় ইনপুটসমুহে নারীর অধিকার সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

খ. কৃষি সম্প্রসারণের প্রশিক্ষণে কৃষিতে নারীর ভূমিকা বিশেষভাবে প্রতিফলিত করা ও কৃষি সম্প্রসারণে অধিক নারী নিয়োগ করা।

গ. কৃষি ঋণের শতকরা ১০ ভাগ নারী কৃষিজীবীদের জন্য নির্ধারিত রাখা।

ঘ. কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগে নারীর প্রেক্ষিতকে গুরুত্ব দেয়া।

শিল্প ক্ষেত্র

ক. শ্রমনীতিমালা সম্পর্কে নারী শ্রমিকের সচেতনতা বৃদ্ধি ।

খ. শিল্প ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে অধিক ঋণ দান।

গ. শিল্প ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ''সেনসাস অব ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাষ্ট্রীর'' পক্ষে থেকে একটি বিশেষ জরীপ চালানো ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঘ. রপ্তানীমূখী শিল্পে নারী শ্রমিকের সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে একটি পৃথক লেবার কমিশনার নিয়োগ করা।

ঙ. শ্রমনীতিতে প্রদত্ত নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করা।

কর্মসংস্থান ক্ষেত্র

ক.নারীকে নীতি নির্ধারণের উচ্চ পর্যায়ে চুক্তি/আত্মীকরণ/লেটারেল এন্ট্রির মাধ্যমে নিয়োগ দান এবং নারীর বিশেষ কোটা পাচঁ বছরের জন্য শতকরা ২৫ ভাগে উন্নীত করা।

খ. পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ব্যাপকভাবে নারীদের নিয়োগ প্রদান।

গ. কর্মজীবী মহিলাদের জন্য জেলা পর্যায়ে হোষ্টেল ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা।

ঘ. সকল প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কোর্সে উন্নয়নে নারীর প্রেক্ষিত সংযোজন করা।

ঙ. ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ, জমি বা সম্পদ হস্তান্তর ও ক্রয় সবক্ষেত্রে সমান মর্যদা নিশ্চিত করা।

চ. নারীর জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান, রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ও উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো তৈরী করা।

ছ. একই কাজে একই মজুরী আইন কঠোরভাবে পালন করতে হবে। আইন ভঙ্গকারীর জন্য শাস্তির বিধান করা।

জ. আত্ম কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারকে অগ্রাধিকার প্রদান।

ঝ. আই.এল.ও কনভেনশন অনুযায়ী নারী শ্রমিকের সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান।

স্বাস্থ্য

ক. বাংলাদেশের নারীদের স্বাস্থ্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

খ. নারীর সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেই চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

- রাজনীতিতে প্রবেশ ও প্রতিনিধিত্ব অর্জন বিষয়ক

রাজনীতির মূলধারায় নারীর অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা নারীর মৌলিক অধিকার ও দীর্ঘ মেয়াদী সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ে অপ্রতুল উপস্থিতি, জাতীয় সংসদে সীমিত প্রতিনিধিত্ব, পরোক্ষ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনের কারণে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এখনো পুরুষের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। রাজনীতিতে নারীদের অর্ন্তভূক্তির প্রবেশ দ্বার হচ্ছে রাজনৈতিক দল, তাই এই গবেষণায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে:

সারণী: ৮.৭ রাজনীতিতে প্রবেশ ও প্রতিনিধিত্ব অর্জনে রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত সুপারিশ

⇨রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত

জাতীয় উন্নয়ন নীতি ও দলীয় আর্দশের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে নারীর প্রতি বৈষম্য অপনোদন ও নারী উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকাব রাজনৈতিক দলগুলিকে ব্যক্ত করতে হবে। এর পরিপূরক হিসেবে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে নারীকে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কাঠামোয় প্রয়োজনবোধে 'কোটা' ভিত্তিতে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে যেখানে জেন্ডার ইস্যু রাজনৈতিক দলের প্লাটফর্মে বলিষ্টভাবে এসেছে, সেখানে দেখা গেছে রাজনৈতিক দল সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি জোরদার করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ ধরনের কৌশল বাঞ্ছনীয় হবে বলে আশা করা যায়। রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে:

১.লক্ষ্যণীয় যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলে দলের স্থায়ী কমিটি ও সেক্রেটারিয়েট এবং কার্যনির্বাহী কমিটিতে অর্থাৎ দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে আরো অধিক সংখ্যক নারীকে অর্ন্তভূক্ত করা জরুরি।

২. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অন্ত:ত শতকরা ১০-১৫ শতাংশ আসনে নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন দান করা প্রয়োজন।

৩.রাজনীতিতে নারীকে অধিক হারে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের মূলনীতি, কর্মসূচী ও ইশতিহারে 'নারী প্রেক্ষিত' প্রতিফলিত হয় এমনভাবে নারী অধিকার ও সমতা সংক্রান্ত দাবীদাওয়া সন্নিবেশিত করা এবং সম্ভব হলে খাতওয়ারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর সমস্যা চিহ্নিত করে তা মোকাবেলা বা নিরসনের দিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

৪.রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতিহারে নারীর সমানাধিকার কায়েমের লক্ষ্যে কি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং শ্রেণী বৈষম্যের সাথে জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্যসমূহ দূরীকরণের প্রচেষ্টার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৫.রাজনৈতিক দলের মহিলা অংগ সংগঠনের শাখার বর্তমান সীমিত কর্মকান্ডের পরিবর্তে দেশের নারী সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে নারী অধিকার ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিস্তৃতি ঘটিয়ে জন সচেতনতা ও সমর্থন সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মূল দলের এজেন্ডায় নারী সমাজের স্বার্থের সংযোজন ও অর্ন্তভূক্তিতে তাদের গুরুত্বহ মেডিয়েটিং ভূমিকা রয়েছে, যার যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন।

সারণী: ৮.৮ রাজনীতিতে প্রবেশ ও প্রতিনির্ধিত্ব অর্জনে নির্বাচন সংক্রান্ত সুপারিশ

⇨নির্বাচন সংক্রান্ত

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনী পরিবেশ নারীর প্রতি অনুকূল নয় বলে নারীরা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উৎসাহী হয় না। বর্তমান প্রচলিত

রীতি অনুযায়ী নির্বাচনে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় তা সংগ্রহ করাও নারীর জন্য কষ্টসাধ্য, যা তাদের মনোনয়ন প্রাপ্তিতে বাধা তৈরী করে। এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য নির্বাচন বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

১.রাজনীতিতে নারী সমাজের অংশগ্রহণ সহজতর ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য মাস্তানী, কালো টাকার দৌরাত্ম রোধ করা।

২.সন্ত্রাসী, ঋণখেলাপী, কালো টাকার মালিক, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী ও স্বাধীনতাবিরোধীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা।

৩.নির্বাচনী প্রচারণা ও অন্যান্য ধর্মীয় বা যে কোন সমাবেশে নারীর প্রতি অশালীন বক্তব্য কঠোর হস্তে দমন করা।

৪.প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নারীকে রাজনীতির মূলধারায় আসার সুযোগ করে দেয়ার জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনে প্রতি জেলা থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেই লক্ষ্যে নারীদের রিজার্ভ সীটের সংখ্যা বর্তমানের ৩০ থেকে অন্তত: প্রত্যক জেলা অনুযায়ী ৬৫-তে উন্নীত করতে হবে এবং নারীদের জন্য প্রত্যক্ষ ভোটে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করতে হবে। সংসদে আসন সংখ্যাও বাড়াতে হবে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও ক্ষমতার সম অংশীদারিত্বের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য।

এভাবে রাজনীতির পরিমন্ডলে নারীর গতিবিধি বৃদ্ধি করে উন্নয়ন ধারায় সম্পৃক্তকরণের কাজ নতুন মাত্রা পেয়ে এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা তৈরী হতে পারে। এক্ষেত্রে নারীদের নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণও জরুরি। বিভিন্ন নারী সংস্থা ও ফোরামসমূহকে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষিত করার লক্ষ্যে অধিক সংহত হওয়া প্রয়োজন।

রাজনীতি ও উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সরকারী-বে সরকারী উদ্যোগের পারস্পরিক সংযোগ প্রয়োজন। বাংলাদেশের নারী দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তাই যথার্থ মানব উন্নয়নের প্রয়োজনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। নারীর যে অদৃশ্যমান শ্রমের ব্যাপ্তি তার স্বীকৃতি প্রদান, উন্নয়নে নারীর ব্যাপক

অংশগ্রহণ এবং উন্নয়নের ফলে প্রাপ্ত সুবিধায় নারীর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা দরকার। তবেই সার্বিক উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু যা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, সামাজিকীকরণের মাধ্যমে নারীকে নেতৃত্বমূলক অবস্থানে আসীন হওয়ার জন্য নেতৃত্বসুলভ আদর্শ ও ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। তবেই পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন কাজ জোরদার করা সম্ভব হবে।

এই পর্যায়ে বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে গবেষণার বিষয়বস্তু আলোচনা ক্রমে অগ্রসর হয়েছে। মোট আটটি অধ্যায়ের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'উন্নয়ন', 'রাজনীতি' ও 'নারী' এই তিনটি প্রত্যয়ের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং পারস্পরিক সংযোগ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত রাজনীতি ও উন্নয়নে নারীর অবস্থান স্পষ্ট করার প্রয়োজনে বৈশ্বিক পর্যায়ের আলোচনাকে পটভূমি হিসেবে তুলে ধরে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থানকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায় মূলত: তুলনামূলক বিশ্লেষণভিত্তিক আলোচনা। উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর যথানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এখানে রাজনীতিতে নারীর নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অবস্থান কিভাবে উন্নয়নকে প্রভাবিত করে তা যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি উন্নয়ন ধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর দৃঢ় অবস্থান কিভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে তাৎপর্যবহ করে তাও দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি উভয় ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ অবস্থান কিভাবে নারীকে অনগ্রসর করে রাখে সেটাও তুলনামূলক চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায় হলো গবেষণার পূর্ববর্তী সকল আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত সারসংক্ষেপ এবং সে অনুযায়ী কিছু সুপারিশমালা উপস্থাপন।

এই গবেষণার মূল লক্ষ্যই ছিল তিনটি প্রত্যয়ের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে একটি ইতিবাচক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করা। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোকে উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে উভয় পরিমন্ডলে যথানুপাতিক

প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথ অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

সবশেষে, এই গবেষণার মূল বক্তব্য হচ্ছে, উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে চাইলে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাজনীতির পরিমন্ডলে নারীর প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ সহজতর ও ব্যাপক করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক পদক্ষেপ হতে পারে দেশের আইনগত ও মূল্যবোধগত কাঠামোকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রচেষ্টার সহায়ক হিসেবে নির্মাণ করা। বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে বর্তমান চলমান রাজনৈতিক ধারায় ধর্মকে যেভাবে ব্যক্তিগত চর্চার বিষয় থেকে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধাণযোগ্য। সকল সচেতন জনগোষ্টীর উদ্যোগে সব ধরনের পশ্চাৎমূখীনতা অপসারণ করে দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় অর্জিত লিঙ্গসমতার বোধকে এগিয়ে নেবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার বিষয়টিতে সচেষ্ট থাকা জরুরি। তবেই রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম অংশগ্রহণের মাধ্যমে যথাযথ লিঙ্গসমতাভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ করে বাংলাদেশকে একটি জেন্ডার/লিঙ্গ ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র

১. নাজমা চৌধুরী, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ: প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", *নারী ও রাজনীতি*, নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, পৃ.২১, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪।

২. নাজমা চৌধুরী এবং অন্যান্য 'নারীর ক্ষমতায়ন' উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, *টাস্কফোর্স প্রতিবেদন*, পৃ. ৩৩, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২।

৩. নাজমা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২১

৪. ওয়েবসাইট

পরিশিষ্ট: ১ বিশ্বব্যাপী আইনসভায় নারী সংসদ সদস্যদের তালিকা

Situation as of 25 September 2000

The data in the table below has been compiled by the Inter-Parliamentary Union on the basis of information provided by National Parliaments. **176 countries** are classified by **descending order of the percentage of women in the lower or single House**.

World and regional averages

You can use the PARLINE database to view detailed results of parliamentary elections by country.

Rank	Country	Lower or single House				Upper House or Senate			
		Elections	Seats	Women	% W	Elections	Seats	Women	% W
1	Sweden	09 1998	349	149	42.7	---	---	---	---
2	Denmark	03 1998	179	67	37.4	---	---	---	---
3	Finland	03 1999	200	73	36.5	---	---	---	---
4	Norway	09 1997	165	60	36.4	---	---	---	---
5	Netherlands	05 1998	150	54	36.0	05 1999	75	20	26.7
6	Iceland	05 1999	63	22	34.9	---	---	---	---
7	Germany	09 1998	669	207	30.9	01 2000	69	41	59.84
8	New Zealand	11 1999	120	37	30.8	---	---	---	---
9	Mozambique	12 1999	250	75	30.0	---	---	---	---
10	South Africa	06 1999	399	119	29.8	06 1999	89	17	32.1*
11	Bosnia and Herzegovina	09 1998	42	12	28.6	09 1998	15	0	0.0
12	Spain	03 2000	350	99	28.3	03 2000	259	59	22.8
13	Cuba	01 1998	601	166	27.6	---	---	---	---
14	Austria	10 1999	183	49	26.8	N.A.	64	13	20.3
15	Grenada	01 1999	15	4	26.7	01 1999	13	1	7.7
16	Argentina	10 1999	257	68	26.5	12 1998	72	2	2.8
17	Turkmenistan	12 1999	50	13	26.0	---	---	---	---
"	Viet Nam	07 1997	450	117	26.0	---	---	---	---
18	Namibia	11 1999	72	18	25.0	11 1998	26	2	7.7
19	Seychelles	03 1998	34	8	23.5	---	---	---	---
20	Belgium	06 1999	150	35	23.3	06 1999	71	20	28.2
21	Australia	10 1998	148	34	23.0	10 1998	76	23	30.3
"	Switzerland	10 1999	200	46	23.0	10 1999	46	9	19.6
22	Monaco	02 1998	18	4	22.2	---	---	---	---
23	China	1997-98	2984	650	21.8	---	---	---	---
24	Lao People's Democratic Rep.	12 1997	99	21	21.2	---	---	---	---
25	Croatia	01 2000	151	31	20.5	04 1997	67	4	6.0
26	Dem. People's Rep. of Korea	07 1998	687	138	20.1	---	---	---	---

27	Canada	06 1997	301	60	19.9	N.A.	105	32	30.5
28	Costa Rica	02 1998	57	11	19.3	---	---	---	---
29	Guyana	12 1997	65	12	18.5	---	---	---	---
30	United Kingdom	05 1997	659	121	18.4	N.A.	666	105	15.8
31	Uganda	06 1996	279	50	17.9	---	---	---	---
32	Estonia	03 1999	101	18	17.8	---	---	---	---
33	Lithuania	10 1996	137	24	17.5	---	---	---	---
34	Portugal	10 1999	230	40	17.4	---	---	---	---
35	Rwanda	11 1994	70	12	17.1	---	---	---	---
36	Botswana	10 1999	47	8	17.0	---	---	---	---
"	Latvia	10 1998	100	17	17.0	---	---	---	---
37	Luxembourg	06 1999	60	10	16.7	---	---	---	---
38	United Rep. of Tanzania	10 1995	275	45	16.4	---	---	---	---
39	Dominican Republic	05 1998	149	24	16.1	05 1998	30	2	6.7
40	Angola	09 1992	220	34	15.5	---	---	---	---
41	Bahamas	03 1997	40	6	15.0	03 1997	16	5	31.3
"	Czech Republic	06 1998	200	30	15.0	11 1998	81	9	11.1
"	Tajikistan	02 2000	60	9	15.0	03 2000	33	4	12.1
42	Eritrea	02 1994	150	22	14.7	---	---	---	---
43	Ecuador	05 1998	123	18	14.6	---	---	---	---
44	Burundi	06 1993	118	17	14.4	---	---	---	---
45	Slovakia	09 1998	150	21	14.0	---	---	---	---
46	Jamaica	12 1997	60	8	13.3	12 1997	21	5	23.8
"	Saint Kitts and Nevis	07 1995	15	2	13.3	---	---	---	---
"	San Marino	05 1998	60	8	13.3	---	---	---	---
47	Poland	09 1997	460	60	13.0	09 1997	100	11	11.0
48	United States of America	11 1998	435	56	12.9	11 1998	100	9	9.0
49	Israel	05 1999	120	15	12.5	---	---	---	---
50	Mali	07 1997	147	18	12.2	---	---	---	---
"	Slovenia	11 1996	90	11	12.2	---	---	---	---
51	Senegal	05 1998	140	17	12.1	01 1999	60	11	18.3
"	Uruguay	10 1999	99	12	12.1	10 1999	31	3	9.7
52	Azerbaijan	11 1995	125	15	12.0	---	---	---	---
"	Congo	01 1998	75	9	12.0	---	---	---	---
"	Ireland	06 1997	166	20	12.0	08 1997	60	11	18.3
53	Colombia	03 1998	161	19	11.8	03 1998	102	13	12.7
54	Bolivia	06 1997	130	15	11.5	06 1997	27	1	3.7
"	Tunisia	10 1999	182	21	11.5	---	---	---	---
55	Philippines	05 1998	222	25	11.3	05 1998	23	4	17.4
56	Cape Verde	12 1995	72	8	11.1	---	---	---	---
"	Italy	04 1996	630	70	11.1	04 1996	326	26	8.0
"	Saint Lucia	05 1997	18	2	11.1	05 1997	11	2	18.2
57	France	05 1997	577	63	10.9	09 1998	321	19	5.9

58	Bulgaria	04 1997	240	26	10.8	---	---	---	---
"	Chile	12 1997	120	13	10.8	12 1997	48	2	4.2
"	Trinidad and Tobago	11 1995	37	4	10.8	11 1995	31	9	29.0
59	Barbados	01 1999	28	3	10.7	01 1999	21	7	33.3
60	Kazakhstan	10 1999	77	8	10.4	09 1999	39	5	12.8
"	Malaysia	11 1999	193	20	10.4	03 1998	69	18	26.1
"	Syrian Arab Republic	11 1998	250	26	10.4	---	---	---	---
61	Zambia	11 1996	158	16	10.1	---	---	---	---
62	Panama	05 1999	71	7	9.9	---	---	—	---
63	Nicaragua	10 1996	93	9	9.7	—	---	---	---
64	Honduras	11 1997	128	12	9.4	---	---	---	---
65	Malawi	06 1999	193	18	9.3	—	---	---	—
66	Gabon	12 1996	120	11	9.2	01 1997	91	12	13.2
"	Malta	09 1998	65	6	9.2	---	---	—	---
67	Bangladesh	06 1996	330	30	9.1	—	---	—	---
"	Sao Tome and Principe	11 1998	55	5	9.1	---	---	---	---
68	Ghana	12 1996	200	18	9.0	—	---	---	---
"	India	09 1999	544	49	9.0	03 2000	220	?	?
69	Republic of Moldova	03 1998	101	9	8.9	---	---	---	---
70	Guatemala	11 1999	113	10	8.8	---	---	---	---
"	Guinea	06 1995	114	10	8.8	—	---	---	---
"	Sierra Leone	02 1996	80	7	8.8	---	---	---	---
71	Hungary	05 1998	386	32	8.3	---	---	---	---
72	Samoa	04 1996	49	4	8.2	---	---	---	---
73	Burkina Faso	05 1997	111	9	8.1	12 1995	176	21	11.9
74	Indonesia	06 1999	500	40	8.0	---	---	---	---
"	Madagascar	05 1998	150	12	8.0	---	---	—	---
75	Guinea-Bissau	11 1999	102	8	7.8	—	---	—	---
"	Liberia	07 1997	64	5	7.8	07 1997	26	5	19.2
"	Ukraine	03 1998	450	35	7.8	—	---	—	---
76	Russian Federation	12 1999	441	34	7.7	N.A.	178	1	0.6
77	Iraq	03 2000	250	19	7.6	—	---	---	---
78	Cambodia	07 1998	122	9	7.4	03 1999	61	8	13.1
79	Japan	06 2000	480	35	7.3	07 1998	252	43	17.1
"	Central African Republic	11 1998	109	8	7.3	—	—	—	---
"	Romania	11 1996	343	25	7.3	11 1996	143	2	1.4
80	Georgia	10 1999	235	17	7.2	---	---	---	---
"	Uzbekistan	12 1999	250	18	7.2	---	---	---	---
81	Andorra	02 1997	28	2	7.1	---	---	---	---
"	Cyprus	05 1996	56	4	7.1	—	---	—	---
82	Belize	08 1998	29	2	6.9	06 1993	8	3	37.5
83	The f.Y.R. of Macedonia	10 1998	120	8	6.7	---	---	---	---
84	Benin	03 1999	83	5	6.0	---	---	---	---

"	Maldives	11 1999	50	3	6.0	---	---	---	---
85	Nepal	05 1999	205	12	5.9	06 1999	60	9	15.0
"	Republic of Korea	04 2000	273	16	5.9	---	---	---	---
86	Brazil	10 1998	513	29	5.7	10 1998	81	6	7.4
87	Cameroon	05 1997	180	10	5.6	---	---	---	---
88	Antigua and Barbuda	03 1999	19	1	5.3	03 1999	17	2	11.8
89	Albania	06 1997	155	8	5.2	---	---	---	---
90	Equatorial Guinea	03 1999	80	4	5.0	---	---	---	---
91	Kiribati	09 1998	42	2	4.8	---	---	---	---
"	Sri Lanka	08 1994	225	11	4.9	---	---	---	---
"	Togo	03 1999	81	4	4.9	---	---	---	---
92	Saint Vincent & the Grenadines	06 1998	21	1	4.8	---	---	---	---
"	Thailand	11 1996	374	18	4.8	03 2000	200	?	?
93	Belarus	11 1996	110	5	4.5	02 1997	62	18	29.0
94	Singapore	01 1997	93	4	4.3	---	---	---	---
95	Turkey	04 1999	550	23	4.2	---	---	---	---
96	Liechtenstein	02 1997	25	1	4.0	---	---	---	---
97	Lesotho	05 1998	79	3	3.8	05 1998	33	9	27.3
"	Mauritania	10 1996	79	3	3.8	04 2000	56	?	?
98	Kenya	12 1997	224	8	3.6	---	---	---	---
99	Algeria	06 1997	380	13	3.4	12 1997	144	8	5.6
"	Iran (Islamic Rep. of)	02 2000	290	10	3.4	---	---	---	---
"	Nigeria	02 1999	351	12	3.4	02 1999	108	3	2.8
100	Armenia	05 1999	131	4	3.1	---	---	---	---
"	Swaziland	10 1998	65	2	3.1	10 1998	30	4	13.3
101	Marshall Islands	11 1999	33	1	3.0	---	---	---	---
102	Paraguay	05 1998	80	2	2.5	05 1998	45	8	17.8
103	Chad	01 1997	125	3	2.4	---	---	---	---
104	Kyrgyzstan	02 2000	43	1	2.3	02 2000	57	5	8.8
"	Lebanon	08 2000	128	3	2.3	---	---	---	---
105	Bhutan	N.A.	150	3	2.0	---	---	---	---
"	Egypt	11 1995	454	9	2.0	---	---	---	---
"	Gambia	01 1997	49	1	2.0	---	---	---	---
"	Solomon Islands	08 1997	49	1	2.0	---	---	---	---
106	Papua New Guinea	06 1997	109	2	1.8	---	---	---	---
107	Niger	11 1999	83	1	1.2	---	---	---	---
108	Yemen	04 1997	301	2	0.7	---	---	---	---
109	Morocco	11 1997	325	2	0.6	12 1997	270	2	0.7
110	Djibouti	12 1997	65	0	0.0	---	---	---	---
"	Jordan	11 1997	80	0	0.0	11 1997	40	3	7.5
"	Kuwait	07 1999	65	0	0.0	---	---	---	---
"	Micronesia (Fed. States of)	03 1999	14	0	0.0	---	---	---	---
"	Palau	11 1996	16	0	0.0	11 1996	14	1	7.1

"	Tonga	03 1999	30	0	0.0	---	---	---	---
"	Tuvalu	03 1998	12	0	0.0	---	---	---	---
"	United Arab Emirates	12 1997	40	0	0	---	---	---	---
"	Vanuatu	03 1998	52	0	0.0	---	---	---	---
?	Dominica	01 2000	32	?	?	---	---	---	---
?	El Salvador	03 2000	84	?	?	---	---	---	---
?	Ethiopia	05 2000	546	?	?	05 2000	108	?	?
?	Greece	04 2000	300	?	?	---	---	---	---
?	Haiti	05 2000	82	?	?	05 2000	19	?	?
?	Libyan Arab Jamahiriya	03 1997	760	?	?	---	---	---	---
?	Mauritius	09 2000	70	?	?	---	---	---	---
?	Mexico	07 2000	500	?	?	07 2000	128	?	?
?	Mongolia	07 2000	76	?	?	---	---	---	---
?	Nauru	04 2000	18	?	?	---	---	---	---
?	Peru	04 2000	120	?	?	---	---	---	---
?	Suriname	05 2000	51	?	?	---	---	---	---
?	Venezuela	07 2000	165	?	?	---	---	---	---
?	Yugoslavia	09 2000	138	?	?	09 2000	40	?	?
?	Zimbabwe	06 2000	150	?	?	---	---	---	---

** South Africa: the figures on the distribution of seats do not include the 36 special rotating delegates appointed on an ad hoc basis, and the percentages given are therefore calculated on the basis of the 54 permanent seats*

পরিশিষ্ট: ২ বিশ্বব্যাপী নারী প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিদের তালিকা (১৯৪৫-২০০১)

প্রধানমন্ত্রী- এশীয় অঞ্চল

১.শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে (১৯১৬-২০০০) ছিলেন শ্রীলঙ্কার প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তিনি মোট তিন বার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম দুই মেয়াদ হলো ২১ জুলাই ১৯৬০-২৭ মার্চ ১৯৬৫ এবং ২৯ মে ১৯৭০-২৩ জুলাই ১৯৭৭। ১৯৭৮ সালে শ্রীলঙ্কায় প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং তিনি ১৪ নবেম্বর ১৯৯৪ সালে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন তৃতীয়বারের মত। তিনি ছিলেন বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া তিনি ছিলেন বিশ্বের তৃতীয় মহিলা পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং প্রথম প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। ক্ষমতায় এবং বিরোধী দলে থেকে দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় থেকেছেন গত চার দশক পর্যন্ত।

২.ইন্দিরা গান্ধী (১৯১৭-১৯৮৪) ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ। তিনি ১৯ জানুয়ারী ১৯৬৬-২৪ মার্চ ১৯৭৭ ও ১৪ জানুয়ারী ১৯৮০-৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ পর্যন্ত দুবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়েই ভারত বিশ্বে ষষ্ঠ পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত হয় ও প্রথম মহাশূণ্যে রকেট উৎক্ষেপণ হয়। ১৯৮৩ সালে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব হলো ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা দান এবং বাংলাদেশের গণহত্যা ও শরনার্থী সমস্যা সম্পর্কে বিশ্ব জনমত গঠন। ১৯৮১ সালের ৩১ অক্টোবর নিজ দেহরক্ষীর হাতে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তিনি ছিলেন ৬০ ও ৭০ এর দশকে নিজ দেশে এবং জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম ক্যারিশমাটিক নেতা এবং শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব।

৩.গোল্ডামায়ার (১৮৯৮-১৯৭৮) ছিলেন ইসরাইলের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তিনি ইসরাইলের কর্ম ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৭ মার্চ ১৯৬৯ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ছিলেন। তিনি লেবার পার্টির নেত্রী ছিলেন ও ১৯৭৪ সালে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে ইস্তফা দেন।

৪.বেনজির ভুট্টো (১৯৫৩-) ছিলেন পাকিস্তানের এবং মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তিনি ২ ডিসেম্বর ১৯৮৮ থেকে ৬ আগষ্ট ১৯৯০ পর্যন্ত পর্যন্ত দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এ সময় অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু ১৯৯০ সালে অপসারিত হন, আবার ১৯৯৩ সালে পুনরায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯৯৬ সালের ৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ফারুক আহম্মদ লেঘারী তাঁকে ইমপীচ করেন এবং ১৯৯৭ এর ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে নওয়াজ শরীফের নিকট পরাজিত হন। ১৯৯৯ থেকে তিনি লন্ডনে স্বেচ্ছা নির্বাসনে আছেন।

৫.খালেদা জিয়া (১৯৪৫-) বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছিলেন মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তিনি ১৯৯০ সালে এরশাদের পতনের পর ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ এর নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন। স্বামী জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটে। তিনি ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুণরায় বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার ফিরিয়ে আনেন এবং ১৯৯৬ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৬.চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা (১৯৪৫-) শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী। শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের যোগ্য কন্যা হিসেব তিনি প্রথমে প্রধানমন্ত্রী ও পরে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বর্তমানেও ক্ষমতায় আসীন রয়েছেন।

৭.শেখ হাসিনা (১৯৪৭-) বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তনয়া। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁর সপরিবার নির্মমতভাবে হত্যার পর রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ১৯৮১ সালে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ২৩ জুন প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন এবং বর্তমানে দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

৮. ন্যাম ওসোয়াইন টুয়া (১৯৫৮-) ২২ তেকে ৩০ জুলাই ১৯৯৯ পর্যন্ত মঙ্গোলিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পূর্বে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত)

রাষ্ট্রপতি-এশীয় অঞ্চল

১.সুখ্‌বাটারিন ইয়ানজামা (১৮৯৩-১৯৬২) ছিলেন সমসাময়িক ইতিহাসে বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট। তিনি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ থেকে ৭ জুলাই ১৯৫৪ পর্যন্ত মঙ্গোলিয়ার শাসনভার পরিচালনা করেন।

২.সং কুইঙলিং (সাং চিং-লিং) (১৮৯৩-১৯৮১) পিপলস রিপাবলিক অব চায়নার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৮০ সালে। তবে তার্ঁ এই দায়িত্ব প্রাপ্তিতে রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে কিছু জটিলতা ছিল। এর পূর্বে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে ১৯৬৮-১৯৭২ পর্যন্ত তিনিও একজন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৩.কোরাজন একুইনো (১৯৩৩-) ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ থেকে ৩০ জুন ১৯৯২ পর্যন্ত ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দুই দশকের স্বৈর শাসনের পর তিনি প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তিনি এশিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট।

৪.চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা (১৯৪৫-) ১৪ নভেম্বর ১৯৯৪ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে আছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। আলোচনা করা হয়েছে।

৫. গ্লোরিয়া অ্যারাও ম্যাকাউ ফিলিপিন্সের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন। এস্ত্রাদা সরকারের পতনের পর ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যারাও ২০০১ সালের ২০ জানুয়ারী নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি কোরাজন একুইনোর সময় জুনিয়র --মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এবং এস্ত্রাদা সরকারের সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে এস্ত্রাদার বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারের পতন ঘটিয়ে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন।

ইউরোপীয় অঞ্চল- *প্রধানমন্ত্রী*

১.মার্গারেট থ্যাচার (১৯২৫-) ছিলেন ব্রিটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে যে কজন রাজনীতিবিদ প্রভাব বিস্তার করেছিল থ্যাচার তাদের মধ্যে অন্যতম।

১৯৭৯ সালে ব্রিটেনের সাধারন নির্বাচনে কনজার্ভেটিভ পার্টি বিজয়ী হলে তিনি লেবার পার্টির নেতা জেমস কালাহানের স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৮৩, ১৯৮৭ সালেও তিনি বিজয়ী হন। পরপর তিনবার তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯০ এর ২২ নভেম্বর তিনি নীতি সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব থেকে দলীয় প্রধানের পদ এবং প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

২.মারিয়া ডি. লুডাস পিন্টাসিলগো (১৯৩০-) ছিলেন ১ আগষ্ট ১৯৭৯ থেকে ৩ জানুয়ারী ১৯৮০ পর্যন্ত পর্তুগালের নির্দলীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া তিনি সামাজিক মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীত্ব এবং সামাজিক নিরপিত্তা বিভাগে স্টেট সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
ইউরোপে তিনি দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

৩.গ্রে হারলেম ব্রান্টল্যান্ড (১৯৩৯-) নরওয়িআন লেবার পার্টির ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৮১ সালে দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং তিনি সরকার গঠন করেন। প্রথমবার স্বল্প সময়ের শাসনের পর পরবর্তীতে তিনি ৯ মে ১৯৮৬ থেকে ১৬ অক্টোবর ১৯৮৯ এবং ৩ নভেম্বর ১৯৯০ থেকে ২৫ অক্টোবর ১৯৯৬ পর্যন্ত দুবার নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৪.মিলকা প্ল্যানিক (১৯২৪-) সমাজতান্ত্রিক যুগোশ্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ১৬ মে ১৯৮২ থেকে ১৫ মে ১৯৮৬ পর্যন্ত। তিনি ইতিহাসে কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী ।

৫.কাজিমিরা দান্তে প্রুনসকিনি (১৯৪৩-) ১৭ মার্চ ১৯৯০ থেকে ১০ জানুয়ারী ১৯৯১ পর্যন্ত লিথুনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৬.এডিথ ক্রেসন (১৯৩৪-) ফ্রান্সের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৫ মে ১৯৯১ থেকে ২ এপ্রিল ১৯৯২ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এর পূর্বে তিনি কৃষি, বৈদেশিক বাণিজ্য ও পর্যটন এবং শিল্পোন্নয়ন ও বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ১৬ মার্চ ১৯৯৯ তিনি পদত্যাগ করেন।

৭.হান্না সাচুকা (১৯৪৬-) ৮ জুলাই ১৯৯২ থেকে ২৬ অক্টোবর ১৯৯৩ পর্যন্ত পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৮. তানসু সিলার (১৯৪৬-) ২৫ জুন ১৯৯৩ থেকে ৭ মার্চ ১৯৯৬ পর্যন্ত তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পূর্বে তিনি অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন।

৯. জেনি শিপলে (১৯৫২-) ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭ থেকে ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পুর্বে তিনি নারী বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

১০. হেলেন এলিজাভেদ ক্লার্ক (১৯৫০-) ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৯ থেকে নিউজিল্যান্ডের ধারাবাহিক দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পূর্বে তিনি হাউজিং এন্ড কনজার্ভেশন এবং স্বাস্থ্য ও শ্রম মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

১১.রেনেটা ইন্দোভা (১৯৫৩-) ১৬ অক্টোবর ১৯৯৪ থেকে ২৫ জানুয়ারী ১৯৯৫ পর্যন্ত বুলগেরিয়ার অর্ন্তবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১২. ইরিনা ডেজুটাইন (১৯৪৯-) ৪ থেকে ১৮ মে ১৯৯৯ পর্যন্ত লিথুনিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া তিনি সমাজ কল্যাণ, শ্রম এবং নারী বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। (ভারপ্রাপ্ত)

ইউরোপীয় অঞ্চল- *রাষ্ট্রপতি*

১.লডিয়া গুয়েলার তেজাডা (১৯২৬-) বলিভিয়ার ক্রান্তিকালীন সময়ে ১৭ নভেম্বর ১৯৭৯ থেকে ১৮ জুলাই ১৯৮০ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২.ভিগডিস ফিনাবোগেটর (১৯৩০-) ১ আগষ্ট ১৯৮০ থেকে ১ আগষ্ট ১৯৯৬ পর্যন্ত আইসল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইউরোপের প্রথম, বিশ্বের প্রথম জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত, বিশ্বের সর্বাধিক অধিক সময়কাল ধরে দায়িত্বপালনে সফলতার দিক থেকে (ইউরোপের রাজকীয় শাসন ব্যতীত), বিশ্বের প্রথম নারী হিসেবে তিনি মূল্যায়িত হন।

৩.আগাথা বারবারা (১৯২৩-) ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ পর্যন্ত মাল্টার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর পূর্বে তিনি মন্ত্রী হিসেবে শিক্ষা বিষয়ক এবং শ্রম, সংস্কৃতি ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ইউরোপের দ্বিতীয় নারী প্রেসিডেন্ট।

৪.সেবাইন বার্গমেন-ফল (১৯৪৬-) জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের মনোনীত ও তত্ত্বাবধায়ক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাবেক পূর্ব ইউরোপের প্রথম নারী শাসক ছিলেন।

৫.মেরি ম্যাকএলিস (১৯৫১-) ১১ নভেম্বর ১৯৯৭ থেক আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে রয়েছেন। রাজনীতি সম্পৃক্ত না হয়েও তিনি সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

৬.রুথ ড্রেফাস (১৯৪০-) তিনি প্রথম সুইস নারী সরকারপ্রধান। ১ জানুয়ারী ১৯৯৯ থেকে ১ জানুয়ারী ২০০০ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি ফেডারেল এসেম্বলী কর্তৃক নির্বাচিত হন।

৭.টারজা কারিনা হেলোনিন (১৯৪৩-)১ মার্চ ২০০০ থেকে তিনি ফিনল্যান্ডের প্রথন নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। পূর্বে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

আফ্রিকা অঞ্চল- *প্রধানমন্ত্রী*

১.এলিজাভেদ ডোমিশিয়েন (১৯২৬-১৯৯৭) আফ্রিকার রাজনীতিতে এক সমুজ্জ্বল নাম। তিনি ৩ জানুয়ারী ১৯৭৫ থেকে ৭ এপ্রিল ১৯৭৬ পর্যন্ত মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন আফ্রিকার প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম কালো নারী শাসক।

২.সিলভিয়া কিনিজি (১৯৫২-?) ১০ জুলাই ১৯৯৩ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পর্যন্ত বুরুন্ডির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

৩.আগাথা উইলিঙ্গিমানা (১৯৫৩-১৯৯৪) ১৮ জুলাই ১৯৯৩ থেকে ৭ এপ্রিল ১৯৯৪ পর্যন্ত রুয়ান্ডার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রথম মহিলা শাসক যিনি সশস্ত্র মিলিশিয়াদের হাতে নিহত হন।

৪.ক্লডেটি ওয়ারলি (১৯৪৪-) ৭ নভেম্বর ১৯৯৫ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ পর্যন্ত হাইতির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর পূর্বে তিনি সামাজিক বিষয়ক ও পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

৫.জেনেট জাগান (১৯২০-) ১৭ মার্চ ১৯৯৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত গায়ানার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আফ্রিকা অঞ্চল- *রাষ্ট্রপতি*

১.মারিয়া লিয়া পেডিনি- এঞ্জেলিনি (১৯৫৩ ?-) ১৯৮১ এর ১ এপ্রিল থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত সান মারিনোতে কর্মরত ছিলেন।

৩.গ্লোরিনা রেনোটিনি (১৯৫৭-) ১৯৮৪ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১ অক্টোবর এবং ১ অক্টোবর ১৯৮৯ থেকে ১ এপ্রিল ১৯৯০ পর্যন্ত সান মারিনোর কো-ক্যাপ্টেন রিজেন্ট (সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৪.কারমেন পেরিরা ১৯৮৪ সালের ১৪ মে থেকে ১৬ মে পর্যন্ত গিনি বিসাউয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৫.আর্থা পেসকেল ট্রুলিয়ট (১৯৪৩-) ১৩ মার্চ ১৯৯০ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ পর্যন্ত হাইতির অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দ্বিতীয় এবং ডোমিনিকার পর সর্বশেষ কালো নারী শাসক।

৬.ভায়োলেটা ব্যারিয়স ডি ক্যামারো (১৯২৯-) ২৫ এপ্রির ১৯৯১ থেকে ১০ জানুয়ারী ১৯৯৭ পর্যন্ত নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দাযিত্ব পালন করেন। তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে দীর্ঘদিন থেকে জড়িত।

৭.এডা সিকোলি: ১ অক্টোবর ১৯৯১ থেকে ১ এপ্রিল ১৯৯২ পর্যন্ত সান মারিনোর কো-ক্যাপ্টেন- রিজেন্ট (রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৮.পেট্রিসিয়া বুসিংনানি: ১৯৯৩ এর ১ এপ্রিল থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত সান মারিনোর কো-ক্যাপ্টেন- রিজেন্ট (রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৯.সিলভিয়া কিনিজি (১৯৫২-) ২৭ অক্টোবর ১৯৯৩ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পর্যন্ত বুরুন্ডির ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

১০.রুথ পেরি (১৯৪০-) ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ থেকে ২ আগষ্ট ১৯৯৭ পর্যন্ত লাইবেরিয়ার চেয়ারম্যান অফ দ্যা কাউন্সিল অব ষ্টেট (ছয় সদস্যের সম্মিলিত রাষ্ট্রপতিত্ব) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১১.জেনেট জেগান (১৯২০-) ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭ থেকে ১১ আগষ্ট ১৯৯৯ পর্যন্ত গায়ানার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর পূর্বে তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

১২.রোসা জাফেরানি (১৯৬০-) ১ এপ্রিল থেকে ১ অক্টোবর ১৯৯৯ পর্যন্ত সান মারিনোর কো-ক্যাপ্টেন- রিজেন্ট (রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পূর্বে তিনি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

১৩.ভেইরা ভিকে- ফ্রিবারগা (১৯৩৭-) ১৭ জুন ১৯৯৯ লাটভিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শুধু নন, প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ওনের অথবা পূর্ব ইউরোপের কোন রাষ্ট্রের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট।

১৪.মারিয়া ডোমিনিনা মিচেলোটি (১৯৫২-) ১ এপ্রিল থেকে ১ অক্টোবর ২০০০ পর্যন্ত সান মারিনোর কো-ক্যাপ্টেন- রিজেন্ট (রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ষষ্ঠ কো-ক্যাপ্টেন হিসেবে আসেন।

আমেরিকা অঞ্চল- *প্রধানমন্ত্রী*

১.কিম ক্যাম্পবেল (১৯৪৭-) ছিলেন কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছিলেন কানাডার প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী এবং উত্তর আমেরিকার প্রথম মহিলা শাসক। তিনি পূর্বে উত্তর-পশ্চিম টেরিটোরীর উন্নয়ন বিষয়ক, বিচার এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

২.ম্যারি এজুনিয়া চার্লস (১৯১৯-) ২১ জুলাই ১৯৮০ থেকে ১৪ জুন ১৯৯৫ পর্যন্ত ডোমিনিকার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৮০-৯০ পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং ১৯৮৫-৯৫ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রথম ক্যারিবীয় মহিলা প্রধান নির্বাহী এবং তৃতীয় আমেরিকান মহিলা শাসক।

আমেরিকা অঞ্চল- *রাষ্ট্রপতি*

১.মারিয়া এষ্টেলা (ইসাবেল) মার্টিন ডি পেরন (১৯৩১-) ১ জুলাই ১৯৭৪ থেকে ২৪ মার্চ ১৯৭৬ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এর পূর্বে তিনি সিনেটের সদস্য এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২.রোসালিয়া আরটেগা সিরানো (১৯৫৬) ৯-১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ পর্যন্ত মাত্র দুইদিনের জন্য ইকুয়েডরের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর পূর্বে তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন।

৩.মারিয়া এলিসা মসকোসো ডি এরিয়াস (১৯৪৬) ১৯৯৯ এর ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০০৪ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত পানামার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট।

তথ্যপঞ্জী

Publications (English- Published)

Boserup Easter, *Woman's Role in Economic Development* London, George Allen & Unwin LTD, 1970.

Choi Kyong Su-,"The Economic and Political Representation of Women in Advanced Countries and Korea", *Asian Women,* Vol.5, 1997.

Chowdhury Dilara, "Women's Participation in the Formal Structure and Decision- Making Bodies in Bangladesh"in Jahan Roushan *et.al.*, *Empowerment of Women- Nairobi to Beijing (1985- 1995)*, Dhaka, Women for Women, 1995.

Easton David, *A Framework for Political Analysis*, Englewood Cliffs: N.J: Prentice Hall, 1965.

Jahan Rounaq & Papanek Hanna eds., *Women and Development- Perspective from South and SouthEast Asia,* Dhaka, Bangladesh institute of Law & international affairs,--

Khanam Johora *et.al*, *Women and Politics in Bangladesh,* Chittagong, Shah Amanat Computer & Printing, Bangladesh.

Khan Salma, “women’s Development and public Policy in Bangladesh’’ in *Integration of Women in Development*, Dhaka, United Nations Information Center, 1985.

Moser O.N. Caroline, ‘‘Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training, Routledge, 1993.

Nelson Barbara j. and Chowdhury Najma eds., *Women and Politics worldwide,* New Haven & London, Yale University Press, 1994.

Pietila Hilkka and Vickers Jeanne, *Making Women Matter-the Role of the United Nation,* United Nations.

Sen Binayak, "Bangladesh poverty analysis: Trends, Policies and Institutions, 2000", in Rahman Zillur Hossain & Hossain Mahbub eds., *Rethinking Rural Poverty-Bangladesh as a case study*, University press limited, 1995.

Salahuddin Khaleda, “Women’s Political Participation: Bangladesh’’ in Huq Jahanara *et al.*, *Women in Politics and Bureaucracy,* Women For women, 1995.

Sobhan Rehman, *Planning and Public Action for Asian Women,* University press Ltd., 1992.

DAWN Report, *Women and the new international economic order*, NGO conference, 1982.

A World Bank Country Study-*Bangladesh, strategies for Enhancing the role of Women in Economic Development*, The World Bank, Washington D.C, July, 1990.

Vickers Jeanne, Program for women and Girls, *Women and the world Economic Crisis,* London and NewJersy, Zed books Ltd., 1997.

(Unpublished)

Davis Peter, Conceptualizing Social Exclusion In Bangladesh, Center For development Studies, University of Bath, March, 1998.

Khan Iqbal Alam, *Struggle for Survival Networks and Relationships in a Bangladesh Slum,* Ph.D thesis, University of Bath, 2000.

PROSHIKA Manabik Unnayan Kendra, *Towards a Poverty free Society-6th Five year Plan, 1999.*

Rahman Hossain Zillur *et.al.*, *Poverty Issues in Bangladesh: A Strategic Review,* Commisioned by the Department for International Development, Bangladesh, May, 1998.

প্রকাশনা (বাংলা)

আখতার তাহমিনা, *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা-বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৯৫।

আহমেদ এমাজউদ্দীন, *তুলনামূলক রাজনীতি: রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৯১।

কেলী রিটা মে ও বুটিলিয়ার মেরী রচিত ও খান ইসলাম নুরুল অনুদিত *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়-সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও ভূমিকা-দ্বন্দ্বের সমীক্ষা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

কাদির সৈয়দা , "স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া: সমস্যা ও সম্ভাবনা", চৌধুরী নাজমা ও অন্যান্য সম্পাদিত, *নারী ও রাজনীতি*, ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪।

খাতুন খাদিজা ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও উন্নয়ন-প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন।

খানম আয়েশা অনুদিত, *বেইজিং কর্মপরিকল্পনা*, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

চৌধুরী নাজমা, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ: প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", চৌধুরী নাজমা ও অন্যান্য সম্পাদিত, *নারী ও রাজনীতি*, *পূর্বোক্ত।*

চৌধুরী নাজমা এবং অন্যান্য *'নারীর ক্ষমতায়ন' উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা*, টাস্কফোর্স প্রতিবেদন-দ্বিতীয় খন্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২।

জাহাঙ্গীর বোরহানউদ্দীন খান, 'বাংলাদেশ এবং সিভিল সমাজ', *বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ এবং মৌলবাদ*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।

ঠাকুরতা মেঘনা গুহ, “নারী এজেন্ডা ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা”, চৌধুরী নাজমা ও অন্যান্য সম্পাদিত, *নারী ও রাজনীতি, পূর্বোক্ত।*

ঠাকুরতা মেঘনা গুহ,“বাংলাদেশে নারী নির্যাতনঃ রাষ্ট্রের ভূমিকা”, জাহাঙ্গীর বোরহানউদ্দীন খান এবং খান জারিনা রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন*, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৩।

ঠাকুরতা মেঘনা গুহ ও বেগম সুরাইয়া, “রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ”-ঠাকুরতা মেঘনা গুহ, বেগম সুরাইয়া ও আহমেদ হাসিনা সম্পাদিত, *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি,* সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৭।

ডাল রবর্ট এ. রচিত ও আহমেদ মঈনউদ্দীন অনূদিত, *আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা বিশ্লেষণ,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

বেগম সুরাইয়া, “রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ এবং অংশগ্রহণের সঙ্কট”, ঠাকুরতা মেঘনা গুহ, বেগম সুরাইয়া ও আহমেদ হাসিনা সম্পাদিত, পূর্বোক্ত।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, *জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নারী সমাজের বক্তব্য*

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, *স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা: নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন*

বেইজিং প্লাস ফাইভ রিভিউ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি, *বেইজিং প্লাস ফাইভ-পর্যালোচনা প্রতিবেদন,* বাংলাদেশ, জুন, ২০০০।

বেইজিং এনজিও ফোরাম,’৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, *“রাজনীতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী”*, বাংলাদেশ, ১৯৯৫।

হক মোজাম্মেল, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামে নারী: অতীত ও বর্তমান,* সম্পাদনা রোকেয়া কবীর, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

বাংলাদেশ সরকারের দলিল এবং প্রকাশনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, *টাস্কফোর্স রিপোর্ট*- মার্চ, ১৯৯১

Bangladesh Bureau Of Statistics, *Statistical year book-1996.*

Bangladesh Bureau Of Statistics, *Report on Labour force Survey in Bangladesh-1995-96*, Dhaka, December, 1996.

United Nations Reports/ Publications

United Nations, *CEDAW*, Newyork.

UNDP,*Human Development Report*, 1999.

United Nations, *The World's Women 1995-Trends and Statistics*, A world Report., Newyork, 1995.

United Nations, *UNICEF annual Report,* 1996.

"Women and Economic decision-making'', Women: looking beyond 2000, United Nations, Newyork.

রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র

জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ইশতিহার ২০০১।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, গঠনতন্ত্র ১৯৮০।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, নির্বাচনী মেনিফেস্টো ২০০১।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র, ২০০১।

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি, ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচী, ১৯৭৬।

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি প্রচারিত পার্টি ইশতেহার, জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও পার্টির আদর্শ, সংশোধিত সংস্করণ, ২০০১।

জার্ণাল, সাময়িকী, ও দৈনিক পত্রিকা

- *জার্ণাল*

চৌধুরী এজাজুল হক, "স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন", *উন্নয়ন পদক্ষেপ,* ষ্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, চতুর্থ বর্ষ, চর্তুদশ সংখ্যা, ১৯৯৮।

নবী বেলা, "এক নারীবাদী পুরুষ: জন স্টুয়ার্ট মিল", *উন্নয়ন পদক্ষেপ,* ষ্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, চতুর্থ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১৯৯৮।

বন্দররাগে অশোকা, "উদারনীতিবাদ, মার্ক্সবাদএবং মার্ক্সসবাদী -নারীবাদ", সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা:২২।

ভাসিন কমলা, "প্রচলিত উন্নয়ন বনাম টেকসই উন্নয়ন" *উন্নয়ন পদক্ষেপ,* ষ্টেপ টুওয়ার্ডস, চতুর্থ বর্ষ, চর্তুদশ সংখ্যা, ১৯৯৮।

পারভীন শামীমা, "নারীর ক্ষমতায়ন", *উন্নয়ন পদক্ষেপ,* ষ্টেপ টুওয়ার্ডস, চতুর্থ বর্ষ, চর্তুদশ সংখ্যা, ১৯৯৮।

সুলতানা আবেদা, "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি: একটি বিশ্লেষণ", *ক্ষমতায়ন,* সংখ্যা- ২, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮।

সোবহান রেহমান, "অবাধ বাজার অর্থনীতিমূখীন সংস্কার ধারনার পূর্ণবিবেচনা ", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা,* ১০ খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা: ১৩৯৯, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

এন.সি.বি.পি.আর, "একবিংশ শতাব্দী: সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি- বেইজিং প্লাস ফাইভ-এনজিও প্রতিবেদন"- *উন্নয়ন পদক্ষেপ, ষষ্ঠ বর্ষ, উনবিংশ সংখ্যা,* ষ্টেপ টুওর্য়াডস ডেভেলপমেন্ট, জানুয়ারী- মার্চ, ২০০০।

"উন্নয়ন ও জেন্ডার বৈষম্য", *উন্নয়ন পদক্ষেপ,* ষ্টেপ টুওর্য়াডস ডেভেলপমেন্ট, সপ্তম সংখ্যা, ১৯৯৭।

- *সাময়িকী*

খান সেলিম ওমরাও, "বিশ্ব নেতৃত্বে নারী", *সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ৩১ জুলাই, ১৯৯৩।

- *পত্রিকা*

ইসলাম তৌফিকুল, *"নারীর ক্ষমতায়ন"*, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০.২.১৯৯৮।

রহমান অদিতি ও সুলতানা পারভীন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯৯৮।

নাজনীন আফরোজা, *“রাজনৈতিক অঙ্গনে নারী”*, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ আশ্বিন, ১৪০৪।

খান সালমা, “ রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী-সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা”, *দৈনিক প্রথম আলো,* ৪ নভেম্বর, ২০০০।

মামুন ওয়াহিদুল ইসলাম, “রাজনীতিতে নারী”, দেনিক জনকণ্ঠ, ৯ মার্চ, ১৯৯৯।

Website

“A conceptual framework for gender analysis and planning: approaches and strategies”, ILO, http://www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/training/unit/moserfw.htm, 19.02.2001.

“Progress of women: The progress of Nations”, *Women in Cabinet*, http://www.unicef.org/pon95/women0005.html, 14.12.2000.

"Through a gender lens: Resources for Population, Health and Nutritionprojects"http://www.fhi.org/en/wsp/wspubs/thrugen.html , 20.2.2000.

“The women’s Equality and Empowerment Framework”, /subactiv.htm.

"women in Politics: Beyond Numbers-women in Parliaments: Beyond Numbers-Obstacles to Women’s Participation in Parliament”, *International IDEA Women in Politics,* http://www.idea.int/women/parl/ch2a.htm, 11.9.2000.

"women in Politics: Beyond Numbers-women in Parliaments: Beyond Numbers-“Gender and Democracy-Why?” *International IDEA Women*

in Politics: Women In parliament: Gender and Democracy, http://www.idea.int/women/parl/ch1a.htm, 11.9.2000.

"Women prime Ministers: 1945-2000", *Women primeMinisters,*http://www.terra.es/personal12/monolith/00women3.htm, 14.1.2000.

"women Presidents, 1945-2001", *Women Presidents,* http://www.terra.es/personal12/monolith/00women2.htm, 4.2.2001.

"Women Speakers of National Parliaments-History and the presents", *Women Speakers of Parliaments,* http://www-c/speakers.htm, 12.9.2000.

"Women in the Highest Positions of State", United Nations Map N 4136 (The world Today), December, 1999.

"Women's League Table', UN Division for the advancement of Women, http://www.unicef.org/pon97/le4part1.htm, 14.10.2000

Moez Doraid,*"Analytical Tools for Human Development",* Human Development Report Office, August, 1997, http://www.undp.org/hdro/anatools.htm, 12.10.2000.

Women in Parliaments:history, "*Women in National Parliaments-50 years of history at a glance",* http://www.ipu.org/wmn-e/history.htm, 12.9.2000.

HDR99: *The Report, Human Development Report 1999-Human Development Index (HDI),* http://www.undp.org/hdro/HDI.html, 12.10.2000.

"Women in Parliaments: World and Regional Averages", file:// Women in Parliaments World and Regional Averages.htm, 6.5.2000.

Women in Parliaments: World and Regional Averages, "*Women in National Parliaments-situation as of 25 august 2000*", http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm, 12.9.2000.

6.5.2000